বিশ্বনবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

রচনা:

প্রফেসর ড. খালিদ বিন হামিদ বিন মুবারক হাযেমী

অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর ইসলামী শিক্ষা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٞ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا﴾ [الأحزاب: ٢١]

*[*অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ, তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করে।*]* সূরা আল-আহযাব: ২১।

ভূমিকা:

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ এবং সমস্ত সাহাবীর উপর।

নবী সাঃ-এর জীবনীকে ইসলামী শরীয়তের ব্যবহারিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাঃ সব বিষয়ে ও পরিস্থিতিতে এটা অনুকরণ করেছেন। বস্তুত তার জীবনী ছিল মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যের এক বাস্তব প্রয়োগ।

মুসলিম শিশুদের শৈশব লালন-পালনে এই জীবনীর প্রতি তাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম, যা পৃথিবীতে যতদিন মানবতা এবং বাকি জীবন বেঁচে থাকবে ততদিন বিদ্যমান থাকবে। তাই এটাকে তাদের বয়সের পর্যায়, চিন্তাভাবনার ধরণ এবং বোঝ ক্ষমতার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

অনুরূপভাবে শিক্ষাদানের প্রকাশভঙ্গির প্রতিও তাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ও মৌলিক বিষয়- যা তাদেরকে নবী সাঃ-কে ভালবাসতে ও তাকে অনুকরণ করার প্রেরণাকে তীক্ষ্ণ করে তোলে। উপরন্তু, নবীজির জীবনীর বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবিত হওয়াও একটি শিক্ষামূলক লক্ষ্য- জীবনী অধ্যয়ন ও তাদেরকে তা শেখানো থেকে।

উক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে, এই কিতাবটি জীবনী উপস্থাপন ও বর্ণনার পদ্ধতির মাধ্যমে জ্ঞানগত ও আচরণগত লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, যা শিশুদের মনে সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করবে, ইবাদত পালনে সুন্নতের অনুসরণ, অন্তরে আল্লাহ ও মহান রাসূল সাঃ-এর প্রতি ভালবাসা তৈরি এবং বোঝ ও আমলগত দিক থেকে উত্তম নৈতিকতার প্রতি অনুরক্ত করে।

এই বইয়ের পদ্ধতি শিক্ষক এবং পিতামাতা সহ অন্যান্য অভিভাবকদেরকে মূল্যবোধের প্রচারে ও ব্যবহারিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেয়, যেমনটি এ বইয়ের পাদটীকায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

হে আল্লাহ, আপনার নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর এই সৌরভময় জীবনী লিখতে এবং তা এমনভাবে উপস্থাপন করতে আমাকে সাহায্য করুন যাতে প্রকৃত লক্ষ্য হাসিল হয়। এটাকে কেবল আপনার সন্তুষ্টির জন্য একনিষ্ঠ আমল হিসেবে গ্রহণ করুন, এর দ্বারা আপনার বান্দাদেরকে উপকৃত করুন এবং এটাকে কিয়ামত অবধি সদকায়ে জারিয়া করে দিন হে বিশ্বপ্রভু। হে উদার ও সুমহান! আপনি এটাকে আপনার উদারতা ও বদান্যতায় কবুল করুন।

০৫/০৯/১৪৩৩ হিজরী

প্রথম অধ্যায়:

জন্ম থেকে নবুওয়ত লাভ পর্যন্ত

রাসূল সাঃ-এর জন্ম

প্রথমত: জন্মস্থান

শিক্ষক: আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ পবিত্র মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য বাচ্চাদের মতই তার জন্ম হয়। তার বেড়ে উঠাও ছিল অন্যদের মত; তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার বিশেষ যত্ন নিয়েছিলেন যা তোমরা এই সুন্দর ও বিস্ময়কর জীবনীতে পৃথিবীর সর্বকালের সেরা ও সবচেয়ে সুন্দর শিশু সম্পর্কে জানতে পারবেন

ছাত্র: উস্তাদ, আমি তার জীবনী শুনতে খুবই আগ্রহী, কাজেই তাড়াতাড়ি আমাদেরকে বিস্তারিত বলুন।

শিক্ষক: স্নেহের ছাত্ররা, আমিও তোমাদেরকে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর শিশুকাল সম্পর্কে জানাতে ব্যাকুল হয়ে আছি ... কেননা এটা বিস্তারিত সহ খুবই চমৎকার। তবে তার আগে আমরা নবী সাঃ-এর জন্মস্থান মক্কার পরিচয় জানব।

সে সময় মক্কা ছিল একটি ছোট গ্রামাঞ্চল, তাতে ফসল ফলাদি হত না। যেমনটি ইবরাহীম আঃ বলেছেন:

﴿رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ﴾ [إبراهيم: ٣٧]

অর্থ: [হে আমাদের রব! আমি আমার বংশধরদের কিছু সংখ্যককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র ঘরের কাছে।] সূরা ইবরাহীম: ৩৭। তবে আল্লাহর অনুগ্রহে সেখানে চতুর্দিক থেকে খাদ্য সামগ্রী আমদানি হত। কেননা মক্কাবাসীরা ব্যবসা-বানিজ্য করত; ফলে তারা গ্রিষ্মকালে সিরিয়া সফর করে সেখান থেকে নানা রকমের পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসত। তারপর শীতকালে ব্যবসায়ীরা ইয়ামানে যেত এবং সেখান থেকেও নানান রকমের পণ্য আমদানি করত। মক্কাবাসীরা এভাবেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করত।

ছাত্র: উস্তাদ, হারাম শরীফের অবস্থা কী ছিল, তখনও কি এটা বিদ্যমান ছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, ঐ সময় কাবা শরীফ বিদ্যমান ছিল। কেননা সেটা তো নির্মাণ করেছিলেন আল্লাহর নবী ইবরাহীম আঃ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَٰهِـۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإِسۡمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]

অর্থ: [আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, (তারা বলছিলেন) হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।] সূরা আল-বাকারা: ১২৭।

ছাত্র: এখন যেমন মানুষ সেখানে হজ করতে যায় তখনও কি সেখানে হজ করতে যেত?

শিক্ষক: স্নেহের ছেলেরা, সুন্দর প্রশ্ন! হ্যাঁ, মানুষ সেখানে বায়তুল্লাহতে হজ করতে যেত এবং তারা কাবার চারপাশে তাওয়াফ করত। কেননা আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম আঃ-কে মানুষের মাঝে হজের ঘোষণা দিতে আদেশ করেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ﴾ [الحج: ٢٧]

অর্থ: [আর মানুষের নিকট হজের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে।] সূরা আল-হজ্জ: ২৭। অর্থাৎ হজ পালনের আগ্রহ নিয়ে পায়ে হেঁটে ও সওয়ারীতে আরোহন করে দূর-দূরান্ত সকল স্থান থেকে আসবে।

ছাত্র: মক্কার ইতিহাস এবং মক্কা ও হজের সাথে ইবরাহীম আঃ-এর যোগসাজশ সম্পর্কে আমরা অনেক কিছুই শিখলাম। উস্তাদ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু

আমাদেরকে নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর শৈশবকাল সম্পর্কে কিছু বলুন, আমরা তা শুনতে উদগ্রীব হয়ে আছি।[১]

শিক্ষক: ঠিক আছে স্নেহের ছাত্ররা: ইতিমধ্যেই আমি তোমাদের নিকট মক্কা সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করেছি, যাতে আমাদের নবী ও আদর্শ মুহাম্মাদ সাঃ-এর জন্মস্থান সম্পর্কে কল্পনা করতে পার।

দ্বিতীয়ত: নবী সাঃ-এর জন্মতারিখ:

শিক্ষক: আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ হস্তি বাহিনীর বছরে রবিউল আওয়াল মাসের বার তারিখ সোমবারে জন্ম গ্রহণ করেন।

ছাত্র: উস্তাদ, রবিউল আওয়াল দ্বারা উদ্দেশ্য কী তা যদি বলতেন?

শিক্ষক: চমৎকার হে ছেলেরা, তোমাদের এ প্রশ্ন প্রমাণ করে যে, আমি যা বলছি সে ব্যাপারে তোমরা মনোযোগী ও সিরিয়াস এবং শেখার প্রতি তোমরা আন্তরিক। সবাইকে ধন্যবাদ।

এক বছরে বারটি মাস; প্রথম মাসের নাম মুহাররম, তারপর সফর, তারপর রবিউল আওয়াল- আর এ মাসেই নবী সাঃ জন্ম গ্রহণ করেছেন। তারপর রবিউস সানী, জুমাদা আওয়াল, জুমাদা সানী, রজব, শাবান, তারপর রমজান- এটা সিয়াম সাধনার মাস, তারপর শাওয়াল মাস- এটি ঈদের মাস, তারপর যিলকদ, যিলহজ্ব- এ মাসেই মানুষ হজ পালন করেন; তারা মক্কা মুকাররমা এবং মিনা, আরাফা ও মুযদালিফার মতো

(১) শিক্ষক বা অভিভাবকের উচিত এ পর্যায়ে ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য সহ পাঠ প্রস্তুত করে আনা এবং তাদেরকে হারাম শরীফের প্রাচীন ছবি দেখানো যা এর অতীত অবস্থা তুলে ধরে।

পবিত্র স্থানসমূহে উপস্থিত হন। আর এটাই বছরের সর্বশেষ মাস। সাধারণত প্রত্যেক মাস ত্রিশ দিনে হয়।[১]

ছাত্র: খুব সুন্দর উস্তাদ, আমাদেরকে অনেক কিছু শেখালেন। তবে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করছি যে, 'হস্তি বাহিনী'র বছর কী, তা বুঝলাম না?

শিক্ষক: এ সম্পর্কে একটি বিশাল ও সুন্দর ঘটনা রয়েছে, তোমাদের তা সংক্ষিপ্তভাবে বলছি:

হাবশা নামক দেশের আবরাহা নামে একজন বাদশা ছিল। সেখানে একটি স্থান ছিল যেখানে হজের ন্যায় মানুষজন আগমণ করতো। তবে অনেক মানুষ হজ পালনার্থে মক্কায় আসতো, সেখানে যেত না। তাই এ জালেম বাদশা কাবাঘর ধ্বংস করা পরিকল্পনা করল, যাতে সেখানে কেউ না আসতে পারে এবং অবশেষে সবাই তার দেশে যায়।

অথচ তোমরা জেনেছ যে, আল্লাহর নির্দেশেই ইবরাহীম আঃ কাবাঘর নির্মাণ করেছিলেন। তাই আমরা এটাকে 'বায়তুল্লাহ' বলি, 'হারাম' বলি এবং 'কাবা'ও বলি।

অতঃপর কাবাঘর ধ্বংস করার লক্ষ্যে উক্ত বাদশা বহুসংখ্যক হাতি ও মানুষ জমায়েত করল। যখন তারা এর সন্নিকটে পৌঁছলো, মক্কাবাসীরা তখন এ বিশাল লোকবল সহ হস্তি বাহিনীকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তখন মক্কায় হাতি ছিল না এবং অধিকাংশ মানুষই এটাকে চিনতো না। কেননা তখন তো এ যুগের ন্যায় প্রচারমাধ্যম ও চ্যানেল ছিল না যে তাতে এটার ছবি প্রচার হবে আর তারা দেখবে।[২]

---

(১) এখানে শিক্ষক ছাত্রদেরকে বার মাসের নামগুলো আয়ত্ব করতে প্র্যাকটিক্যাল ষ্টাডি করিয়ে দিতে পারেন। তবে আবশ্যক নয়, যাতে ছাত্ররা চাপ অনুভব না করে।

(২) এখানে শিক্ষক ছাত্রদেরকে তৎকালীন মানুষের অবস্থা এবং আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা না থাকার বিষয়টি পরিস্কার করে দিবেন। তখন রপ্তানী সহজলভ্য না হওয়ায় তারা নিজ এলাকার ফল-ফসল ও জীব-জন্তু ছাড়া ভীনদেশের অন্যান্য এসব বস্তু সম্পর্কে জানতো না- তাও ক্লিয়ার

ঐ সময় রাসূল সাঃ-এর দাদা আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন কাবা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক, অর্থাৎ রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনি ছিলেন মক্কাবাসীদের সর্দার; তাই লোকজন তার নিকট একত্রিত হল এবং এ বিষয়ে চিন্তা-ফিকির করতে লাগলো। আব্দুল মুত্তালিব বললেন: এ পরিস্থিতিতে আমরা কিছুই করতে পারব না। তবে এ ঘরের যিনি রব তিনিই এটাকে রক্ষা করবেন।

তারপর আল্লাহ তায়ালা স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতাবলে অসংখ্য পাখি প্রেরণ করেন। সেগুলো আবরাহার বাহিনীর উপর পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে। এ পাথর ব্যক্তির মাথায় আঘাত করে তার পশ্চাতদেশ দিয়ে বের হয়ে যেত। এভাবে অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। এ ঘটনাটি আল্লাহ তায়ালা 'সূরা ফীল'-এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন:

﴿أَلَمۡ تَرَ كَيۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصۡحَٰبِ ٱلۡفِيلِ ۝١ أَلَمۡ يَجۡعَلۡ كَيۡدَهُمۡ فِي تَضۡلِيلٖ ۝٢ وَأَرۡسَلَ عَلَيۡهِمۡ طَيۡرًا أَبَابِيلَ ۝٣ تَرۡمِيهِم بِحِجَارَةٖ مِّن سِجِّيلٖ ۝٤ فَجَعَلَهُمۡ كَعَصۡفٖ مَّأۡكُولِۢ ۝٥﴾ [الفيل]

অর্থ: *[*তুমি কি দেখনি তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কী করেছিলেন?* তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেননি?* আর তিনি তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি প্রেরণ করেছিলেন।* তারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করে পোড়ামাটির কঙ্কর।* অতঃপর তিনি তাদেরকে করলেন ভক্ষিত শস্যপাতার ন্যায়।*]* সূরা আল-ফীল।

ছাত্র: সুবহানাল্লাহিল আযীম, উস্তাদ, আল্লাহর ক্ষমতা কতই না বিশাল!

শিক্ষক: হ্যাঁ, আমার ছেলেরা: আল্লাহর ক্ষমতা বিশাল এবং তোমাদের ধারণাতীত। লক্ষ্য করে দেখ যালেম আবরাহা ও তার বাহিনীর যুলুমের পরিণতি কেমন হয়েছিল।

করবেন। সেই সাথে যেহেতু তারা বর্তমানে এসব নেয়ামত ভোগ করছে তাই যেন আল্লাহর প্রশংসা করে।

তেমনি লোভের পরিণতিও; কেননা আবরাহা মিথ্যা ও অন্যায়ের মধ্যে থেকেও লোভ করেছিল যেন সব মানুষ তার দেশে একত্রিত হয়।

অনুরূপভাবে তোমরা চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ কিভাবে দুর্বল অসহায়দেরক সাহায্য করেন; তিনি মক্কাবাসীদেরকে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। আব্দুল মুত্তালিব তার রবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, ফলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছেন। তিনি বলেছিলেন: 'এ ঘরের একজন রব রয়েছেন, তিনিই এটাকে রক্ষা করবেন।' স্বীয় রবের ব্যাপারে তার সুদৃঢ় বিশ্বাসের বিষয়টিও চিন্তা করে দেখ।

ছাত্র: তাহলে আমরা যখন আমাদের রবের নিকট দোয়া করব ও কিছু চাইব তখন আমাদের এ বিশ্বাস থাকা আবশ্যক যে, তিনি আমাদের আবেদন ও দোয়ায় সাড়া দিবেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আমার প্রিয় ছাত্ররা। আমাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আক্বীদা হল: আমরা অন্তরিকভাবে বিশ্বাস করব যে, আমাদের রব দোয়ায় সাড়া প্রদান করেন; চাই আমাদের চাওয়া পূরণ হোন বা না হোক। কেননা আমাদের জন্য কোনটি উত্তম ও উপযোগী তা আমাদের চেয়ে আল্লাহই অধিক ভাল জানেন।

উপরন্তু আমাদের উচিত মানুষের প্রতি যুলুম করা থেকে বিরত থাকা অথবা তাদের নিকট ভাল যা কিছু আছে সেটার প্রতি লোভ না করা। নতুবা এটা আমাদেরকে ফেতনা-ফ্যাসাদের দিকে নিয়ে যাবে; পরিণতিতে আল্লাহ তায়ালা এসব যুলুম, সীমালঙ্ঘন ও লোভের কারণে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন করবেন।

এর মানে হল: মক্কা ও হারাম শরীফের বিশেষ সম্মান ও মহত্ম্য রয়েছে। তাই আমাদের উপর আবশ্যক হল এর শিষ্টাচারিতা রক্ষা করে চলা, এটাকে যথাযথ সম্মান করা এবং নিজেদের ঘরবাড়ির চেয়ে এর প্রতি বেশি যত্নশীল হওয়া।[১]

নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর বংশ:

শিক্ষক: তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম বিন আবদে মানাফ বিন কুসাঈ। মাতার নাম আমেনা বিনতে ওয়াহাব।[২]

তার পিতামাতা উভয়েই কুরাইশ গোত্রের ছিলেন; আর এটা আরবের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত গোত্র ছিল। এ গোত্রের শ্রেষ্ঠ বংশ হল হাশেমী বংশ; নবী সাঃ এ বংশেরই সন্তান।

কুরাইশের নসবনামা নবী ইসমাঈল বিন ইবরাহীম আঃ-এর সাথে মিলিত হয়। আর ইসমাঈল আঃ স্বীয় পিতাকে কাবাঘর নির্মাণে সহযোগিতা করেছিলেন, যেমনটি তোমাদেরকে পূর্বের পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে।

ছাত্র: এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের নবী সাঃ-কে সম্ভ্রান্ত বংশের করেছেন এবং তাকে নবী ইবরাহীম আঃ-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর অনাথ অবস্থা:

শিক্ষক: আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ এতিম অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করেন। কেননা তিনি মায়ের গর্ভে থাকাবস্থায় পিতা আব্দুল্লাহ মারা যান। ফলে তার পিতা তাকে দেখেননি।

---

(১) শিক্ষক ছাত্রদের সামনে মক্কাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য উদাহরণস্বরূপ কিছু নমুনা উল্লেখ করবেন। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও সম্মান বজায় রাখা এবং বেচা-কেনায় কাউকে কষ্ট না দেয়া ইত্যাদি ব্যাপারেও তালিম দিবেন।

(২) দেখুন: ইবনে হাজার আসকালানী রচিত 'ফতহুল বারী': ১৪/২৩০।

প্রাচীন আরবদের রীতি ছিল যে, তারা নবজাতক সন্তানদেরকে গ্রামাঞ্চলে দুধপানের ব্যবস্থা করতো, যাতে তারা শহরাঞ্চলের রোগ-বালাই থেকে নিরাপদ থাকতে পারে এবং গ্রামের পরিবেশে তাদের দেহ শক্তিশালী হয়। কেননা গ্রামীণ জীবন কিছুটা রূঢ়তা ও কাঠিন্যতা রয়েছে। তাছাড়া সেখানে অনুশীলন ও প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহারের মাধ্যমে ভাষাও আয়ত্ব করতে পারবে। এরই প্রেক্ষিতে নবী সাঃ-কে হালিমা বিনতে আবু যুয়াইব নিয়ে যান এবং তাকে দুধপান করান।[১]

ছাত্র: উস্তাদ, আরবদের প্রাচীন রীতি সম্পর্কে এবং গ্রামীণ শিশুদের এসব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুন্দর একটি ধারণা পেলাম।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আমার স্নেহের ছাত্ররা, যেমনিভাবে শহরাঞ্চলের শিশুরা গ্রামাঞ্চলের শিশুদের চেয়ে কিছু বিষয়ে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়, তেমনি গ্রামাঞ্চলের শিশুরাও শহরাঞ্চলের শিশুদের চেয়ে কোন কোন বিষয়ে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। কাজেই মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর পরিবেশের একটা প্রভাব রয়েছে। তাই আমাদের উচিত শুধুমাত্র পরিবেশগত কারণে কাউকে ছোট করে না দেখা।

ছাত্র: তাহলে তো এই মহিলা নবী সাঃ-কে দুধপান করানোর মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হয়েছেন।

শিক্ষক: খুব চমৎকার মন্তব্য! এটাই প্রমাণ করে তোমরা মনোযোগী ও বুঝতে পাচ্ছ।

এই মহিলা এর মাধ্যমে বহু কল্যাণ লাভ করেছিলেন।

ছাত্র: উস্তাদ, এ সম্পর্কে আমাদেরকে কি কিছু জানাবেন? তার সাথে কী ঘটেছিল তা জানতে আমাদের আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

---

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/১৬৯।

শিক্ষক: ঠিক আছে: তার দুধের সন্তান ক্ষুধায় কান্না করতো; তার বুকে সন্তানকে পরিতৃপ্ত করার মতো দুধ আসতো না। তারপর সে যখন শিশু নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে দুগ্ধপান করানোর জন্য নিয়ে আসে, তখন থেকে তার বুকের দুধ বৃদ্ধি পায় এবং তার নিজের বাচ্চা ও নবী সাঃ-এর জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের হয়ে যায়।

তার একটি বয়স্ক, রোগা ও দুর্বল গাধা ছিল। নবী সাঃ-কে নিয়ে আসার পর সেটা সবল হয়ে উঠে; ফলে এটা তাদেরকে নিয়ে সতেজতা ও শক্তির সাথে চলা করতে থাকল।[১]

ছাত্র: নিশ্চয় আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এ শিশুকাল বরকতময় ছিল।

শিক্ষক: ঠিক বলেছো ছেলেরা, আমাদের নবীর শিশুকাল বরকত ও আল্লাহর বিশেষ যত্নে ভরপুর ছিল।

নবী সাঃ-এর দুধমাতা হালিমার উপর যে বরকত এসেছিল তা আমাদের রবের নিকট নবী সাঃ-এর বিশেষ মর্যাদার প্রমাণ বহন করে। তাই আমাদের উচিত, আমাদের অন্তরে তার জন্য বিশাল সম্মান ও অবস্থান তৈরি করা।

অনুরূপভাবে এটা এও প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালা দয়ালু, সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। তিনি যাকে ভালবাসেন তার প্রতিপালনের তত্ত্বাবধান করেন ও তাকে মনোনীত করেন। তাই আমাদেরকে এমন আমল করতে হবে যা আমাদের সর্বশক্তিমান মহান রবকে খুশি করে, যাতে তিনি আমাদেরকে ভালবাসেন। কেননা তিনি আমাদেরকে ভালবাসলে আমাদেরও বিশেষ তত্ত্বাবধান করবেন এবং তাওফীক, হেদায়াত ও সুরক্ষা দিবেন। যেমনটি মহান আল্লাহ হাদিসে কুদুসীতে বলেছেন: **(আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকবে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শুনে, আমিই তার চোখ**

(১) দেখুন: মাহদী রিযকুল্লাহ রচিত 'সিরাতুন্নবী': পৃ: ১৫-১১৬।

হয়ে যাই যা দিয়ে সে সবকিছু দেখে, আর আমিই তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, এবং আমিই তার পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় চায়, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। ...) সহীহ বুখারী।[১]

ছাত্র: অনেক সুন্দর ও চমৎকার! সম্ভবত নবী সাঃ-এর দুধমাতার এতিমের প্রতি যত্নের কারণে তার উপর বরকত নাযিল হয়েছিল।

শিক্ষক: চমৎকার মন্তব্য হে আমার স্নেহের ছাত্ররা। হ্যাঁ, যে এতিমের যত্ন নেয় আল্লাহর নিকট তার বিশাল মর্যাদা রয়েছে। রাসূল সাঃ বলেছেন: **(আমি ও এতিমের তত্ত্বধায়ক এ দুটির ন্যায় জান্নাতে থাকব; এ বলে তিনি দুই আঙ্গুল তথা তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয়ের দিকে ইশারা করলেন।)** সহীহ বুখারী ও সুনানে তিরমিযি। নিশ্চিতভাবে এটা বিশাল সম্মান ও পুরস্কার।

অতএব, আমাদের উচিত এতিমকে মহব্বত ও সম্মান করা। তাকে অবজ্ঞা বা অসম্মান করা উচিত নয়; কেননা হতে পারে সে আল্লাহর নিকট প্রিয় ও সম্মানিত। তাই আমরা তাকে সম্মান করবো, ভালবাসবো, সাহায্য করবো ও তাকে খুশি রাখতে চেষ্টা করবো।

ছাত্র: উস্তাদ, তার মাতা আমেনা বিনতে ওয়াহাবের কী খবর?

শিক্ষক: তার মা আমেনা বিনতে ওয়াহাব তাকে খুব ভালবাসতেন ও যত্ন নিতেন। কিন্তু তিনি নবী সাঃ-এর ছয় বছর বয়সকালীন সময়ে মারা যান।[২]

---

(১) ছাত্ররা এই হাদিস শুনে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে পারে; তাই শিক্ষক এর অর্থ ও ব্যাখ্যা 'ফতহুল বারী' থেকে দেখে নিতে পারেন।

(২) দেখুন: তাফসীর ইবনে কাসীর: ৪/৫৫৯।

ছাত্র: সুবহানাল্লাহিল আযীম। তার মানে তিনি সাঃ বাকি জীবন পিতামাতা বিহীন অনাথ অবস্থায় কটিয়েছেন?

শিক্ষক: হ্যাঁ তাই, তিনি মায়ের মৃত্যুর পর পিতামাতা বিহীন অনাথ অবস্থায় কটিয়েছেন।

এটা প্রমাণ করে যে, আল্লাহই সবকিছুর মালিক ও নিয়ন্ত্রণকারী। তিনিই সবকিছু সম্পর্কে অবহিত। তাছাড়া নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর মর্যাদা তার রবের নিকট তো আছেই, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে এতিম করেছেন বিশেষ হিকমতের কারণে যা কেবল তিনিই জানেন।

এতে এও নির্দেশ রয়েছে যে, কখনো কখনো আল্লাহ তাঁর বান্দার ভাগ্যে এমন কিছু রাখেন যা সে অপছন্দ করে, অথচ সেটা তার জন্য কল্যাণকর, কিন্তু আমরা তা জানি না। এটা তার উপর ক্রোধের নির্দেশ করে না, বরং সেটা তার উপর দয়া অনুকম্পাও নির্দেশ করে; কেননা আমরা যা জানি না তা আল্লাহ জানেন। তিনিই বান্দার জন্য যা অধিক মঙ্গলজনক ও উপকারী তা জানেন।

হতে পারে এ অনাথ অবস্থা যা আল্লাহ নবী সাঃ-এর জন্য নির্ধারণ করেছেন তা নবী সাঃ-কে এমন কিছু শিক্ষা দিয়েছে যা থেকে তিনি নবুওয়ত, রিসালাত ও দাওয়াতে সুবিধা পেয়েছেন।

ছাত্র: আমি অনুভব করছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর শৈশবের মাঝে অনেক উপদেশ ও হিকমত নিহিত রয়েছে। এতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ যত্ন ও বরকত ছিল। অনুরূপভাবে তাতে পরীক্ষা ও শিক্ষাও রয়েছে। উস্তাদ, আমাদের নবী সাঃ-এর শৈশবকে আমি খুব ভালবাসি।

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধান:

শিক্ষক: নবী সাঃ-এর মা মারা যাওয়ার পর থেকে দাদা আব্দুল মুত্তালিব তার দেখাশুনা ও যত্ন নিতে থাকেন।

সে সময় আব্দুল মুত্তালিব নিজ সম্প্রদায়ের সর্দার ছিলেন। তার এমন আসন ছিল যেখানে অন্য কেউ বসতে পারতো না। কাবার ছায়াতলে তার বিছানা ছিল যার চারপাশে তার সন্তানেরা বসতো। কিন্তু সেখানে নবী সাঃ তার দাদার সাথেই বসতেন।

আল্লাহ তায়ালা দাদা আব্দুল মুত্তালিবের অন্তরে নাতী মুহাম্মাদ সাঃ-এর জন্য বিশাল মহব্বত তৈরি করে দেন; তাই তিনি নাতীর খুব যত্ন নিতেন, তাকে কাছে কাছে রাখতেন এবং তার ঘুমের সময় কাউকে কাছে আসতে দিতেন না।[১]

ছাত্র: এটা দাদার পক্ষ থেকে তার জন্য ছিল আন্তরিক মহব্বত, এমনকি নিজ সন্তানের চেয়েও; কেননা তিনি নিজ বিছানায় তাকে বসাতেন যেখানে সন্তানদেরকেও বসাতেন না।

শিক্ষক: হ্যাঁ, তোমরা যেমনটি বলেছো তা এমনই ছিল। তবে তোমরা কি জান এ মহব্বত কে তার দাদার হৃদয়ে তেরি করেছিলেন?

ছাত্র: তিনি মহান আল্লাহ।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আল্লাহই তার দাদা আব্দুল মুত্তালিবের অন্তরে এ বিশাল মহব্বত তৈরি করে দেন। আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তার জন্য কল্যাণের উপকরণগুলো অনুগত করে দেন। তাই আমরা নবী সাঃ-কে আব্দুল মুত্তালিব কর্তৃক লালনপালন থেকে বুঝতে পারি যে, আল্লাহর হাতেই সকল কিছুর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব; তিনিই অন্তরসমূহ ও মহব্বতের মালিক; যেভাবে ইচ্ছে তিনি সেভাবেই তা পরিচালনা করেন। আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করি তবে তিনি আমাদেরকে ভালবাসবেন ও

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/২২৩।

আমাদেরকে তাওফীক দিবেন এবং আমাদের জন্য মানুষের অন্তরে ভালবাসা তৈরি করে দিবেন। যেমন হাদিসে এসেছে: **(কোন বান্দাকে যখন আল্লাহ তায়ালা ভালবাসেন তখন জিবরীল আঃ-কে ডেকে বলেন: আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি। অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। তখন জিবরীল আঃ সমগ্র ফেরেশতাদের মাঝে এ কথা ঘোষণা করে বলেন: নিশ্চয় আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসেন, কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাস। তারপর যমীনবাসীদের অন্তরে তার জন্য ভালবাসা অবতীর্ণ হয়।)** সহীহ বুখারী।

ছাত্র: এটাতো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটা আমাদের জন্য আল্লাহর মহব্বত অবধারিত করে এবং আমাদেরকে সৎকাজে অনুপ্রাণিত করে।

চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধান:

শিক্ষক: নবী সাঃ-এর মায়ের মৃত্যুর দু'বছর পর দাদা আব্দুল মুত্তালিবও মৃত্যুবরণ করেন। তখন নবী সাঃ-এর বয়স ছিল আট বছর। এর তাকে চাচা আবু তালিব লালন পালন করতে থাকেন।

ছাত্র: সুবহানাল্লাহ, এটাতো নবী সাঃ-এর শৈশবকালের পরীক্ষা!

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটা পরীক্ষা ছিল, তবে এটা আল্লাহ পক্ষ থেকে অনুগ্রহও বটে। এতে উম্মতের জন্য এই শিক্ষাও রয়েছে যে, বালা-মসিবত ও পরীক্ষা সব সময়ই আল্লাহর পক্ষ হতে গযব হিসেবে আসে না, বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহ হিসেবেও আসে এবং তাতে এমন হিকমত থাকে যা আমরা জানি না; আমাদের অজ্ঞতা ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে।

সম্ভবত এ পরীক্ষায় নবী সাঃ-এর জন্য প্রশিক্ষণ ছিল, যাতে তিনি আল্লাহর পথে দাওয়াতের কষ্ট বা বাধা-বিপত্তিকে দৃঢ়তা ও সহনশীলতার মাধমে মোকাবেল করতে পারেন। এ বিষয়ে অচিরেই তোমরা জানতে পারবে, ইনশা আল্লাহ।

ছাত্র: উস্তাদ, নবী সাঃ-এর চাচা তাকে কিভাবে লালন পালন করেছিলেন? সম্ভবত তার তার দাদা আব্দুল মুত্তালিবের মতই।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এখানেও পূর্ণ মহব্বত, যত্ন ও গুরুত্বের সাথে তিনি প্রতিপালিত হন; কেননা চাচা আবু তালেবও তাকে খুব ভালবাসতেন।

আবু তালেব স্বীয় ভাতিজা মুহাম্মাদ সাঃ-কে সাথে না নিয়ে ঘুমাতেন না। কোথাও গেলে তাকে সাথে নিয়ে যেতেন, তার জন্য বিশেষ খাবারের ব্যবস্থা করতেন এবং মুহাম্মাদ সাঃ উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত খাবার খেতেন না। এভাবেই তিনি পরম যত্ন ও প্রতিপালনে তাকে আগলে রেখেছিলেন।[১]

ছাত্র: চমৎকার, এই পরিবারটি ছিল ভালবাসা, দায়িত্ববোধ ও আদর-যত্নে পরিপূর্ণ।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটা ছিল শ্রেষ্ঠ পরিবার; কেননা আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে আরবের শ্রেষ্ঠ পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়েছেন। তাই আমাদেরও এমন ভালবাসায় পরিপূর্ণ পরিবার গড়া উচিত, যেখানে একে অপরের দায়িত্ব নেবে ও পরস্পরকে সাহায্য করবে- যেমনটি আমাদের দ্বীন আমাদেরকে শিক্ষা দেয়।[২]

কর্মজীবন:

শিক্ষক: সময়ের সাথে সাথে এবং চাচা আবু তালিবের পিতৃস্নেহে ও তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন মুহাম্মাদ সাঃ প্রাণচঞ্চল যুবকে পরিণত হন। অন্যান্য যুবকদের ন্যায় তিনি কাজ করাকে পছন্দ করতে থাকেন।

---

(১) দেখুন ইবনে সাদ রচিত 'তাবাকাতুল কুবরা': ১/১১৯-১২০।

(২) এ পর্যায়ে শিক্ষক ছাত্রদেরকে প্রথমে পারিবারিক, তারপর সামাজিক দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা ও মমত্ববোধের কিছু চিত্র ও নমুনা বর্ণনা করবেন এবং ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজের উপর এর প্রভাব উল্লেখ করবেন।

প্রথমে অর্থের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করেন। যেমনটি তিনি বলেছেন: **(আল্লাহ এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি ছাগল-ভেড়া চরাননি। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন: হ্যাঁ, আমিও কিছু কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল-ভেড়া চরাতাম।)** সহীহ বুখারী।

ছাত্র: সুবহানাল্লাহ! সকল নবীই ছাগল চড়িয়েছেন?

শিক্ষক: এর কারণ কী হতে পারে তা ভেবে হয়তো তোমরা অবাক হচ্ছ? এখনি সে বিষয়ে তোমাদেরকে বলবো ইনশা আল্লাহ।

ছাগলের কিছু স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে; এরা কোমল ও শান্ত স্বভাবের হয়। এদেরকে যে লালন পালন করবে তাকে ধৈর্য্যশীল হতে হয়; এজন্য তাকে উপযুক্ত চারণভূমি চয়ন করতে হয় যাতে এরা চড়ে বেড়াতে পারে। এদের পানি পানের জন্যও উপযুক্ত পানির ঘাটে নিয়ে যেতে হয়। হিংস্র জন্তু যেন না খেয়ে ফেলে বা আক্রমণ না সেজন্য বিশেষ সুরক্ষা দিতে হয়।

উম্মতের বিষয়েও একজনকে রাসূলকে জানতে হবে যে, তিনি কীভাবে তার উম্মতকে শত্রুদের কবল থেকে হেফাযত করবেন এবং তাদের জন্য ইহকালীন ও পরকালীন উপযুক্ত ও উপকারী বিষয় চয়ন করবেন, আর তাদের উভজগতের জন্য যা ক্ষতিকারক তা থেকে তাদেরকে সতর্ক করবেন। তাকে জানতে হবে যে, তিনি কিভাবে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ ও মতৈক্যের উপর স্থির রাখবেন- যেমনভাবে একজন রাখাল তার ছাগলগুলোকে একত্রিত করে যখন কোনটি দলছুট হয়ে যায় অথবা দল থেকে বের হয়ে আলাদা ঘাসপালা খেতে ব্যস্ত থাকে।

কাজেই এভাবে প্রত্যেক রাসূলই ছাগল চড়িয়ে এসব ও অন্যান্য ফায়দা শিখেছেন; হিকমত ও সামর্থ্যের সাথে নিজ সম্প্রদায় ও উম্মতকে যেন পরিচালনা করতে পারেন।

ছাত্র: উস্তাদ, প্রত্যেক কিছুতেই মহান আল্লাহ পূর্ণাঙ্গ হিকমত প্রকাশ পায়। তবে আমরা না জানার কারণে সে বিষয়ে আমরা চিন্তা ও অনুধাবন করি না। উস্তাদ, আমাদের নবী সাঃ-এর সিরাত শুনিয়ে আমাদের জ্ঞানকে আলোকিত করেছেন।

শিক্ষক: রাসূল সাঃ-এর এ কাজে জড়িত হওয়াতে তার বিনয়তার নির্দেশ করে। তিনি কিন্তু বলেননি: আমি এরূপ কাজ করব না, বরং অন্য কাজ করব। সুতরাং আমরা এ থেকে জানতে পারলাম যে, মানুষকে বিনয়ী হতে হবে এবং আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন সে যেন সে কাজই করে।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ আরেকটি কাজ করেছেন। সেটি হল ব্যবসা-বাণিজ্য। তিনি মানুষের নিকট আমানতদারিতা ও সততায় প্রসিদ্ধ ছিলেন; তিনি কখনো কারো খেয়ানত করেননি, কোন বিষয়েই কখনো মিথ্যা বলতেন না।

সে সময় খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ নামে একজন মহিলার বিশাল ব্যবসা ছিল। তিনি নিজের ব্যবসায়িক কাজের জন্য একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজছিলেন। তাই তিনি নবী সাঃ-এর কাছে তার বাণিজ্যিক কাজে সিরিয়ায় যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে পাঠালেন, এই শর্তে যে, অন্যান্য বণিকদের যা পারিশ্রমিক দেন তার চেয়ে উত্তম কিছু তাকে দেবেন। এটা মূলত তার সততা, আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতার কারণে। রাসূল সাঃ প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন এবং খাদীজার পণ্য-সামগ্রী নিয়ে তার গোলাম মায়সারাকে সাথে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন।

ছাত্র: উস্তাদ, এ থেকে বুঝতে পারলাম যে, ব্যবসায় সততা ও আমানতদারিতা গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষক: সুন্দর বলেছো আমার বাচ্চারা, খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদকে যে বিষয়টি নবী সাঃ-কে তার বাণিজ্যিক কাজে সিরিয়ায় পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করেছে তা ছিল নবী সাঃ-এর সততা ও আমানতদারিতা। অতএব, যখন আমরা এই বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে পারব,

তখন আল্লাহ আমাদের ভালবাসবেন, লোকেরাও আমাদের ভালবাসবে এবং আমরা আমাদের জীবনে সফল হতে পারব। আর তখনই বিভিন্ন কাজ ও সাফল্যের উপায়সমূহ আমাদের কাছে ধরা দিবে। তাই আমাদের কর্তব্য হল, আমরা সবকিছুতে সত্যবাদী ও সৎ হতে সচেষ্ট থাকব।

নবী সাঃ-এর বিবাহ:

শিক্ষক: তোমরা জানতে পেরেছে যে, নবী সাঃ খাদীজা রাঃ-এর ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ করতেন এবং তিনি ছিলেন সৎ, আমানতদার ও আন্তরিক- যার কারণে খাদিজা রাঃ তাকে বিয়ে করতে আবেদন করেন।

ছাত্র: উস্তাদ, খাদিজা রাঃ-এর বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল দয়া করে আমাদের বুঝিয়ে বলবেন? তার চরিত্র কি রাসূল সাঃ-এর মত উন্নত ছিল?

শিক্ষক: একটি সুন্দর ও চমৎকার প্রশ্ন। খাদিজা রাঃ একজন দয়ালু ও সম্ভ্রান্ত মহিলা ছিলেন। তাকে তার কওমের লোকেরা 'তাহেরা' তথা পবিত্রা বলে ডাকত। কারণ, তিনি ছিলেন এমন একজন নারী যিনি প্রতিশ্রুতি পরায়ণ, সততা ও আমানতদারিতা ইত্যাদি সুন্দর গুণের অধিকারী এবং তিনি ছিলেন বিত্তশালী ও দৃঢ়চেতা। রাসূলুল্লাহ সাঃ পঁচিশ বছর বয়সে তাকে বিয়ে করেছিলেন এবং তিনিই ছিলেন প্রথম নারী যাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন।

তিনি রাসূল সাঃ-এর ঔরশের যেসব পুত্র ও কন্যা সন্তান জন্ম দেন:

আল-কাসিম: নবী সাঃ-এর ডাকনাম ছিল এ নাম থেকেই; তাই তাকে মানুষ ডেকে বলতো: হে আবুল কাসিম।

যয়নব: তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর বড় কন্যা। তার খালাতো ভাই আবুল আস বিন রাবি' তাকে বিয়ে করেন।

রুকাইয়াঃ উসমান বিন আফফান রাঃ-এর স্ত্রী।

উম্মে কুলসুম: রুকাইয়া রাঃ মারা যাওয়ার পর উসমান বিন আফফান রাঃ তাকে বিয়ে করেন।

ফাতিমা: আলী বিন আবি তালিব রাঃ তাকে বিয়ে করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ: ত্বীব বা তাহের উপনামেও তাকে ডাকা হতো। তিনি শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন।[১]

হিলফুল ফুযূল:

শিক্ষক: যেহেতু মানুষের মধ্যে, বিশেষ করে প্রাক-ইসলামী যুগে যুলুম-অবিচার সংঘটিত হতো, কেননা তখন মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা প্রবল ও ব্যাপক ছিল। ঐ প্রেক্ষিতে কুরাইশ গোত্রগুলো একত্রিত হয়ে একটি জোট গঠন বা চুক্তিতে পৌঁছায় এবং তারা একে 'হিলফুল ফুযূল' নাম দেয়। তারা সম্মত হয়েছিল যে, তারা মক্কার অধিবাসীদের মধ্যে বা সেখানে প্রবেশকারী অন্য কাউকে মযলুম অবস্থায় পেলে, তারা তার পক্ষে দাঁড়াবে এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাকে সমর্থন করবে যতক্ষণ না সে তার অধিকার গ্রহণ করবে এবং তার উপর থেকে অন্যায় দূর হবে। নবী সাঃ এই শপথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং এতে উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্র: এটি একটি বিস্ময়কর চুক্তি যাতে দুর্বলরা সহযোগিতা পাবে।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটি মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সমর্থন। নবী হওয়ার পর নবী সাঃ সাহাবীদের কাছে এটা উল্লেখ করতেন এবং বলতেন যে তিনি এই জোটে যোগ দিয়েছিলেন এবং এই জোটে তার উপস্থিতি তার কাছে দামি উটের মালিক হওয়ার চেয়েও বেশি প্রিয় ছিল। আর যদি তাকে ইসলামে এটা করতে বলা হতো, তাহলে

---

(১) দেখুন: সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/২০২, তাবাকাতুল কুবরা: ৮/১৯-৩৯।

তিনি তাতে সম্মত হতেন। কারণ, তিনি যুলুম ও অত্যাচারীকে পছন্দ করে না এবং তিনি নিজেও কখনো কারো উপর যুলুম করেননি। স্বয়ং তিনি বলেছেন: (আমি আবদুল্লাহ বিন জাদআনের বাড়িতে সেই চুক্তিতে উপস্থিত ছিলাম, যা আমার কাছে দামি লাল উটের মালিক হওয়ার চেয়েও অধিক পছন্দনীয়। যদি ইসলামেও এর প্রতি দাবি তুলা হতো তাহলে আমি তাতে সাড়া দিতাম) [১]

অতএব, আমাদের অবশ্যই যুলুম-অন্যায়কে ঘৃণা করতে হবে এবং আমাদের সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং অন্য কারো প্রতি আমরা যুলুম-অত্যাচার করবো না। আমরা অন্যায় সহ্য করবো না। বরং আমরা নির্যাতিতদের পাশে দাঁড়াই এবং তার অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত তাকে সাহায্য করি। কেননা মহান আল্লাহ যুলুম নিষিদ্ধ করেছেন এবং এর জন্য শাস্তি দেবেন। হাদিসে কুদুসীতে ইরশাদ হয়েছে: **(হে আমার বান্দাগণ, আমি নিজের প্রতি যুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের মধ্যে তা হারাম করেছি, সুতরাং তোমরা একে অপরের প্রতি যুলুম করো না।)** সহীহ মুসলিম।

ছাত্র: এগুলো চমৎকার নৈতিকতা, আমাদের অবশ্যই এসব বেশিষ্ট্য গ্রহণ করা উচিত। হাদিসে "লাল উট" উল্লেখ করা হয়েছে, এর অর্থ কী?

শিক্ষক: লাল উট মানে: সর্বোত্তম ও উন্নত প্রজাতির উট।

কাবাঘর নির্মাণ:

শিক্ষক: প্রিয় ছাত্ররা, তোমরা কি কাবাঘর নির্মাণের ইতিহাস জান?

ছাত্র: উস্তাদ, আমরা অল্প জানি, যেমনটা আপনি ইতিপূর্বে আমাদেরকে জানিয়েছেন।

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/১৪১-১৪২।

শিক্ষক: আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি যে, আল্লাহর নির্দেশে সর্বপ্রথম কাবাঘর নির্মাণ করেন ইবরাহীম আঃ। আর তাকে এ কাজে সহযোগিতা করেছিলেন তার সন্তান ইসমাঈল আঃ। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَٰهِـۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإِسۡمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧]

অর্থ: [আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাঘরের ভিত্তি স্থাপন করছিলেন, (তারা বলছিলেন) হে আমাদের রব! আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।] সূরা আল-বাকারা: ১২৭।

বহু বছর ও সময় অতিক্রম হওয়ার পর কাবার দেয়াল ক্ষয় হতে লাগল। ফলে কুরাইশরা কাবাঘরের পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন নবী সাঃ-এর বয়স হয়েছিল (৩৫) পঁয়ত্রিশ বছর।[১]

নির্মাণকাজ যখন হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত পৌঁছে, তখন তাদের মধ্যে কে হাজরে আসওয়াদকে স্ব-স্থানে প্রতিস্থাপন করবে তা নিয়ে তারা মতবিরোধ শুরু করল; প্রত্যেকেই তা উত্তোলন করে স্ব-স্থানে রাখার মর্যাদা অর্জন করতে চায়।

ছাত্র: তাহলে তো তারা কাবাঘরকে সম্মান করতো এবং এর গুরুত্ব জানতো?

শিক্ষক: হ্যাঁ, তারা এটাকে যথাযোগ্য সম্মান করতো; এটার পুনর্নির্মাণে তাদের গুরুত্বারোপ এবং হাজরে আসওয়াদকে স্ব-স্থানে প্রতিস্থাপনে তাদের মতবিরোধের চেয়ে এ বিষয়ে বড় কোন দলীল হতে পারে না। তারা যদি প্রাক-ইসলামী যুগে এটা সম্মান প্রদর্শন করে থাকে, তাহলে এটাকে সম্মান প্রদর্শনে আমরা তো আরো বেশি হকদার; কেননা স্বয়ং আল্লাহ এটাকে মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন এবং আমাদের নবী সাঃ, সাহাবায়ে কিরাম ও সমস্ত মানুষও এটাকে সম্মান করে। আল্লাহ কর্তৃক এটাকে সম্মান প্রদর্শনের

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/২৪-২৫।

একটি উদাহরণ হলো: যখন আবরাহা কাবাঘর ধ্বংস করতে আসে তখন আল্লাহ তায়ালা তার বাহিনীকে ধ্বংস করে দেন। ইতিপূর্বে তোমরা এ সম্পর্কে জেনেছ।

ছাত্র: উস্তাদ, হাজরে আসওয়াদকে স্ব-স্থানে প্রতিস্থাপনে তাদের মতবিরোধের প্রেক্ষিতে তারা কী করেছিল?

শিক্ষক: তারা বলল, এ রাস্তা দিয়ে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে আমরা তাকে বিচারক নির্ধারণ করবো। তখনি তাদের কেউ কেউ বলে উঠলো, এইতো আল-আমীন আসছে! ফলে তারা তাকেই বিচারক মেনে নিল। অর্থাৎ তার কাছে এ বিষয়ে ফয়সালা কামনা করল।

তখন নবী মুহাম্মাদ সাঃ একটি চাদরে পথরটি রাখেন। তারপর গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ডাকলেন; তারা সবাই মিলে চাদরের পাশ ধরে পাথরটি উত্তোলন করলেন, তারপর রাসূল সাঃ সেটাকে স্ব-স্থানে স্থাপন করে দেন। এভাবে সবাই এ কাজে অংশগ্রহণ করলো।[১]

ছাত্র: উস্তাদ, আল্লাহর রাসূল সাঃ ছিলেন হিকমতওয়ালা ও তাওফীকপ্রাপ্ত।

শিক্ষক: হ্যাঁ, তিনি প্রজ্ঞার অধিকারী ও আল্লাহর দয়ায় সঠিক সিদ্ধান্তদাতা ছিলেন। আল্লাহই তাকে ঐ চমৎকার পরিকল্পনার বুদ্ধি দেন- যা তাদেরকে মতানৈক্যে পৌঁছায়।

ছাত্র: একটা বিষয় খেয়াল করলাম যে, তারা মুহাম্মাদ সাঃ-কে দেখে বলেছিল: এইতো আল-আমীন এসেছে। তারা কেন আল-আমীন বলেছিল?

শিক্ষক: চমৎকার, খুব সুন্দর মন্তব্য- যা প্রমাণ করে যে, তোমরা তোমাদের নবীর সিরাত ফলো করছো!

---

(১) মুসনাদে আহমাদ: (৩/৪২৫)।

আমাদের নবী সাঃ স্বীয় সম্প্রদায়ের সকলের নিকট আল-আমীন নামে পরিচিত ছিল। তারাই তাকে এ উপাধি দিয়েছে। কেননা তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী; তারা কখনো তার মাঝে মিথ্যা অথবা খারাপ চরিত্র দেখতে পায়নি। ফলে তিনি ছিলেন আমানতদার ও সৎ; যাবতীয় নৈতিক গুণ সম্পন্ন।

তাই আমাদেরও উচিত নৈতিকতায় ও আমানতদারিতায় তার মতো হওয়া; যাতে মানুষ আমাদেরকে ভালবাসে এবং আল্লাহ তায়ালাও আমাদেরকে পছন্দ করেন ও তাওফীক দান করেন। কেননা আল্লাহ যাবতীয় উত্তম নৈতিকতাকে ভালবাসেন।[১]

(১) শিক্ষক ছাত্রদেরকে তাদের দৈনন্দিন জীবনের আচরণগত কিছু আমানতদারিতার উদাহরণ উল্লেখ করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়:

নবুওয়ত লাভ হতে হিজরত পর্যন্ত

নবুওয়ত লাভ:

ছাত্র: উস্তাদ, নবুওয়ত লাভ বলতে কী বুঝায়?

শিক্ষক: আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে নিজ ইচ্ছামত যে কাউকে রাসূলরূপে মনোনীত করেন, তারপর বিধিনিষেধ দিয়ে তার নিকট অহী নাযিল করেন। যেমন কোন রাসূলের নিকট তিনি ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং সে তাকে আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত করে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ; তার নিকট জিবরাঈল আঃ আসতেন এবং তাকে আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে অবহিত করতেন।[১] অথবা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কোন নবীর সাথে সরাসরি কথা বলতেন, তবে নবী স্বীয় রব আল্লাহকে দেখতে পেতেন না। যেমন নবী মুসা আঃ; স্বয়ং আল্লাহ তার সাথে কথা বলেছেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿وَرُسُلًا قَدۡ قَصَصۡنَٰهُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرُسُلٗا لَّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا﴾ [النساء: ١٦٤]

অর্থ: [আর অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমি আপনাকে পূর্বে দিয়েছি এবং অনেক রাসূল, যাদের বর্ণনা আমি আপনাকে দেইনি। আর অবশ্যই আল্লাহ মুসার সাথে কথা বলেছেন।] সূরা আন-নিসা: ১৬৪।

এভাবে আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে মনোনীত করেন এবং তাকে রিসালত দিয়ে অহী করেন, তখন তিনি রাসূল হয়ে যান। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর নিকট যখন জিবরাঈল আঃ অহী নিয়ে আগমণ করলেন তখনই তিনি রাসূল হলেন। আর এটাকেই নবুওয়ত লাভ বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাকে রিসালত দিয়ে প্রেরণ করলেন ফলে তিনি নবী হলেন। এখন কি তোমরা 'নবুওয়ত লাভ' কী তা বুঝতে পেরেছ?

(১) ছাত্রদের প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষক এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত বলবেন।

ছাত্র: হ্যাঁ, আমরা তা বুঝতে পেরেছি। তবে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর নিকট জিবরাঈল কিভাবে আগমণ করতেন?

শিক্ষক: এটার উত্তর দেয়ার আগে আমি তোমাদেরকে বলতে চাই যে, জিবরাঈল আগমণ করার পূর্বে মুহাম্মাদ সাঃ নবী ছিলেন না। বরং যেদিন তার উপর অহী নাযিল হয়েছিল সেদিন থেকে তার নবুওয়তের সূচনা হয়েছে। এর বিবরণ হল নিম্নরূপ:

অহী নাযিল হওয়ার পূর্বে কিছু পূর্বাভাস ছিল। নবী সাঃ নবুওয়াত লাভের আগে কোন স্বপ্ন দেখলে তা বাস্তবে প্রতিফলিত হত। এরপর তার নিকট নির্জনে থাকা পছন্দনীয় হতে লাগল, ফলে তিনি লোকালয় থেকে দূরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে থাকতে ভালবাসতেন। ফলশ্রুতিতে তিনি হেরা গুহায় গিয়ে একাধারে কয়েক রাত্রি ইবাদতে মগ্ন থাকতেন, তারপর পরিবারের নিকট ফিরে আসতেন। কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে পুনরায় সেখানে চলে যেতেন।[১] যখন নবী সাঃ-এর বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ হল তখনই তার নিকট অহী নাযিল হয়, আর সেখানেই অহী নিয়ে জিবরাঈল আঃ আগমণ করেন।

ছাত্র: হেরা গুহাটি কোথায় অবস্থিত?

শিক্ষক: মক্কার পূর্বদিকে হেরা নামক একটি পাহাড় রয়েছে। এর চূড়ায় একটি বিশাল গর্ত বা গুহা রয়েছে। সেটাই নামই হেরা গুহা। এটা মক্কার জনবসতি থেকে দূরে ছিল; কেননা তৎকালীন মক্কার বাসিন্দাদের সংখ্যা খুব কম ছিল। আর এখন লোকে লোকারণ্য হওয়ায় ঘরবাড়িতে ছেয়ে গেছে।

ছাত্র: জিবরাঈল আঃ এসে নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে কী বললেন?

---

(১) সহীহ বুখারী: ০৩।

শিক্ষক: জিবরাঈল আঃ আমাদের নবীকে বললেন: 'পড়'। তখন নবী সাঃ বললেন: 'আমি তো পড়তে পারি না'। কেননা আমাদের নবী ছিলেন নিরক্ষর। অর্থাৎ তিনি পড়তে ও লিখতে পারতেন না।

উক্ত ঘটনার বর্ণনা করে নবী সাঃ বলেন: *(***তারপর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হল। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন'। আমি বললাম, আমি তো পড়তে পারি না। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হল। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ুন'। আমি জবাব দিলাম, আমিতো পড়তে পারি না। তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন, এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিমান্বিত"।***)*[১] আর এটাই ছিল অহীর সূচনা।

ছাত্র: ঐ অবস্থাটি তো হালকা ছিল না! রাসূল সাঃ কি ভয় পেয়ে ছিলেন? এরপর তিনি কী করেছিলেন?

শিক্ষক: হ্যাঁ, রাসূল সাঃ ভয় পেয়ে ছিলেন। যেমন ঐ হাদিসটিতে এসেছে: *(***অতঃপর এগুলো নিয়ে আল্লাহর রাসূল সাঃ প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন তার অন্তর কাঁপছিল। তিনি খাদীজা রাঃ-এর নিকট এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর', 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর।' ফলে তারা তাকে চাদর দ্বারা আবৃত করলেন। অবশেষে তার ভয় দূর হলো।***)**

ছাত্র: 'আমাকে চাদর দ্বারা আবৃত কর' এর মানে কী?

---

(১) সহীহ বুখারী: ০৩।

শিক্ষক: এর অর্থ হলো আমার গায়ে চাদর জড়িয়ে দাও এবং আমার উপর লেপ/কম্বল দিয়ে দাও। ভয় কেটে গেলে তিনি স্বীয় স্ত্রী খাদীজা রাঃ-কে ঘটনাটি জানালেন এবং বললেন: আমি তো আমার নিজেকে নিয়ে শংকা বোধ করছি।

স্নেহের ছাত্ররা, এ থেকে বুঝা যায় যে, অহী এবং যে বিষয়টির দায়িত্ব আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে অর্পণ করেছেন তা সহজ বিষয় নয়। বরং এটা বিশাল এক ব্যাপার! তবে এর সওয়াবও অনেক বেশি। কেননা যখন আল্লাহ আমাদেরকে কোন বিষয়ে আমাদেরকে আদেশ করেন আর আমরা সেটা তাঁর পছন্দনীয় পদ্ধতীতে সম্পাদন করি, তখন তিনি আমাদেরকে বিশাল সওয়াব ও প্রতিদান দান করেন। তাই আমাদের উচিত এ মহান দ্বীন পালনে সচেষ্ট হওয়া এবং তা উত্তমভাবে পালন করা।

ছাত্র: উস্তদ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। তখন খাদীজা রাঃ নবী সাঃ-কে কী বলছিলেন?

শিক্ষক: খাদীজা রাঃ ছিলেন একজন বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ নারী। তিনি ভাল করেই জানতেন যে, তার স্বামী একজন উদার, সৎ, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। যার এরূপ গুণাবলী রয়েছে তাকে আল্লাহ কখনো ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। বরং তাকে বহু ও বিশাল কল্যাণ দান করবেন। তাই খাদীজা রাঃ তার স্বামী রাসূল সাঃ-কে বললেন: (কখনো নয়! আল্লাহর শপথ, আল্লাহ্ আপনাকে কখনও লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানদারি করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।)[১]

ছাত্র: এগুলো তো নবী সাঃ এর সুন্দর গুণ ছিল, কিন্তু কয়েকটি বুঝতে পারলাম না?

(১) পূর্বোক্ত।

শিক্ষক: হ্যাঁ, সুন্দর গুণাবলী। এগুলো উত্তম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যাবলী। যার মধ্যে এসব গুণ রয়েছে তাকে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত করেন এবং অনেক কল্যাণ দান করেন। (আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন) এর অর্থ হল: আপনি আত্মীয়দেরকে দান করা, তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা ও সহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে সম্পর্ক বজায় রাখেন। আর (অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন) এর অর্থ হল: যে স্বতন্ত্রভাবে তার কাজ করত পারে না, কোন কাজ যা অন্যের সাহায্য ছাড়া সম্পাদন করতে পারে না, এমন ব্যক্তিকে আপনি সহযোগিতা করেন। (নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন) অর্থাৎ গরীব-ফকীরের উপকার করেন ও তাকে সাহায্য করেন এবং মানুষকে এমন কিছু দেন যা তারা অন্যের কাছে পায় না। (মেহমানদারি করেন) অর্থাৎ তাদেরকে আপ্যায়ন করা ও সৌজন্যতার সাথে সাক্ষাত করার মাধ্যমে সমাদর করেন। আর (হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন) এর অর্থ হল: প্রত্যেক কল্যাণকার কাজে ও অভাবীকে সাহায্য সহযোগিতা করেন। এটা পূর্বোক্ত সব গুণ সহ আরো অনেক গুণকে শামিল করে।[১]

ছাত্র: তাহলে উম্মুল মোমিনীন খাদীজা রাঃ-এর এ কথাগুলো নবী সাঃ-কে প্রশান্তি দিয়েছে।

শিক্ষক: হ্যাঁ, অবশ্যই। কেননা যে মানুষ ভাল কাজ করে, তারপর সে শঙ্কাজনক কিছুতে আক্রান্ত হয়, তখন তাকে তার ভাল গুণগুলো স্মরণ করিয়ে দিলে তার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে ও স্বস্তি পায়। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা সৎকর্মের প্রতিদানে তার চেয়ে অধিক উত্তম কিছু দান করেন।

অতঃপর নবী সাঃ-কে নিয়ে খাদীজা রাঃ চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফাল এর নিকট গেলেন। তিনি ছিলেন খুব ধার্মিক ও অতিবৃদ্ধ। তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

---

(১) ফতহুল বারী: ১/২৪-২৫।

অতঃপর নবী সাঃ-এর সাথে যা যা ঘটেছে তা সবই তাকে অবহিত করলেন। তখন ওয়ারাকা বিন নাওফাল বললেন, এটা সেই বার্তাবাহক যাকে আল্লাহ মূসা আঃ-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন। অর্থাৎ তোমার নিকট যিনি এসেছিলেন তিনি সেই বার্তাবাহক ফেরেশতা যে নবী মুসা আঃ-এর নিকট আগমণ করতেন।

তারপর নবী সাঃ-এর স্পষ্ট হল যে, তার নিকট যে আগমণ করেছিল সে একজন ফেরেশতা জিবরাঈল আঃ। আল্লাহই তাকে তার নিকট প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি নবী ও রাসূল হন।

ছাত্র: তারপর কি জিবরাঈল আঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর নিকট পুনরায় এসেছেন?

শিক্ষক: হ্যাঁ, এ ঘটনার পর থেকে নবী সাঃ-এর উপর অনবরত অহী নাযিল হয়েছে। কিছুদিন বিরতির পরই জিবরাঈল আঃ পুনরায় আগমণ করে নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর কাছে আল্লাহর অহী পৌঁছে দেন। তখন আল্লাহর এ বাণী নাযিল হয়:[১]

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ٢﴾ [المدثر: ١-٢]

অর্থ: [হে বস্ত্রাবৃত!* উঠ, অতঃপর সতর্ক কর।] সূরা আল-মুদ্দাসসির: ১-২।

ছাত্র: উস্তাদ, নবী সাঃ পড়তে বা লিখতে পারতেন না, তাহলে জিবরাইল যা নিয়ে নাযিল হতে তা তিনি কিভাবে মুখস্ত করতেন?

শিক্ষক: চমৎকার, তোমাদের অতি প্রিয় নবী সাঃ সম্পর্কে তোমাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ।

(১) ফতহুল বারী: ১/২৬।

ছাত্র: হ্যাঁ, আমরা নবী সাঃ-কে খুব ভালবাসি, এমনকি আমাদের জীবনের চেয়েও বেশি।

শিক্ষক: নবী সাঃ-এর উপর যখন অহী নাযিল হত তখন তিনি ঠোট নাড়াতেন, তা মুখস্ত করার জন্য। তা বরকতময় আল্লাহর কালাম হওয়ায় তিনি দ্রুত সেগুলো মুখস্ত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু মহান আল্লাহ প্রজ্ঞাময় এবং সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান; তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা পোষণ করলে তা সংঘটিত হয়। তিনি স্বীয় নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে আদেশ করলেন যাতে তা মুখস্ত করার জন্য এত পরিশ্রম না করেন। বরং তিনিই তার বক্ষে তা সংরক্ষণ করে দিবেন, ফলে তা নবী সাঃ-এর অন্তরের সংরক্ষিত থাকবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿لَا تُحَرِّكۡ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعۡجَلَ بِهِۦٓ ١٦ إِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهُۥ وَقُرۡءَانَهُۥ﴾ [القيامة: ١٦-١٧]

অর্থ: [কুরআন তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করার উদ্দেশ্যে তুমি তোমার জিহবাকে দ্রুত আন্দোলিত করো না।* নিশ্চয় এটার সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।] সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৬-১৭। অর্থাৎ: আমি এটাকে তোমার বক্ষে সংরক্ষণ করে দিব এবং তুমি তা পাঠ করবে। কাজেই নবী সাঃ-এর কাজ ছিল শুধু মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِذَا قَرَأۡنَٰهُ فَٱتَّبِعۡ قُرۡءَانَهُۥ ١٨ ثُمَّ إِنَّ عَلَيۡنَا بَيَانَهُۥ﴾ [القيامة: ١٨-١٩]

অর্থ: [সুতরাং যখন আমি ওটা (জিবরাঈলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।* তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব আমারই।] সূরা আল-কিয়ামাহ: ১৮-১৯। অর্থাৎ: তুমি মনোযোগ দিয়ে চুপ করে শ্রবণ কর। এরপর জিবরাঈল আঃ যখন অহী নিয়ে আসতেন তখন রাসূল সাঃ চুপ করে শুনতেন। তারপর জিবরাঈল চলে গেলে তিনি সেভাবেই পুনর্বার তা পাঠ করতেন। আর এভাবেই তা নবী সাঃ-এর অন্তরে সংরক্ষিত হয়ে যেত।

ছাত্র: আল্লাহ তায়ালা কতই না উদার ও মহান! তিনিই নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর হৃদয়কে এমন করেছেন যে, শুধুমাত্র জিবরাঈল আঃ তার নিকট কুরআন পাঠ করার কারণে তার মুখস্ত হয়ে যেত!

শিক্ষক: হ্যাঁ, নিশ্চয় আল্লাহ সুমহান ও মহানুভব এবং সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। তাই আমাদের উচিত আমরা যখন কুরআন মুখস্ত বা অন্য কোন জ্ঞান অর্জন করতে চাইব তখন আল্লাহর নিকট চাইব ও দোয়া করব, তিনি যেন তা মুখস্ত করতে ও সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করেন। তিনি যদি আমাদেরকে সাহায্য করেন তাহলে সবকিছুই আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে। অতএব আমাদের উচিত সর্বদা সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা। আমরা আল্লাহর নিকট সফলতার জন্য, রোগমুক্তির জন্য ইত্যাদি সব বিষয়ে সাহায্য চাইব। কোন কিছুর প্রয়োজন হলে আল্লাহকে ডাকব ও আমাদের আকাঙ্খা পূরণের জন্য তাঁর নিকট দোয়া করব। কেননা আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

দাওয়াতের প্রথম পর্যায়:

শিক্ষক: মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে নবী সাঃ-এর দাওয়াত কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করেছে। প্রথম পর্যায়ে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন, তারপর সম্প্রদায়ের বাকিদেরকে, তারপর সমগ্র মানব জাতিকে।

ছাত্র: উস্তাদ, কয়েকটি পর্যায়ে কেন দাওয়াত দিতে হয়েছে?

শিক্ষক: সুন্দর, এ দাওয়াতী কার্যক্রমটি পর্যায়ক্রমে করা হয়েছিল। কারণ, এই বিষয়টি কেবল জনগণকে ব্যাখ্যা করে সম্পন্ন করা যায় না। কেননা কিছু লোক অজ্ঞতা, অহংকার, হিংসা বা অন্য কারণে এর বিরোধিতা করতে পারে। ফলে নবী সাঃ-এর প্রতি শত্রুতা বেড়ে যেতে পারে। এছাড়াও, যেহেতু এই বিষয়টি মক্কাবাসীদের জন্য নতুন,

তাই দাওয়াতটি পর্যায়ক্রমে শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল: একটি পর্যায় শেষে অন্যটি, যাতে সফলতা আসে।

ছাত্র: খুব সুন্দর। অনেক বিষয়ই পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করতে হয়।

শিক্ষক: হ্যাঁ! যেমন তোমরা স্কুলে প্রথম শ্রেণি, তারপর দ্বিতীয় শ্রেণি, তারপর তৃতীয় শ্রেণি এবং এভাবে আরও, তারপর মাধ্যমিক স্তর, তারপর উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ইত্যাদি পর্যায়গুলোর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাও। কোন ব্যক্তি অধ্যয়নের একটি পর্যায়ে এগুলো অর্জন করতে পারে না। অতএব, আমাদেরকে অবশ্যই এটাকে আমাদের লক্ষ্য ও কৃতিত্ব অর্জনের একটি উপায় বানাতে হবে।

ছাত্র: উস্তাদ, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমরা দাওয়াতের পর্যায়গুলোর গুরুত্ব শিখেছি এবং এটা সফল হওয়ার জন্য পর্যায়গুলো অনুসরণ করতে হবে। উস্তাদ, আশা করছি আপনি আমাদেরকে প্রথম পর্যায় সম্পর্কে বলবেন?

শিক্ষক: নবী সাঃ গোপনে তার কাছের লোকদের দাওয়াত দিতে লাগলেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ۝١ قُمۡ فَأَنذِرۡ ۝٢﴾ [المدثر: ١-٢]

অর্থ: [হে বস্ত্রাবৃত!* উঠ, অতঃপর সতর্ক কর।] সূরা আল-মুদ্দাসসির: ১-২। ফলশ্রুতিতে প্রথমে ইসলামে প্রবেশ করেন তার স্ত্রী খাদীজা, তার চাচাতো ভাই আলী বিন আবি তালিব, যিনি তরুণ ছিলেন, তার পালক পুত্র যায়েদ বিন হারিসা এবং তার সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক রাঃ।[১]

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/২৬২-২৬৮।

এই বরকতময় দলের সাথে অন্যরাও যোগ দিতে শুরু করে। কারণ তারা গোপনে ও চুপিসারে লোকদের দাওয়াত দিচ্ছিল; যারা এই দ্বীন চায় না তাদের ভয়ে ও এর প্রতি তাদের শত্রুতার কারণে। এই পর্যায়টি তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল।

জ্বিনদের ইসলাম গ্রহণ:

শিক্ষক: আল্লাহর সৃষ্টিজীব অনেক। তাদের অন্যতম হল জ্বিন জাতি। আর এদের সংখ্যা অনেক; আমরা তাদের দেখতে পারি না, কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পায়, আমাদের প্রত্যক্ষ করে এবং আমাদের কথা শুনতে পায়। তাদের মধ্যে ধার্মিক আছে, আবার খারাপও রয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের ভাষাতেই তাদের বর্ণনা করে বলেছেন:

﴿وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدَا ﴾ [الجن: ١١]

অর্থ: [আর নিশ্চয় আমাদের কতিপয় সৎকর্মশীল এবং কতিপয় এর ব্যতিক্রম। আমরা ছিলাম বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত।] সূরা আল-জ্বিন: ১১। যখন জ্বিনদের একটি দল নবী সাঃ থেকে কুরআন শুনল, যখন তিনি লোকদেরকে নিয়ে ফজরের নামাযে ইমামতি করছিলেন, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এসে তাদের খবর দিল এবং তাদেরকে নবীর সাথে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আহবান জানাল। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের নাম বহনকারী একটি সূরাতে এ ঘটনাটি পরিষ্কার করেছেন, যা সূরা আল-জ্বিন নামে পরিচিত। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿قُلۡ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرٞ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَقَالُوٓاْ إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبٗا ۝١ يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلرُّشۡدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦۖ وَلَن نُّشۡرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدٗا ۝٢﴾ [الجن: ١-٢]

অর্থ: [বল, 'আমার প্রতি ওহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনেছে। অতঃপর বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি,* যা

সত্যের দিকে হেদায়াত করে; ফলে আমরা এতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের সাথে কাউকে শরীক করব না।] সূরা আল-জ্বিন: ১-২।

ছাত্র: উস্তাদ, প্রথমে যে আয়াতটি উল্লেখ করেছেন তাতে বলা হয়েছে 'বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত', এটার মানে কী?

শিক্ষক: অর্থাৎ তারাও মানুষের মত বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত। শয়তানও তাদের অন্তর্ভুক্ত যাদের থেকে পানাহ চাইতে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাই আমরা বলি: 'আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' অর্থাৎ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ছাত্র: ওরা কি আজব দুনিয়া?

শিক্ষক: আল্লাহর সৃষ্টি অনেক। তাদের মধ্যে কিছু আমাদের কাছে পরিচিত, যেমন গাছ, পাথর, পানি, জীব-জন্তু ইত্যাদি। আর কিছু আছে যা আমরা জানি না; সমুদ্রে এমন অনেক প্রাণী আছে যাদের সম্পর্কে আমরা জানি না। ফটোগ্রাফাররা সমুদ্রের গভীরে গিয়ে যেসব ছবি তুলে নিয়ে আসেন সেসব ছবির মাধ্যমে আমরা তাদের কিছু জানতে পারি। বরং আল্লাহর সৃষ্টি এত বেশি যে শুধুমাত্র আল্লাহই তা জানেন বা আয়ত্ব করতে পারেন।

ছাত্র: কিন্তু জ্বিনেরা কেন আমাদের কথা শুনে ও আমাদেরকে দেখে? অথচ আমরা তাদেরকে শুনতে বা দেখতে পাই না?

শিক্ষক: প্রিয় ছেলেরা, এখানে আল্লাহর হিকমত রয়েছে যা আমাদের জন্যই ভাল। সম্ভবত আমরা যদি তাদের দেখতে পেতাম তবে আমরা তাদের চেহারা ও আকৃতি দেখে বিরক্ত হতাম। আল্লাহ আমাদের থেকে যা আড়ালে রেখেছেন তা আমাদের কল্যাণের জন্যই। মহান আল্লাহ আমাদের প্রতি করুণাময়, তিনি আমাদের জন্য যা ভাল তা পছন্দ করেন। তাই তিনি আমাদেরকে যাবতীয় সুন্দর কিছু দিয়েছেন, যেমন: সমুদ্র, বাগ-

বাগিচা, আকাশের রঙ, তারকারাজি এবং অন্যান্য সুন্দর ও মনোরম দৃশ্য। কারণ, তিনি আমাদের জন্য যা ভাল তা পছন্দ করেন। অতএব, আমাদেরকে অবশ্যই তাকে ভালবাসতে হবে, তাঁর আনুগত্য করতে হবে এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে হবে।

দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়:

শিক্ষক: তোমরা জানতে পেরেছ যে, গোপনে দাওয়াতের প্রথম পর্যায়টি তিন বছর স্থায়ী ছিল। এর পরে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে এবং তা সকল মানুষের মাঝে ঘোষণা করতে আদেশ করলেন। এ মর্মে আল্লাহ স্বীয় নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿وَأَنذِرۡ عَشِيرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]

অর্থ: [আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর।] সূরা আশ-শুআরা: ২১৪। তিনি আরো বলেন:

﴿فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ﴾ [الحجر: ٩٤]

অর্থ: [অতএব আপনি যে বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়েছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।] সূরা আল-হিজর: ৯৪। এর অর্থ হল: আপনাকে আল্লাহ যে দাওয়াত প্রচারের আদেশ করেছেন তা প্রকাশ্যে করুন, আর যেসব মুশরিকরা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের প্রতি আপনি ভ্রুক্ষেপ করবেন না যাতে তা দাওয়াতে বিঘ্নতা সৃষ্টি না করে। কেননা যে কেউ বাধা-বিপত্তির দিকে তাকিয়ে কাজ না করে সেখানে থেমে যায়, সে তার জীবনে কিছুই বাস্তবায়ন করতে পারে না।

ছাত্র: নবী সাঃ স্বজাতির নিকট কিভাবে তা প্রচার করেছিলেন?

শিক্ষক: রাসূল সাঃ বের হয়ে সাফা পাহাড়ের উঠলেন। এ পাহাড়টি থেকেই বর্তমানে তাওয়াফ শুরু করতে হয়। তিনি পাহাড়টিতে উঠে উচ্চস্বরে ডাক দিলেন: 'হায়, মন্দ

প্রভাত!' তখন সকলে বলাবলি করতে লাগল, কে এই ব্যক্তি যে ডাক দিচ্ছে? তারপর সবাই তার কাছে সমবেত হল। নবী সাঃ বললেন, যদি আমি তোমাদের এই সংবাদ দেই যে, এই পর্বতের পাদদেশে শত্রু সৈন্য এসে পড়েছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা উত্তর করল, তোমাকে কখনো মিথ্যা বলতে তো আমরা দেখিনি। তখন রাসুলুল্লাহ সাঃ বললেন: আমি তোমাদের সতর্ক করছি সামনের কঠোর আযাব সম্পর্কে। তখন আবু লাহাব বলে উঠল "ধ্বংস হও, তুমি এ জন্যই কি আমাদেরকে একত্র করেছ?" তখন এই সূরা অবতীর্ণ হয়:

﴿تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ ١ مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ٢ سَيَصۡلَىٰ نَارٗا ذَاتَ لَهَبٖ ٣ وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ ٤ فِي جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّسَدِۭ ٥﴾ [المسد]

অর্থ: [ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।* তার ধন-সম্পদ এবং যা সে অর্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না।* অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে।* এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে।* তার গলায় পাকানো রশি রয়েছে।][1] সূরা আল-মাসাদ।

সম্ভবত তোমরা জানতে পেরেছ এবং তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে দাওয়াতি কার্যক্রম এর আগের পর্যায়ে গোপন ছিল এবং তা নিকটতম লোকদের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল; যাতে আবু লাহাবের দ্বারা যা ঘটেছে তার মতো কিছু না ঘটে।

ছাত্র: লোকজনকে সমবেত করে সংবাদ দেয়ার এই পদ্ধতিটি খুবই চমৎকার ছিল। কিন্তু উস্তাদ, আপনি যা বর্ণনা করলেন তার মধ্যে "হায়, মন্দ প্রভাত" এই কথাটিতে কৌতূহল জাগছে।

(১) সহীহ বুখারী: (৪৯৭১)।

শিক্ষক: আরবদের একটি রীতি ছিল যে, যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ বা ভয়ানক কোন সংবাদ থাকতো, তখন "হায়, মন্দ প্রভাত" বলে লোকজনকে ডাকা হত।

তারপর চিন্তা করে দেখ, যখন লোকজন নবী সাঃ-এর নিকট জমায়েত হল এবং তিনি তাদেরকে বললেন: যদি আমি তোমাদের এই সংবাদ দেই যে, এই পর্বতের পাদদেশে শত্রু সৈন্য এসে পড়েছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা উত্তরে বলেছিল: হ্যাঁ। এ থেকে বুঝা যায়, তারা জানত যে নবী মুহাম্মাদ সাঃ কখনো মিথ্যা বলেন না। আর এ জন্যই তারাই তাকে আল-আমীন তথা বিশ্বস্ত উপাধি দিয়েছিল। কিন্তু কিছু মানুষ হিংসা ও অহংকারের কারণে সত্য ও কল্যাণকর বিষয় অস্বীকার করে থাকে এবং তা কবুল করে না। তাই আমাদের অহংকার ও আত্ম-গরিমা থেকে পানাহ চাওয়া এবং এ রকম পন্থা পরিহার করা উচিত।

নবী সাঃ-কে কষ্টদানের নানা উপায়:

শিক্ষক: মুহাম্মাদ সাঃ-এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে মানুষ শির্ক ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল; তারা নিজ হাতে মূর্তি তৈরি করে তার নিকট দোয়া ও ইবাদত করত। যখন নবী সাঃ প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন তখন শির্কে অভ্যস্ত অনেকের কাছেই তাদের শির্কী কর্মকান্ড পরিত্যাগ করা কঠিন মনে হল। কেউ কেউ নবী সাঃ-এর এই মর্যাদার কারণে তার উপর হিংসা করতে লাগল। আবার কেউ কেউ তাদের সামাজিক পদমর্যাদার ভয় করছিল; সে তো সমাজপতি, যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তো সে এ সম্মানিত নবীর পতাকাতলে চলে আসবে। আর কেউ কেউ স্বীয় অবাধ্যতায় অবিচল থাকতে চাইল।

উপরোক্ত কারণে কেউ কেউ নবী সাঃ এবং তার সাথে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের প্রতি শত্রুতা পোষণ শুরু করল; তারা তাদেরকে নানা উপায়ে কষ্ট-নির্যাতন করতে লাগল।

ছাত্র: সুবহানাল্লাহিল আযীম! তাহলে কেউ কেউ সত্য জেনেও নিজ স্বার্থের কারণে শত্রুতা করেছে!

শিক্ষক: হ্যাঁ, সত্যের ব্যাপারে মানুষের অবস্থা এ রকমই ছিল। তাই আমাদের উচিত সত্যের অনুসরণ করা এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে সত্যের প্রতিবন্ধক হতে না দেয়া।

ছাত্র: নবী সাঃ ও তার সাহাবীদেরকে যেসব কষ্ট দেয়া হয়েছে- আমরা কি সেগুলোর কিছু জানতে পারি?

শিক্ষক: পূর্ববর্তী নবীগণ নিজ সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতন, মিথ্যা অপবাদ ও বিদ্রুপের স্বীকার হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ فِي شِيَعِ ٱلۡأَوَّلِينَ ١٠ وَمَا يَأۡتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ ١١﴾ [الحجر: ١٠-١١]

অর্থ: [অবশ্যই তোমার পূর্বে আমি অনেক সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম।* আর যখনই তাদের নিকট কোন রাসূল আসত তারা তাকে নিয়ে উপহাস করত।] সূরা আল-হিজর: ১০-১১।

নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে কষ্ট দেয়ার একটি পদ্ধতি ছিল: তাকে মিথা অপবাদ দেয়া। তারাই তাকে আল-আমীন তথা বিশ্বাস্ত উপাধি দেয়ার পর পরবর্তীতে তাকে যাদুকর, পাগল, গণক, কবি ইত্যাদি বলতে লাগল। স্বয়ং আল্লাহই তাদের এ মিথ্যাচারের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

﴿وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجۡنُونٍ﴾ [التكوير: ٢٢]

অর্থ: [আর তোমাদের সাথী পাগল নয়।] সূরা আত-তাকভীর: ২২।

তিনি আরো বলেছেন:

﴿إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ٤٠ وَمَا هُوَ بِقَوۡلِ شَاعِرٖۚ قَلِيلٗا مَّا تُؤۡمِنُونَ ٤١ وَلَا بِقَوۡلِ كَاهِنٖۚ قَلِيلٗا مَّا تَذَكَّرُونَ ٤٢﴾ [الحاقة: ٤٠-٤٢]

অর্থ: *[*নিশ্চয় এ কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের (বাহিত) বাণী।* আর এটি কোন কবির কথা নয়। তোমরা কমই বিশ্বাস কর।* এটা কোন গণকের কথাও নয়, তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ কর।*]* সূরা আল-হাক্কাহ: ৪০-৪২।

ছাত্র: তারা নবী সাঃ-কে পাগল, যাদুকর, কবি বলেছে। কিন্তু গণক এর অর্থ বুঝলাম না।

শিক্ষক: চমৎকার, আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দিন, এ রকম প্রশ্ন করা ভাল যা প্রমাণ করে যে, তোমাদের মনোযোগ আছে এবং তোমরা নবী সাঃ-কে ভালবাস।

গণক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে অদৃশ্যের জ্ঞান দাবী করে। অথচ অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। তবে তিনি স্বীয় নবী সাঃ-কে ঐসব জ্ঞানের কিছু অবহিত করেছেন যা তোমরা অচিরেই জানতে পারবে।

ছাত্র: তাহলে তারা কেন তাকে এসব গুণে গুণান্বিত করে, এটা করে তাদের লাভ কী?

শিক্ষক: তারা এসব মিথ্যা গুণে তাকে গুণান্বিত করে যাতে মানুষ তার নবুওয়তের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ না করে। উপরন্তু যাতে তার দাওয়াতকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং বিরত রাখতে পারে।

ছাত্র: নবী সাঃ তাদেরকে কিভাবে মোকাবেলা করেছেন? তিনি অত্মরক্ষার্থে তাদের সাথে তর্ক বা মারামারি করেছেন?

শিক্ষক: আমাদের নবী সাঃ মানুষের কল্যাণ চাইতেন। তিনি পছন্দ করতেন মানুষকে কুফুরি থেকে বের করে ইসলামে দিক্ষীত করতে এবং তারা যেন নিরাপদে জান্নাতে

প্রবেশ করে। তিনি কখনো প্রতিশোধ নিতে চাইতেন না। তাই তিনি তাদের আচরণে ও নির্যাতনে ধৈর্য ধারণ করতেন; তারা ইসলামে প্রবেশ করবে এই আশায়। যদি তিনি তাদের সাথে লড়াই করতেন বা তাদের উপর আক্রমণ করতেন অথবা গালমন্দ করতেন, তাহলে হয়ত তাদের শত্রুতা আরো বেড়ে যেত। কিন্তু তিনি ছিলেন মানুষের প্রতি কোমল ও দয়ালু, তিনি তাদের কুফুরীকে খুব ভয় করতেন যার পরিণতি জাহান্নাম ও নিকৃষ্ট আবাস।

ছাত্র: আল্লাহর কসম, নিশ্চয় আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ নিজের শত্রুদের প্রতিও কোমল ও দয়ার্দ্র ছিলেন!

শিক্ষক: হ্যাঁ, আমাদের নবী সাঃ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল ছিলেন, এমনকি শত্রুদের সাথেও কোমল আচরণ করতেন। স্বয়ং আল্লাহ তার ব্যাপারে এ কথা বলেছেন:

﴿وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّواْ مِنۡ حَوۡلِكَۖ﴾ [آل عمران: ١٥٩]

অর্থ: [আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে পড়ত।] সূরা আলে ইমরান: ১৫৯। অর্থাৎ তুমি যদি আচরণে কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমাকে ছেড়ে চলে যেত এবং ইসলাম গ্রহণ করত না। কিন্তু তার ধৈর্য্যের কারণে অনেকেই শত্রুতা ছেড়ে দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছে। আমাদেরও উচিত আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর মতো ধৈর্যশীল হওয়া। আমাদের বিরোধী যারা তাদের সাথে কঠোর আচরণ করব না, যাতে তারা আমাদের থেকে দূরে সরে না যায় এবং এ কারণে তাদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ না হয়; নচেৎ আমরা তাদেরকে প্রভাবিত করতে পারব না এবং কল্যাণের পথে আনতে পারব না।

ছাত্র: এগুলো সুন্দর ও চমৎকার নৈতিকতা, উস্তাদ আপনার পরামর্শগুলো মূল্যবান।

শিক্ষক: বরং তাদের ক্ষতি নবী সাঃ-কে আক্রমণ করার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। একদিন নবী সাঃ কাবায় সালাত পড়ছিলেন, সিজদা করার সময় তারা তার উপর রক্ত ও উটের নাড়িভূড়ি নিক্ষেপ করতে সম্মত হয়েছিল।[১] তারপর তারা তাদের এ জঘন্য কাজ দেখে হাসতে লাগল এবং দোল খেতে লাগল!

ছাত্র: তখন রাসূল সাঃ কী করেছিলেন?

শিক্ষক: এ খবরটি স্বীয় কন্যা ছোট্ট ফাতিমা রাঃ-এর নিকট পৌঁছলে দ্রুত এসে পিতার উপর থেকে সেগুলো সরিয়ে দেন। তারপর ফতিমা রাঃ ঐসব লোকদের কাছে গিয়ে গালমন্দ করলেন, স্বীয় পিতা নবী সাঃ-এর সাথে এরূপ আচরণ করার কারণে। যারা এরূপ জঘন্য কাজ করেছিল নবী সাঃ তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। এদের সকলকেই আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধে ধ্বংস করে দিয়েছেন, তারা সবাই নিহত হয়েছিল।[২] অচিরেই এটা বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহর নবীর যে ক্ষতির কথা প্রকাশ করা হয়েছিল তার একটি উদাহরণ হল তিনি কাবার কাছে সালাত আদায় করছিলেন, তখন উকবা বিন আবি মুয়াইত নামক এক ব্যক্তি এসে রাসূল সাঃ-এর জামা কণ্ঠনালীতে পেচিয়ে প্রচন্ডভাবে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলল। তখন আবু বকর রাঃ এসে তার কাঁধ ধরে রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর নিকট থেকে সরিয়ে দিলেন।[৩]

ছাত্র: দাওয়াতের পথে মহানবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অথচ তিনি ধৈর্য ও সচেতনতার সাথে তাদের নির্যাতন সহ্য করেছিলেন।

---

(১) সহীহ বুখারী: (৫২০)।

(২) পূর্বোক্ত।

(৩) সহীহ বুখারী: (৪৮১৫)।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এমনই ছিল। একদিন তারা সবাই মিলে সম্মত হল যে, রাসূল সাঃ-কে দেখামাত্র তারা তাকে হত্যা করবে। ফাতিমা রাঃ খবরটি জানতে পেরে পিতা নবী সাঃ-এর ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের চক্রান্তের কথা বললেন। তখন রাসূল সাঃ অযুর পানি আনতে বললেন, অযু করে মসজিদে হারামে চলে গেলেন।

ছাত্র: তিনি সাঃ তাদেরকে ভয় করলেন না? অথচ তারা সংখ্যায় অনেক ছিল!

শিক্ষক: না, তিনি তাদেরকে ভয় পেতেন না। কেননা নবী সাঃ ছিলেন খুব সাহসী ব্যক্তি। তাছাড়া তিনি আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখতেন এবং জানতেন যে, নিশ্চয় আল্লাহই তাকে তাদের কবল ও অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবেন। যখন নবী সাঃ বের হলেন আর তারা তাকে দেখতে পেল, তখন তারা তাদের চক্ষু অবনত করে নিল ও মাথা নুইয়ে রাখল, কেউ জায়গা থেকে উঠল না। রাসূল সাঃ অগ্রসর হয়ে তাদের মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন, তারপর এক মুষ্টি মাটি যমীন থেকে তুলে নিলেন। এরপর তাদের মুখমণ্ডলে তা নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, মুখমণ্ডলগুলো বিকৃত হোক। যাদের গায়ে ঐ ধুলিমাটি লেগেছিল তাদের প্রত্যেকেই বদরের যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছিল।[১]

ছাত্র: উস্তাদ, এটাতো ভয়ানক পরিস্থিতি ছিল!

শিক্ষক: হ্যাঁ, খুব ভয়ানক ও শঙ্কাময় পরিস্থিতি। তোমরা হয়তো আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে চিন্তা করতে পেরেছ; তিনি কিভাবে তাদের ষড়যন্ত্রকে তার লাঞ্ছনার কারণ বানিয়েছেন ও তাদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এবং নবী সাঃ তাদের উপর মাটি নিক্ষেপ করতে পেরেছিলেন। তোমরা চিন্ত করে দেখ যে, আল্লাহ তায়ালা কিভাবে সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান; তারা ছিল বড় দল, কিন্তু আল্লাহর আদেশে তাদের শক্তি ও

---

(১) মুসনাদে আহমাদ: (১/২০২)

বাহিনী চুপসে গেল; ফলে তাদের কেউ জায়গা থেকে নড়তে পাচ্ছিল না, কথা বলতে পাচ্ছিল না অথবা নবী সাঃ-এর দিকে চোখ তুলে তাকাতেই পাচ্ছিল না। বস্তুত আল্লাহ তায়ালা যখন কিছু করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন শুধু বলেন 'হও', তাতেই তা হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]

অর্থ: *[*তাঁর ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছে করেন, তিনি বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়।*]* সূরা ইয়াসীন: ৮২। অতএব, তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না।

তারপর তোমরা আল্লাহর প্রতি নবী সাঃ-এর আস্থার কথা চিন্তা করে দেখ যে, তিনি বিশ্বাস করতেন আল্লাহই তাকে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করবেন। তাই তিনি অযু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন।

ছাত্র: সম্ভবত তার কন্যা ফাতিমা রাঃ খুশি হয়েছিলেন যখন তিনি এমন কাজ এবং পিতার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সাহায্য দেখেছিলেন।

শিক্ষক: কোন সন্দেহ নেই আমার সন্তানরা, তিনি খুশি হয়েছিলেন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার পিতা ও নবীকে তার শত্রুদের উপর বিজয় দান করেছেন। এতে তার কান্না আনন্দে পরিণত হয়েছিল।

অতএব, আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা করি, যিনি তাঁর নবীকে সম্মানিত করেছেন, তাকে বিজয় দিয়েছেন এবং শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের উপর নির্যাতনের নানা ধরণ:

শিক্ষক: আল্লাহর রাসূল সাঃ-এর সাহাবীরা কুরাইশদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল। তারা তাদেরকে লোহার বর্ম পরিধান করিয়ে সূর্যের তাপের নিচে ফেলে রাখতো। এবং

বিলাল ইবনে রাবাহকে যুবকদের নেতৃত্বে মক্কার অলি-গলিতে ঘুরানো হয়েছে, আর তখন তিনি বলছিলেন: "আহাদ, আহাদ" তথা আল্লাহ এক, আল্লাহ এক। উমাইয়া বিন খালাফ দুপুরে গরম পড়লে বিলালকে বের করে নিয়ে যেত এবং মক্কার মরুভূমিতে চিত করে শুইয়ে রাখতো। তারপর তার বুকের উপর বিশাল পাথর চাপা দিতে আদেশ করতো। তারপর বলতো: তোমাকে আমৃত্যু এভাবেই থাকতে হবে নতুবা মুহাম্মাদকে অস্বীকার করতে হবে এবং লাত, উজ্জার ইবাদত করতে হবে! কিন্তু তখনও বেলাল রাঃ বলতেন: "আহাদ, আহাদ" তথা আল্লাহ এক, আল্লাহ এক।[১]

ছাত্র: বেলাল রাঃ-এর উক্তি "আহাদ, আহাদ" দ্বারা উদ্দেশ্য কী?

শিক্ষক: "আহাদ, আহাদ" দ্বারা বেলাল রাঃ-এর উদ্দেশ্য হল: আল্লাহ এক, তাঁর কোন শরীক নেই।

ছাত্র: সুবহানাল্লাহিল আযীম! বেলাল রাঃ তো মারাত্মক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন। কিন্তু এই সম্মানিত সাহাবীর সাথে উমাইয়ার কী সম্পর্ক ছিল?

শিক্ষক: বেলাল বিন আবি রাবাহ রাঃ ছিলেন উমাইয়ার ক্রীতদাস; জাহেলী যুগে মানুষ মানুষকে দাস বানিয়ে রাখতো, তাদেরকে ঠিক পণ্য-দ্রব্যের ন্যায় কেনাবেচা করতো। তবে ইসলাম এসে এ প্রথাকে বাতিল করে দেয়।

ছাত্র: এই ইসলাম কতই না সুন্দর, মানুষকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন করেছে এবং এ নিকৃষ্টি প্রথাকে বাতিল করেছে! সম্মানিত উস্তাদ, একটি প্রশ্ন- কত সময় পর্যন্ত বেলাল রাঃ এমন নির্যাতিত অবস্থায় ছিলেন এবং স্বীয় দ্বীনের উপর অবিচল থেকে ধৈর্য ধরেছিলেন?

---

(১) মুসনাদে আহমাদ: (১/৪০৪)

শিক্ষক: সুন্দর প্রশ্ন, ঐ অবস্থাতেই অবিচল ছিলেন এবং বলছিলেন: "আহাদ, আহাদ"। অবশেষে আবু বকর রাঃ তাকে উমাইয়ার কাছ থেকে ক্রয় করে নেন এবং আযাদ করে দেন, অর্থাৎ অন্যান্যদের মতো স্বাধীন করে দেন।[১]

ছাত্র: এ মহৎ কর্মের জন্য আল্লাহ আবু বকর রাঃ-কে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি বেলাল রাঃ-কে সূর্যের তাপ, কষ্ট ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার নেয়ামতে বের করে এনেছেন।

শিক্ষক: ইয়াসীর রাঃ-এর পরিবারও এ জাতীয় নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন। বনী মাখযূমেরা আম্মার বিন ইয়াসীর, তার পিতা ও মাতাকে সূর্যের তাপে উত্তপ্ত পাথরের উপর ফেলে রাখতো।[২]

ইয়াসীর রাঃ-এর পরিবার নির্যাতিত থাকাবস্থায় রাসূল সাঃ তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলতেন: হে ইয়াসীরের পরিবার, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এভাবে রাসূল সাঃ তাদেরকে সুসংবাদ দিলেন যে, নির্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের উপর ধৈর্য্য ও অবিচলতার প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য জান্নাত অপেক্ষমান। তারা আম্মার বিন ইয়াসীরের মাতাকে নির্মম নির্যাতন করে হত্যা করেছিল, অথচ তিনি দ্বীনের উপরই অবিচল ছিলেন রবের সাক্ষাত পাওয়া এবং নবী সাঃ যে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তা লাভের আশায়।[৩]

শিক্ষক: যারা নির্মম নির্যাতনের স্বীকার হয়েছিলেন তাদের অন্যতম হলেন 'খাব্বাব বিন আরত রাঃ'। তার পিঠে নির্যাতনের চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল।[৪]

---

(১) মুস্তাদরাক হাকেম: (৩/২৮৪)

(২) সিরাতে ইবনে হিশাম: (১/৩৪২)।

(৩) পূর্বোক্ত।

(৪) সহীহ বুখারী: (৩৬১২)।

এভাবে অনেক সাহাবীই স্বীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিলেন। তবে আল্লাহর দয়ায় যারা নিজ সম্প্রদায় কর্তৃক সুরক্ষা পেয়েছিল তারা ব্যতীত, তাদেরকে তারা ইসলামের শত্রুদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলেন।

ছাত্র: মহান আল্লাহ রাসুল সাঃ-এর সাহাবীদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তারা অনেক কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, তারা অনেক নির্যাতন সহ্য করেছেন। তারা ধৈর্য্য ধারণ করে এবং আল্লাহর তাওফীকে ইসলামের জন্য নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। উপরন্তু নবী সাঃ-এর দোয়া ও তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদের কারণেও তারা ইসলামের উপর অবিচল ছিলেন। অবশেষে আল্লাহ ইসলামকে বিজয়ী করেছেন; ইসলাম আমাদের কাছে পৌঁছেছে, অথচ আমাদেরকে নির্যাতনের স্বীকার হতে হয় না। কাজেই প্রশংসা ও শুকরিয়া করছি আল্লাহর। অতএব আমরার এ জন্য আল্লাহর প্রশংসা করব, সাহাবীদের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা এবং নবী সাঃ-এর দরুদ পাঠ করব- যখনই তাদের কথা উল্লেখ করব। মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাদের সাথে জান্নাতুল ফেরদাউসে একত্রিত করুন এই কামনা করছি।

নবী সাঃ-এর রিসালতের প্রচার-প্রসার বন্ধে সংলাপের আয়োজন:

শিক্ষক: কুরাইশ মুশরিকরা যখন দেখল যে, কেউ কেউ নবী সাঃ-এরর দাওয়াত কবুল করেছে এবং তারা যে ক্ষতির পন্থা অবলম্বন করেছে তাতে নবী সাঃ ও তার সাহাবীদের কার্যকলাপ বন্ধ হয়নি, তখন তারা সংলাপ-আলোচনার পদ্ধতি অবলম্বন করল; এই বিশ্বাসে যে, হয়তো এটা নবী সাঃ-এর ইসলামের দাওয়াত বন্ধ করার তাদের দাবি পূরণ করতে পারে।

ছাত্র: মাফ করবেন মাননীয় উস্তাদ, সংলাপের মানে কি?

শিক্ষক: সংলাপের অর্থ হল আলোচনা করা, এবং একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য দুই পক্ষের মধ্যে প্রস্তাব উপস্থাপন করা।

ছাত্র: কিন্তু এটা তো ধর্ম! সর্বশক্তিমান আল্লাহ এটার আদেশ করেছেন। তাই এটা কি সংলাপযোগ্য?

শিক্ষক: ঠিক বলেছ ছাত্ররা, কিন্তু তারা মনে করেছে যে নবী সাঃ এটা মেনে নিতে পারেন এবং এটাই তাদের ধারণা ছিল। তবে তোমরা আমার সাথে থাক, এ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে।

চাচা আবু তালিবের সাথে সংলাপ:

শিক্ষক: তাদের নেতৃস্থানীয় লোকজন নবী সাঃ-এর চাচা আবু তালিবের কাছে এসেছিল, যিনি দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাকে পৃষ্ঠপোষকতা, লালন-পালন করেছিলেন এবং তার যত্ন নিয়েছেন- যেমনটি আমরা ইতিপূর্বে পড়েছি। তারা বলল: আপনার ভাতিজা আমাদের মজলিসে বিরক্ত করে, তাই তাকে বারণ করুন।

ছাত্র: কিন্তু নবী সাঃ তো তাদের কোন ক্ষতি করেননি, তাহলে তারা এ কথা কিভাবে বলতে পারে?

শিক্ষক: সাবাশ! আল্লাহর দ্বীনের প্রতি মানুষকে তার দাওয়াত দেয়াকেই তারা তাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছিল।

ছাত্র: আমরা এর অর্থ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আবু তালিব তাদের সাথে কি করেছিলেন?

শিক্ষক: আবু তালিব যখন তাদের কথা শুনলেন, তখন তিনি ভাতিজা আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে বললেন: তোমার চাচাত ভাইয়েরা দাবি করছে যে, তুমি তাদের মজলিশে তাদের ক্ষতি করছ। তখন আল্লাহর নবী সাঃ বললেন:

আল্লাহর কসম! চাচা, তারা যদি আমার ডানে সূর্য এবং আমার বামে চাঁদ রাখে এই শর্তে যে, আমি এ বিষয়টি পরিত্যাগ করব, আমি তা মোটেও পরিত্যাগ করব না।[১]

নবী করীম সাঃ জানতেন যে, কেউই তার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ রাখতে পারবে না। কিন্তু যেমনভাবে সূর্যকে তার ডানে এবং চন্দ্রকে তার বামে রাখা তাদের পক্ষে অসম্ভব, তেমনি আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মিশন ত্যাগ করাও তার পক্ষে অসম্ভব।

ছাত্র: খুব সুন্দর এবং অসাধারন কথা। নবী সাঃ-এর কথাগুলো আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু তার চাচা আবু তালিব কি বললেন?

শিক্ষক: আবু তালিব তাদেরকে বললেন: আমরা কখনো আমার ভাতিজাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারিনি, কাজেই তোমরা ফিরে যাও। আমরা কখনো তাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি। যেহেতু সে এই কথাগুলি বলেছেন, এর অর্থ হল যে সে এ থেকে পিছপা হবে না। সুতরাং যা শুনেছেন তা ব্যতীত আর কিছু করার নেই।

উতবা বিন রাবিয়া'র সংলাপ:

শিক্ষক: অন্য সময়ে, উতবা তার লোকদের, কুরাইশ কাফেরদের কাছে একটি ধারণা পেশ করে, নবী মুহাম্মদ সাঃ-এর কাছে পেশ করার জন্য। তারা তার ধারণায় সম্মত হয়। ফলে উতবা নবী মুহাম্মদ সাঃ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল: হে আমার ভাতিজা, তুমি যা নিয়ে এসেছ তার বিনিময়ে যদি কেবল অর্থ চাও তবে আমরা আমাদের অর্থ-সম্পদ থেকে তোমার জন্য সংগ্রহ করব, যাতে তুমি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্পদের অধিকারী হও।

---

(১) মুস্তাদরাক হাকেম: (৩/৫৭৭)

আর যদি তুমি সম্মান চাও, আমরা তোমাকে আমাদের সর্দার বানাবো, যাতে তোমাকে ছাড়া আমরা কোন কিছুর সিদ্ধান্ত নেব না। অর্থাৎ, আমরা তোমার সাথে পরামর্শ না করে কোন সিদ্ধান্ত নেব না।

আর যদি তুমি রাজত্ব চাও, তাহলে আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানাব।

যদি তুমি মনে কর যে, স্বপ্নযোগে যে তোমার কাছে আসে তুমি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পাচ্ছ না, তাহলে আমরা তোমার চিকিৎসার চেষ্টা করব। অর্থাৎ, যদি এমন হয়ে যে, সে তোমার ঘুমের মধ্যে আসে এবং বলে যে এটা কর, ওটা কর- তাহলে আমরা ডাক্তার দিয়ে তোমার চিকিৎসা করাব।

ছাত্র: এগুলো তো বিশাল অফার, তাহলে নবী সাঃ কী জবাব দিয়েছিলেন?

শিক্ষক: প্রথমত নবী সাঃ কথা বলার সময় তাকে বাধা দেননি, এটা তার শিষ্টাচারিতার অংশ। নবী সাঃ-এর পক্ষে কখনই এসব অফারের কোনটিই গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না; কেননা এগুলো সবই দুনিয়া কেন্দ্রীক, অথচ তিনি মহান আল্লাহর রিসালাতের বাহক যা দুনিয়া ও এর মধ্যে যা আছে সবকিছুর চেয়ে উত্তম!

নবী সাঃ উতবার কথা শুনছিলেন। যখন সে তার কথা শেষ করল তখন নবী সাঃ বললেন: হে আবুল ওয়ালিদ, আপনার কথা কি শেষ হয়েছে? সে বলল: হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন: তাহলে আমার কথা শুনুন; এই বলে নবী সাঃ নিম্নের আয়াতগুলো পাঠ করলেন:

﴿حمٓ ۝١ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۝٢ كِتَٰبٞ فُصِّلَتۡ ءَايَٰتُهُۥ قُرۡءَانًا عَرَبِيّٗا لِّقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ۝٣ بَشِيرٗا وَنَذِيرٗا فَأَعۡرَضَ أَكۡثَرُهُمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ ۝٤ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيٓ أَكِنَّةٖ مِّمَّا تَدۡعُونَآ إِلَيۡهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقۡرٞ وَمِنۢ بَيۡنِنَا وَبَيۡنِكَ حِجَابٞ فَٱعۡمَلۡ إِنَّنَا عَٰمِلُونَ ۝٥﴾ [فصلت: ١-٥]

অর্থ: *[*হা-মীম।* এটা পরম করুণাময় অসীম দয়ালুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।* এমন এক কিতাব, যার আয়াতগুলো জ্ঞানী কওমের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, কুরআনরূপে আরবী ভাষায়।* সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। অতঃপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, অতএব তারা শুনবে না।* আর তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে ডাকছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত, আমাদের কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে পর্দা; কাজেই তুমি তোমার কাজ কর, নিশ্চয় আমরা আমাদের কাজ করব।*]* সূরা ফুসসিলাত: ১-৫। রাসূল সাঃ এগুলো তার সামনে পাঠ করছিলেন, আর উতবা তার দুই হাত পিঠের দিকে পেছনে রেখে চুপ করে শুনছিল। এভাবে রাসূল সাঃ এ সূরার সিজদার আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করে সিজদা দিয়ে শেষ করলেন। তারপর বললেন: হে আবুল ওয়ালিদ, আপনি শুনলেন, আপনার কথা আর আমি যা তেলাওয়াত করলাম।[১]

ছাত্র: খুব সুন্দর, তিনি তাকে এই সূরাটি শুনালেন যাতে বর্ণনা রয়েছে যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।

শিক্ষক: তোমরাও খুব চমৎকার, সূরার আয়াতগুলো তোমরা খেয়াল করেছ*!*

ছাত্র: তারপর উতবা কী করেছে*?* সম্ভবত উক্ত সূরা ও এর মর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

শিক্ষক: হ্যাঁ, উতবা আল্লাহর কালাম শুনে প্রভাবিত হয়েছে এবং সে যখন নিজ কওমের লোকদের কাছে ফিরে গেল তারা তার চেহারা দেখে তা বুঝতে পারল। তখন তারা বলতে লাগল, দেখ আবুল ওয়ালিদ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল এখন ভিন্ন চেহারায় ফিরে এসেছে*!*

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: *(*১/৩১১-৩১৪*)*।

তারপর তারা জিজ্ঞেস করল: হে আবুল ওয়ালিদ, কী খবর নিয়ে এসেছ? সে বলল: আমি এমন কথা শুনেছি, আল্লাহর শপথ এমন কথা আমি আগে কখনও শুনিনি; আল্লাহর কসম, এটা কবিতা নয়, যাদু বা ভবিষ্যদ্বাণীও নয়।

তারপর সে রাসূল সাঃ-কে এবং তিনি যা করছেন তার বিষয়ে তাকে ছেড়ে দিতে পরামর্শ দিলেন। তখন তারা বলল: সে তো তোমাকে যাদু করে ফেলেছে!

ছাত্র: তার মানে তারা উতবার পরামর্শটি গ্রহণ করেনি।

শিক্ষক: হ্যাঁ, তারা তা গ্রহণ করেনি। এমনকি এই উতবা যে কুরআন শুনে প্রভাবিত হয়েছিল সেও ইসলাম গ্রহণ করেনি; সে নিজ সম্প্রদায়ের মতের অনুসরণ করেছে।

ছাত্র: তাহলে এটাতো উতবা ও তার সম্প্রদায়ের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ!

শিক্ষক: হ্যাঁ, অহংকার প্রদর্শন বটে। কেননা তারা সত্য চিনতে পেরেছিল, কুরআন শুনেছে এবং উতবা যে কথা বলেছে তাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছিল যে, এটা কবিতা নয়, যাদুমন্ত্রও নয় এবং গণকের ভবিষ্যদ্বাণীও নয়- যেমনটি তারা বলে বেড়াতো। সে বলেছিল: যা সে শুনেছে তা কিন্তু সেরকম নয় যেমনটি তারা বলেছিল।

অতএব, হে ছাত্ররা, তোমরা অহংকার, দাম্ভিকতা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। আমরা আল্লাহর নিকট কামনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে সত্যের পথে হেদায়েত ও অবিচলতা দান করেন- যেমনটি তিনি আমাদেরকে এ আয়াতের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন:

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوبَنَا بَعۡدَ إِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحۡمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلۡوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]

অর্থ: [হে আমাদের রব! সরল পথ দেয়ার পর আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে সত্য লঙ্ঘনপ্রবণ করবেন না। আর আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন, নিশ্চয়ই আপনি মহাদাতা।] সূরা আলে ইমরান: ৮।

সুতরাং যে কোন কারণে সত্য প্রত্যাখ্যান করে অহংকার প্রদর্শন করা খুবই মারাত্মক বিষয়।[১]

মুজেযা/অলৌকিক বিষয় সংঘটিত করার দাবি উত্থাপন:

শিক্ষক: যখন নবী সাঃ-কে তাঁর রিসালাত থেকে বিরত রাখতে কুরাইশ কাফেরদের সংলাপ ও আলোচনা ব্যর্থ হয়, তখন তারা তার কাছে কিছু মুজেযা প্রকাশের দাবি করে।

ছাত্র: মুজেযা কী?

শিক্ষক: মুজেযা হল এমন জিনিস যা সাধারণত মানুষ সংঘটিত করতে পারে না। তাই তারা তাকে সাফা পর্বতকে তাদের জন্য সোনায় রুপান্তরিত করতে বলেছিল, যাতে তারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। ফলে নবী সাঃ স্বীয় রবকে ডাকেন, অতঃপর জিবারঈল আঃ এসে বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন: আপনি যদি চান তাহলে তিনি সাফা পর্বতকে সোনায় পরিণত করে দিবেন; তবে এরপরও যে কুফুরী করবে তাকে এমন শাস্তি দেব যে শাস্তি ইতিপূর্বে দুনিয়ার আর কাউকে দেইনি। আর যদি আপনি চান তাহলে আমি তাদের জন্য তাওবা ও রহমতের দুয়ার উন্মুক্ত করে রাখবো। তখন নবী সাঃ বললেন: বরং আমি চাই তাওবা ও রহমতের দুয়ার উন্মুক্ত থাকুক।

ছাত্র: সুবহানাল্লাহিল আযীম! নবী সাঃ কেন তাওবা ও রহমতের দ্বার চেয়েছেন, তারা যা দাবি করেছিল তা কেন চাননি? অথচ সেটা করলে তারা ইসলাম কবুল করতো?

শিক্ষক: খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হে আমার স্নেহের ছাত্ররা। প্রথমত: তোমরা জান যে, কুরাইশরা ছিল সবচেয়ে বাগ্মী আরব, এবং তারা খুব সঠিকভাবে আরবী জানত। যখন তারা পবিত্র কুরআন শুনেছিল তখন বুঝতে পেরেছিল যে, এটা কোনও মানুষের কথা

(১) এখানে শিক্ষক ছাত্রদেরকে হিংসা, অহংকারের ক্ষতি, প্রকারভেদ উদাহরণ সহ বর্ণনা করবেন।

নয়, বরং এটা ছিল বিশ্বজগতের প্রভুর বাণী। কেননা একজন ব্যক্তি আরবীতে যতই সামর্থ্যবান থাকুক না কেন, সে কখনই কুরআনের মত একটি আয়াতও আনতে পারবে না, তাহলে সে কিভাবে একটি সূরা নিয়ে আসবে? তবুও তাদের কেউ কেউ ঈমান আনেনি। নবী করীম সাঃ তাদের আচরণ থেকে জানতেন যে, সাফা পাহাড় স্বর্ণে পরিণত হলেও তারা বলত, "তুমি আমাদের চোখে যাদু করেছ"। আর যদি তারা তা বলে তাহলে মহান আল্লাহ তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেবেন। তাতে রাসূল সাঃ তাদেরকে পরাজিতও করতেন। কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ তো তাদের প্রতি করুণাময় ছিলেন। তাই তিনি শাস্তির বদলে ধৈর্য ধারণ এবং তাদের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাকে বেছে নিয়েছিলেন। এই আশায় যে, হয়তো তাদের মধ্যে কেউ ইসলাম গ্রহণ করবে এবং এতে তাদের সন্তান ও পরিবারও তাদের সাথে মুসলমান হবে।

ছাত্র: একটি বুদ্ধিদীপ্ত পছন্দ, যা নির্দেশ করে যে আমাদের নবী সাঃ ছিলেন করুণাময় ও দয়ালু, তিনি কঠোর ও কর্কশ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সহনশীল। তাই তিনি তাদের শাস্তি দেয়ার পরিবর্তে তাদের জন্য আল্লাহর রহমত বেছে নিয়েছিলেন- তাদের উপর ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের নির্যাতন সহ্য করে।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এভাবেই তিনি নম্র ও ধৈর্যশীল ছিলেন এবং মানুষের জন্য, এমনকি তার শত্রুদের জন্যও ভাল চাইতেন। অতএব, আমরা নৈতিকতায় তার মতো হতে চাই, আমরা ধৈর্যশীল ও করুণাময় হবো। যাতে আমরা কঠোর ও কর্কশ না হই, বরং দয়াবান মানুষ হতে পারি। আর যাতে আল্লাহ আমাদের প্রতি রহম করেন এবং আমাদেরকে বরকত দেন।

ছাত্র: উস্তাদ, তারা কি আরো মুজেযার দাবি জানিয়েছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, যেমন আনাস বিন মালেক রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: **(মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ সাঃ-কে তার নবুওয়াতের নিদর্শন হিসাবে কোন মুজেযা দেখানোর দাবি**

জানাল। তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা চাঁদের দু'খন্ডের মধ্যখানে হেরা পর্বতকে দেখতে পেল।) সহীহ বুখারী।

ছাত্র: উস্তাদ, এটা কীভাবে সম্ভব, একটু ব্যাখ্যা করবেন?

শিক্ষক: মক্কার লোকেরা যখন নবী সাঃ-কে একটি নিদর্শন দেখাতে বলল, তখন মহান আল্লাহ আকাশের চাঁদকে দুই ভাগে ভাগ করে আলাদা করে দেন। তারা নিজ চোখে তা দেখেছিল। এমনকি তারা চাঁদের দুই অংশের মধ্যখানে হেরা পর্বতও দেখেছিল; যাতে তারা নিশ্চিত হয় যে এটি দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এ প্রসংগে মহান আল্লাহ 'সূরা আল-কামার' নামক একটি সূরাও নাযিল করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلۡقَمَرُ ١ وَإِن يَرَوۡاْ ءَايَةٗ يُعۡرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحۡرٞ مُّسۡتَمِرّٞ ٢﴾ [القمر: ١-٢]

অর্থ: *[*কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।* আর তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাচরিত যাদু।*]* সূরা আল-কামার: ১-২।

ছাত্র: সেই মহা নিদর্শন চাঁদের দ্বিখণ্ডিত হওয়া দেখে তারা কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল?

শিক্ষক: যেমনটি তোমরা সূরা আল-কামারের আগের আয়াতে শুনেছ যে, 'তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাচরিত যাদু'। এ থেকেই হয়তো তোমরা বুঝতে পেরেছ যে, নবী সাঃ কেন তাদের জন্য তাওবা ও রহমতের দুয়ারকে বেছে নিয়েছিলেন এবং সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করাকে বেছে নেননি! কেননা তারা স্বচক্ষে চাঁদ দ্বিখন্ডিত হওয়াকে অবলোকন করেছিল, তারপরও তারা এটা চিরাচতি যাদু বলে আখ্যায়িত করেছে! তাহলে যদি সাফা পর্বতকে স্বর্ণে পরিণত করার প্রস্তাবটি গ্রহণ করতেন, তাহলে কী হত? এর পরে যদি তারা ঈমান না আনতো তাহলো তাদের উপর আযাব আপতিত হতো।

ছাত্র: হ্যাঁ, এটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত। যদি মহান আল্লাহ কর্তৃক তাদের জন্য সাফা পর্বতকে সোনায় পরিণত করাকে তাদের জন্য বেছে নিতেন, তবে তারা বলত, "সে আমাদের চোখে যাদু করেছে"। তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতেন। ফলে আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ যে তার কওমের লোকদেরকে ভালোভাবে চিনতেন- এটা তার প্রমাণ।

আবিসিনিয়ায় হিজরত:

শিক্ষক: রাসূলুল্লাহ সাঃ যখন দেখলেন যে, তার সাহাবীদেরকে তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত করার জন্য অত্যাচার ও নির্যাতন করা হচ্ছে, তখন তিনি তাদেরকে বললেন: তোমরা যদি আবিসিনিয়া দেশে চলে যাও তাহলে ভাল হয়। কেননা সেখানে একজন বাদশা আছেন যিনি কারো প্রতি অত্যাচার করেন না এবং এটি সত্যবাদিতার দেশ। যাতে তোমরা যে অবস্থায় আছ তা থেকে আল্লাহ তোমাদেরকে মুক্তি দেবেন।

আর এই স্থানান্তরকেই হিজরত বলা হয়। অর্থাৎ যে স্থানে নির্যাতিত হচ্ছিল তা পরিত্যাগ করে এমন স্থানে সরে যাওয়া যেখানে তার ও তার দ্বীনের জন্য নিরাপদ মনে হচ্ছে।

ছাত্র: কোথায় এই আবিসিনিয়া? সাহাবায়ে কেরাম কি হিজরত করতে রাজি হয়েছিলেন?

শিক্ষক: আবিসিনিয়াকে বর্তমানে ইথিওপিয়া বলা হয়। এটা সুদানের দক্ষিণে, এবং লোহিত সাগর আমাদেরকে তাদের থেকে আলাদা করেছে।

আর সাহাবাগণ, তারা সকলেই এতে সম্মত হয়েছিলেন। কারণ, আবিসিনিয়ায় তাদের হিজরত তাদেরকে স্বীয় কওমের অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে দূরে রাখবে। তাছাড়া যেহেতু আবিসিনিয়ার বাদশার নিকট কেউ নির্যাতিত হয় না- যেমনটি নবী সাঃ তার সম্পর্কে বলেছেন।

মুসলমানগণ মক্কা থেকে আবিসিনিয়ায় দু'বার হিজরত করেছিলেন। প্রথমটি নবী সাঃ-এর নবুওয়ত লাভের পঞ্চম বছরে রজব মাসে।[১]

ছাত্র: যেসব মুসলমান হিজরত করেছিল তাদের সংখ্যা কি অনেক ছিল?

শিক্ষক: প্রথমে যারা হিজরত করেছিল তাদের মধ্যে ছিল এগার জন পুরুষ ও চারজন নারী। তারা মক্কা থেকে পায়ে হেঁটে প্রায় আশি কিলোমিটার দূরে সমূদ্রের তীরে পৌঁছেন। তারপর সেখান থেকে জাহাজ ভাড়া করে আবিসিনিয়ায় যান।

এদিকে যখন অবশিষ্ট মুসলমানদের উপর নির্যাতন গুরুতর হয়ে ওঠে, তখন আল্লাহর রাসূল সাঃ তাদেরকে দ্বিতীয়বার হিজরত করার অনুমতি দেন। তখন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের সংখ্যা ছিল (৮৩) তিরাশি জন পুরুষ।[২]

ছাত্র: তারা কিভাবে আবিসিনিয়ায় বসবাস করত?

শিক্ষক: মুসলমানরা যখন আবিসিনিয়ায় প্রবেশ করল, তারা সেখানকার রাজাকে তেমনি দেখতে পেল যেমন তার সম্পর্কে নবী সাঃ বলেছিলেন: 'তার দ্বারা কারো প্রতি জুলুম করা হয় না।' তার নাম ছিল নাজ্জাশী। তিনি তাদেরকে দ্বীন পালনে নিরাপত্তা দিলেন, তাদেরকে কেউ নির্যাতন করবে না। ফলে তারা আবিসিনিয়ার মাটিতে আল্লাহর দয়ায় নিরাপদে থাকতে লাগল।

ছাত্র: প্রথম দিকের মুসলিম সাহাবীগণ তাদের দ্বীনের স্বার্থে অনেক কষ্ট সহ্য করেছিলেন।

শিক্ষক: চমৎকার, তোমরা সাহাবায়ে কেরামের দুঃখ-কষ্ট বুঝেছ ও উপলব্ধি করেছ। আমাদেরকে অবশ্যই তাদের কষ্ট-পরিশ্রম থেকে উপকৃত হতে হবে: এ দ্বীনের পথে

---

(১) দেখুন: ফতহুল বারী: ৭/১৮৮।

(২) দেখুন: ফতহুল বারী: ৭/১৮৮।

অলস হওয়া চলবে না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের যেসব ইবাদত করতে আদেশ করেছেন তা সম্পাদন করার জন্য আমাদের কঠোর পরিশ্রম করা উচিত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির মধ্যে থাকাকালীন উদাসীন হওয়া উচিত নয়। আমাদেরকে অবশ্যই শিক্ষাখাতে, বিশেষ করে আমাদের ধর্মীয় বিষয়ে পরিশ্রম করতে হবে।

হিজরতের এলাকায় মুসলিমদেরকে মোকাবেলা:

শিক্ষক: কুরাইশরা যখন মুসলিমদের ধর্মীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে জানতে পারল; তখন তারা তাদেরকে বাঁধাগ্রস্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করল। অর্থাৎ আবিসিনিয়ার মাটিতেও তারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল, তাদেরকে বহাল অবস্থায় ছেড়ে দেয়নি।

ছাত্র: কুরাইশরা কী করেছিল, আল্লাহর রাসূলের সাহাবীগণ তো তাদের থেকে অনেক দূরে ছিলেন?

শিক্ষক: যখন কুরাইশরা জানতে পারল যে, মুসলমানরা তাদের ধর্ম অনুসরণ করে নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করছে, তখন তারা দেখা মিটিং করে পরামর্শ করল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা বাদশা নাজ্জাশী ও তার সহকর্মীদের জন্য অনেক উপহার-উপঢৌকন পাঠাবে। এগুলোর সাথে দু'জন বিচক্ষণ লোককেও পাঠাতে সম্মত হল; যাতে তারা নাজ্জাশীকে প্রভাবিত করতে পারে। এই দুই ব্যক্তি হল: আবদুল্লাহ ইবনে আবি রাবিয়া এবং আমর ইবনে আস।[১]

ছাত্র: এরপর নাজ্জাশী মুসলমানদের সাথে কি আচরণ করলেন?

শিক্ষক: নাজ্জাশী একজন বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, যিনি অন্যায় পছন্দ করতেন না। যখন ঐ দুই কুরাইশী আসল, তারা নাজ্জাশীকে বলল: আমাদের সম্প্রদায় থেকে আপনার কাছে কিছু মূর্খ লোক এসেছে, তারা নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম ত্যাগ করেছে

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৫৮-৩৬২।

এবং আপনার ধর্মেও প্রবেশ করেনি। তারা এমন একটি ধর্ম উদ্ভাবন করে নিয়ে এসেছে যা আমরা বা আপনিও জানেন না।

ছাত্র: নাজ্জাশী কি তারা যা বলেছিল তাতে আশ্বস্ত হয়েছিল?

শিক্ষক: নাজ্জাশী একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি কুরাইশদের কাছ থেকে যেমন শুনেছেন তেমন সাহাবীদের কাছ থেকে না শুনে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এমনিভাবে, যখন কেউ কিছু দাবি করে, তখন একজন ব্যক্তির উচিত সাথে সাথে সহমত পোষণ না করা বা তার দিকে ঝুঁকে না পড়া, যতক্ষণ না সে অন্য পক্ষের বিষয়ে নিশ্চিত হয়। যাতে তিনি ন্যায়পরায়ণ ও আমানতদারদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তাই না, আমার বাচ্চারা?

ছাত্র: ঠিক, তাহলে তো নাজ্জাশী অবশ্যই সাহাবীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, তিনি সাহাবীদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু সাহাবীরা তার কাছে যাওয়ার আগেই নিজেরা জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে নিলেন।

ছাত্র: সাহাবীদের এটা ভাল কাজ হয়েছিল যে, তারা তার কাছে যাওয়ার আগে একে অপরের সাথে পরামর্শ করেছিলেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, দলকে অবশ্যই তার সাথে সম্পর্কিত যেকোন বিষয়ে একমত হতে হবে এবং এর সম্পর্কে কারও ভিন্নমত থাকা উচিত নয়। কারণ, চিন্তাভাবনা, পর্যালোচনা ও মতবিনিময় সহ কাউন্সেলিংয়ে অনেক সুবিধা রয়েছে। এর ফলে একে অপরের ভুল সংশোধন করে নেয়া যায়। তারপর তারা দলীয় ঐক্যমতের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এতে যাতে তাদের ঐক্যে বিভক্তি তৈরি হয়ে না। তাছাড়া সম্মিলিত মতের উপর বরকত রয়েছে; কেননা আল্লাহ দল বা জামাআতের সাথে থাকেন।

ছাত্র: সাহাবাদের বৈঠক কেমন ছিল? অবশ্যই সুন্দর হয়েছে।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটি দুর্দান্ত ছিল। তারা বলেছিল: আমরা কেবল সত্য বলবো। আমরা তা-ই বলবো যা আমরা যা জানি এবং আমাদের নবী সাঃ যা করতে আদেশ করেছেন; তাতে যা হবার হবে। অর্থাৎ তাতে আমাদের ভালো-মন্দ যা কিছু ঘটার ঘটুক, আমরা শুধু সেটুকুই বলবো যা করার জন্য আমাদের নবী সাঃ আমাদের আদেশ করেছেন।

ছাত্র: এটা বিস্ময়কর ছিল যে, তারা নাজ্জাশীল নিকট সত্য ও আসল কথা বলেছেন এবং যেমনটি আমাদের নবী মুহাম্মদ সাঃ তাদের শিখিয়েছিলেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, সততাই ভালো। তাছাড়া আমাদের ধর্ম আমাদেরকে সৎ হতে আদেশ করে এবং মিথ্যা বলা থেকে নিষেধ করে।

ছাত্র: উস্তাদ, তারপর কী হয়েছে? আমরা তা জানতে খুব আগ্রহী।

শিক্ষক: সাহাবায়ে কেরাম একমত হলেন যে, তার সাথে যিনি কথা বলবেন তিনি হলেন জাফর ইবনে আবি তালিব রাঃ। অতঃপর জাফর রাঃ বললেন: হে বাদশাহ, আমরা জাহেলিয়াতে জর্জরিত জাতি ছিলাম; আমরা মূর্তি পূজা করতাম, মৃত পশুর মাংস খেতাম, অনৈতিক কাজ করতাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীদের সাথে দুর্ব্যবহার করতাম এবং আমাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তারা দুর্বলদের সম্পদ খেত। আমরা এমনই ছিলাম, অবশেষে আল্লাহ আমাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেন যার বংশ, সততা, বিশ্বস্ততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে আমরা জানি। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করেন যাতে আমরা একত্ববাদে বিশ্বাস করি এবং তাঁরই উপাসনা করি। আর আমরা ও আমাদের বাপ-দাদারা তাকে ছাড়া যে সমস্ত পাথর ও মূর্তির উপাসনা করতাম তা যেন পরিহার করি। তাছাড়া তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলতে, আমানত আদায় করতে, পারিবারিক বন্ধন বজায় রাখতে এবং ভাল প্রতিবেশী হতে আদেশ করেছেন। হারাম কাজ ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকতে এবং অনৈতিক কাজ, মিথ্যা কথা বলা ও এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। .... তিনি

আমাদেরকে নামায, যাকাত ও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এ কারণে আমাদের কওমের লোকেরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছে, অত্যাচার করেছে এবং আমাদেরকে ধর্ম ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ করছে। ... যখন তারা আমাদের উপর জবরদস্তি করতে লাগলো, তখন আমরা আপনার দেশে চলে এলাম এবং আপনাকে সবার থেকে বেছে নিলাম।[১]

ছাত্র: আল্লাহর শপথ, এটা সুন্দর কথা। কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হল প্রাক-ইসলামী সময়ে তাদের খারাপ চরিত্র, যেখানে তারা মূর্তি পূজা করত, পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন করত এবং প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করত। তাদের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল যার অর্থ আমরা জানি না, উস্তাদ আপনি হয়তো আমাদেরকে সেগুলো ব্যাখ্যা করতে পারেন, যেমন মৃত পশু ও অনৈতিক কাজ।

শিক্ষক: চমৎকার প্রশ্ন ছেলেরা, মৃত পশু বলতে উদ্দেশ্য হল যেটা জবাই না করেই মারা যায় এবং তার উপর আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয় না, যেমন ভেড়া এবং অন্যান্য গবাদি পশু। উদারহণস্বরূপ উঁচু স্থান থেকে পড়ে বা অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়া। আর অনৈতিক কাজ হল সমস্ত খারাপ কাজ যা একজন মানুষ গ্রহণ করে না। যেমন অবিচার একটি অশ্লীলতা, নগ্ন পোশাক একটি অশ্লীল কাজ, ইত্যাদি।

ছাত্র: উস্তাদ, আপনাকে ধন্যবাদ, আল্লাহ আপনাকে পুরস্কৃত করুন। উস্তাদ, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে আল্লাহর এ ধর্মের গুণাবলীর প্রতি যা আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর উপর নাযিল করেছেন। কারণ এটি প্রাক-ইসলামী সময়ের নৈতিকতার বিরুদ্ধে। যেমনটি জাফর বিন আবি তালিব রাঃ বলেছেন: তিনি আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে, সত্যবাদী হতে, আমানতদারিতা বজায় রাখতে, পারিবারিক

(১) পূর্বোক্ত।

বন্ধন অটুট রাখতে, ভাল প্রতিবেশী হতে এবং হারাম ও রক্তপাত তথা মানুষ হত্যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উস্তাদ আমি এমনিই বুঝেছি, তাই না?

শিক্ষক: হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বুঝেছো। হারাম ও রক্তপাত থেকে বিরত থাকা বলতে যা বোঝায় তা হল, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা এবং খুন-খারাবী করা থেকে আমাদেরকে বিরত থাকতে হবে এবং কখনও এসবে জড়িত হওয়া যাবে না।

ছাত্র: কিন্তু সাহাবীদের কথা শোনার পর নাজ্জাশী কি বললেন?

শিক্ষক: নাজ্জাশী জাফর রাঃ-কে বললেন: তিনি আল্লাহর নিকট থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার কিছু কি তোমার কাছে আছে? জাফর রাঃ বললেন: হ্যাঁ, তারপর তিনি তাকে সূরা মরিয়ম থেকে কিছু আয়াত ... পাঠ করে তাকে শুনালেন। অতঃপর জাফর রাঃ যা তেলাওয়াত করেছিলেন তা যখন নাজ্জাশী শুনল, তখন আল্লাহর কালামে বিনীত হয়ে নাজ্জাশী কেঁদে দিলেন, এমনকি তার দাড়ি চোখের জলে ভিজে গিয়েছিল। তখন তার মন্ত্রিসভার সদস্যরাও পবিত্র কুরআন থেকে যা শুনেছিল তার জন্য কেঁদে দিয়েছিল। তারপর নাজ্জাশী বললেন: নিশ্চয় এটা এবং ঈসা আঃ যা নিয়ে এসেছেন তা একই কুলুঙ্গি/উৎস থেকে এসেছে। আল্লাহর শপথ, আমি তাদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেব না এবং তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রও করা যাবে না।[১]

ছাত্র: এটি একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত এবং একটি অত্যন্ত বলিষ্ঠ অবস্থান। উস্তাদ, একটি বিষয়ে প্রশ্ন জাগছে, আর তা হল: বাদশা যে বললেন, নিশ্চয় এটা এবং ঈসা আঃ যা নিয়ে এসেছেন তা একই কুলুঙ্গি/উৎস থেকে এসেছে।

শিক্ষক: সুন্দর, প্রথমত: নাজ্জাশী সে সময় মরিয়ম পুত্র ঈসা আঃ-এর ধর্মের অনুসরণ করছিলেন এবং তিনি জাফর রাঃ-এর কাছ থেকে পবিত্র কুরআন শুনে বললেন: তুমি

(১) পূর্বোক্ত।

কুরআন থেকে যা তেলাওয়াত করেছ এবং ঈসা আঃ আল্লাহর কালামের যা নিয়ে এসেছেন একই কুলুঙ্গি থেকে আগত। অর্থাৎ তা একই উৎস থেকে এসেছে।

তবে যখন আল্লাহর দ্বীন ইসলাম আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর কাছে এসেছে, তখন তা পূর্ববর্তী সকল ধর্মকে বাতিল করে দিয়েছে। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর কাছে যে ধর্ম নাযিল হয়েছে তা ছাড়া এমন কোন ধর্ম নেই যা আল্লাহ মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন। আল্লাহ বলেন:

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥]

অর্থ: *[*যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।*]* সূরা আলে ইমরান: ৮৫। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী এবং তার পরে আর কোন নবী আসবে না।

হামযা রাঃ-এর ইসলাম গ্রহণ:

শিক্ষক: হামযা হলেন নবী সাঃ-এর চাচা। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম অনুসরণ করতেন। তবে নবী সাঃ-এর প্রতি তার একটি অবস্থান ছিল এবং সেটাই তার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণ।

ছাত্র: উস্তাদ, ঐ অবস্থানটি কী ছিল?

শিক্ষক: আমি এই অবস্থানটি উল্লেখ করার আগে, আমি তোমাদেরকে সে সময় আরবদের অবস্থা কেমন ছিল তার একটি চিত্র বর্ণনা করতে চাই। আরবরা শিকার পছন্দ করত, তাই কেউ কেউ নির্জন ভূমিতে যেত, অর্থাৎ এমন জমি যেখানে মানুষ বাস করত না; যেখানে প্রচুর পাখি পাওয়া যেত। তারপর তারা পাখি শিকার করে রান্না করে খেতো।

নবীজির চাচা হামজা রাঃ শিকারে বেরিয়েছিলেন। যখন তিনি শিকার থেকে ফিরে আসেন, তখন তার স্ত্রী তার সাথে দেখা করে জানালেন যে, আবু জাহেল সাফা পর্বতের নিকট নবী সাঃ-কে বাধা দিয়েছে এবং তার উপর নির্যাতন করেছে। তা শুনে হামযা রাঃ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে যান এবং বাড়িতে প্রবেশ না করেই মসজিদুল হারামে চলে আসেন, যেখানে কাবার সন্নিকটে কুরইশদের বৈঠকখানা ছিল।[১]

ছাত্র: সম্ভবত এটি নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর প্রতি হামযা রাঃ-এর ভালবাসার প্রমাণ।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটি ইঙ্গিত দেয় যে, হামযা রাঃ তার ভাতিজাকে খুব ভালবাসতেন। কেউ তাকে কোন প্রকার দিবে এটা তিনি মেনে নেননি। অনুরূপভাবে আবু জাহেল কর্তৃক নবী সাঃ-কে নির্যাতন করাও ইঙ্গিত দেয় যে, নবী সাঃ-এর কওমের লোকেরা মক্কায় তখনও তার ক্ষতি করছিল, অথচ তিনি তা সহ্য করছিলেন।

ছাত্র: সম্ভবত হামযা রাঃ সেখানে গিয়ে আবু জাহেলকে পেয়েছিলেন?

শিক্ষক: হ্যাঁ, তিনি তাদের এক মজলিশে তাকে পেয়েছিলেন। তারপর হামযা রাঃ তার কাছে এসে তার সাথে থাকা ধনুক দিয়ে তাকে আঘাত করলেন। অতঃপর কুরাইশের এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়ালো এবং হামযা রাঃ-কে আবু জাহেল থেকে সরিয়ে দিলো, যাতে বিষয়টি আর না বাড়ে। অতঃপর হামযা রাঃ বললেন, এখন থেকে মুহাম্মাদের ধর্মই আমার ধর্ম; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল। আর আমি এ সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসব না। তারপর তিনি তাদেরকে বললেন: তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাকে বাধা দাও।[২]

এভাবেই হামযা রাঃ ইসলাম গ্রহণ করলেন।

---

(১) দেখুন: ইমাম হাইছামী রচিত 'মাজমাউয যাওয়ায়েদ': ৯/২৬৭।

(২) পূর্বোক্ত।

ছাত্র: মহান আল্লাহ কতই না পবিত্র যিনি এ ঘটনাকে রাসূল সাঃ-এর চাচার ইসলাম গ্রহণের কারণ বানালেন, যা নবী সাঃ-কে আপ্লুত করেছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, হামযা রাঃ-এর ইসলাম গ্রহণ ছিল মুসলমানদের জন্য একটি সম্মান ও শক্তি এবং নবী সাঃ-এর প্রতি সমর্থন। এ কারণে কুরাইশরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছিল এবং তারা বুঝতে পেরেছিল যে, হামযা রাঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর ক্ষতি করা থেকে তাদেরকে বাধা দিবে।

কাজেই তোমরা চিন্তা করে দেখ, নিজের কওমের লোকেরা যেন একের পর এক ইসলামে প্রবেশ করে- এজন্য নবী সাঃ কত ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। আর ধৈর্যের প্রতিদান সাহায্য ও বিজয়।

উমর বিন খাত্তাব রাঃ-এর ইসলাম গ্রহণ:

শিক্ষক: উমর রাঃ ছিলেন ঐসব কুরাইশের অন্যতম যারা জাহেলিয়াতের সময় ইসলামের বিরোধিতা করতো। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছে স্বীয় হিকমতে তাকে হেদায়াত দান করেন।

ছাত্র: তিনি যেহেতু ইসলামকে ঘৃণা করতেন; তাহলে কীভাবে নিজের চিন্তাধারা পরিবর্তন করেছিলেন?

শিক্ষক: প্রিয় ছাত্ররা, তাওফীক কিন্তু আল্লাহর হাতে; তিনিই অন্তরকে পরিবর্তন করেন ও সংশোধন করেন। তাই আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট এই দোয়া করা যে, তিনি যেন আমাদেরকে ও আমাদের অন্তরকে সংশোধন করেন এবং তাঁর দ্বীনের উপর সুদৃঢ় রাখেন।

উম্মে আব্দুল্লাহ বিনতে আবি হাছমা রাঃ বলেন: আল্লাহর শপথ, আমরাও আবিসিনিয়ায় হিজরতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, যেখানে ইতিমধ্যে কিছু মুসলিম হিজরত করেছে।

হঠাৎ উমর এসে আমার সন্নিকটে দাঁড়ালেন, তখনও তিনি শির্কের উপর ছিলেন এবং আমরা তার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা করছিলাম।[১]

ছাত্র: তার মানে তখনও লোকজন পূর্বে যেসব মুসলিমগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন তাদের সাথে সম্মিলিত হচ্ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, যারাই নিজ কওমের লোকদের দ্বারা নির্যাতন ও ক্ষতির আশঙ্কা করছিলেন তারাই স্থানান্তরিত হচ্ছিলেন। তবে যাদের স্বীয় কওমের মধ্যে শক্তি ছিল তারা ছাড়া, যেমন হামযা রাঃ।

ছাত্র: এতো যারাই ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের জন্যই পরীক্ষা ছিল! তবে উমর রাঃ কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?

শিক্ষক: মূলত নবী সাঃ-এর দোয়ার বরকতে উমর রাঃ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণকারী মুসলিমদের সাথে যেসব আচরণ করা হচ্ছে- তা দেখে রাসূল সাঃ স্বীয় প্রভুর নিকট দোয়া করে বললেন: 'হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহেল বিন হিশাম অথবা উমরের দ্বারা আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন। অতঃপর পরদিন সকালে উমর রাঃ রাসূল সাঃ-এর নিকট এসে ইসলাম কবুল করেন।[২]

ছাত্র: সুবহানাল্লাহিল আযীম! আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর দোয়ায় আশ্চর্যজনকভাবে দ্রুত সাড়া দিয়েছেন!

শিক্ষক: হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে ভালবাসতেন, তাই তার দোয়ায় সাড়া দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, নিজ কওমের মাঝে উমর রাঃ-এর বিশেষ শক্তি ও অবস্থান ছিল। কেননা নবী সাঃ স্বীয় রবের কাছে দোয়া করেছিলেন যেন তিনি আবু

---

(১) দেখুন: ইমাম আহমাদ রচিত 'ফাযায়েলে সাহাবা': ১/২৭৯।

(২) সুনানে তিরমিযি: (৩৬৩৮)।

জাহেল অথবা উমরের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করেন। তারপরই উমর রাঃ ইসলাম গ্রহণ করেন।

ছাত্র: তাহলে তো অবশ্যই উমর রাঃ ইসলাম গ্রহণ করার পর মুসলিমগণ শক্তিশালী হয়। ঠিক বলেছি না উস্তাদ?

শিক্ষক: হ্যাঁ ঠিক বলেছো, মুসলিমগণ তখন শক্তিশালী হয়। এ প্রসঙ্গে ইবনে মাসউদ রাঃ বলেন: (উমর রাঃ-এর ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমরা শক্তিশালী হলাম।) [১]

চিন্তা করে দেখ, দু'জন প্রভাবশালী কুরাইশী ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কীভাবে মুসলিমদের অবস্থা সহজ হয়ে গেল। ঐ দু'জন হলেন হামযা ও উমর রাঃ। মহান আল্লাহ বলেন: [নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।] সূরা আল-ইনশিরাহ: ৬। অতএব আমাদের জীবন যাই ঘটুক না কেন তাতে ধৈর্য ধরা ও তা মেনে নেয়া উচিত; কেননা আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন। আল্লাহ বলেন: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবরকারীদের সাথে আছেন।] সূরা আল-বাকারা: ১৫৩। অনুরূপভাবে নিরাশ হওয়া যাবে না; কেননা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ নানা সংকট ও নির্যাতনের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও নিরাশ হননি। কাজেই আমরাও কখনো হতাশ হবো না; কেননা আল্লাহ তায়ালা সকল কিছুর মালিক। যেহেতু তিনি আমাদের সবকিছু জানেন, তাই আমরা কিভাবে হতাশ হতে পারি।

ছাত্র: হ্যাঁ, হতাশ হবার কিছু নেই, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন। আমাদের উচিত ধৈর্যের শিক্ষা নেয়া যেমন আমাদের নবী সাঃ ধৈর্য ধারণ করেছিলেন।

শিয়াবে আবি তালিবের অবরোধ:

(১) সহীহ বুখারী: (৩৮৬৩)।

শিক্ষক: কুরাইশরা যখন বুঝতে পারলো যে, ইসলাম বিভিন্ন গোত্রের মাঝে সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং যেসব সাহাবা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছেন তারা নিরাপদে রয়েছেন। তাছাড়া নবী সাঃ-এর চাচা হামযা ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং উমর বিন খাত্তাবও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তখন কুরাইশরা অনুধাবন করলো যে, ইসলাম ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে। তাই কুরাইশ কাফেররা নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল!(১)

ছাত্র: তাদের এরূপ চিন্তাভাবনা তো খুবই ভয়ানক ছিল!

শিক্ষক: হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এটা খুব মারাত্মক ও বিরাট ব্যাপার, যেমন তোমরা বুঝতে পেরেছো। তবে আল্লাহই হেফাযতকারী ও সহায়ক; তিনিই প্রতিরক্ষামূলক উপকরণ সহজ করে দেন।

ছাত্র: মাশা আল্লাহ, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। স্বীয় কওমের উপর নবী সাঃ-এর ধৈর্য ধারণের ফলে সাধারণ মানুষের মাঝে ইসলামের বিস্তার ঘটেছে। এমনকি কুরাইশের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে কেউ কেউ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছেন।

তবে উস্তাদ, 'শিয়াবে আবু তালেবের অবরোধ' এর মানে বুঝলাম না।

শিক্ষক: শিয়াব-এর মানে দুটি পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান। মক্কার বেশিরভাগ অংশই এরূপ। কারণ, সেখানে অনেক পাহাড় বিদ্যমান। আর অবরোধের অর্থ: মানুষকে বের হতে বা প্রবেশ করতে অথবা তাদের নিকট যেকোন জিনিস যেমন খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিস প্রবেশ করতে দেওয়া থেকে বিরত রাখা।

ছাত্র: আমাদের নবী মুহাম্মদ সাঃ যখন জানতে পারলেন যে, কুরাইশ কাফেররা তাকে হত্যা করতে চায়- তখন তিনি কী করেছিলেন?

---

(১) দেখুন: সিরাতে ইবনে হিশাম: ১/৩৭৫-৩৮০, এবং ফতহুল বারী: ৭/১৯২-১৯৩।

শিক্ষক: তার চাচা আবু তালিব যখন বিষয়টি জানতে পারেন, তখন তিনি বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিবকে একত্র করেন এবং বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করেন। তারা নবী সাঃ-কে সুরক্ষা দেয়ার জন্য তার চাচার অনুরোধে সাড়া দিয়েছিল, এমনকি তাদের মধ্যে কাফেরও সাড়া দিয়েছিল আত্মীয়তা বা গোত্রীয় অহমিকার কারণে। তবে আবু লাহাব ছাড়া, যিনি বাকি কুরাইশদের সাথে ছিলেন। তাই তারা রাসূল সাঃ-কে তাদের শিয়াবে নিয়ে আসে। আর এটা ছিল তার নবুওয়ত লাভের সপ্তম বছরে মহররমের প্রথম দিনে।(১)

ছাত্র: উস্তাদ, আপনি উল্লেখ করেছেন, তারা তার চাচা আবু তালিবের অনুরোধে সাড়া দিয়েছিল, এমনকি তাদের মধ্যে কাফেরও ছিল। আর এটা আত্মীয়তা বা গোত্রীয় অহমিকার কারণে ছিল। আত্মীয়তার অহমিকা কী বুঝলাম না?

শিক্ষক: আত্মীয়তা বা গোত্রীয় অহমিকার অর্থ হল কোন গোত্রের সদস্যরা তাদের নিজ গোত্র বা এর সদস্যদের সমর্থন করে। আর এটা করে থাকে স্বীয় গোত্রকে সাহায্য ও সমর্থন দানের জন্য, সত্যের প্রতি সমর্থন স্বরূপ নয়। আর এই গোত্রীয় অহমিকা প্রাক-ইসলামিক রীতি অনুযায়ী বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইসলাম পরবর্তীতে তা বাতিল করে দেয় এবং সত্য ছাড়া অন্য কাউকে সমর্থন করা নিষিদ্ধ করে। এটি প্রাক-ইসলামী যুগের সমর্থন ও সহযোগিতার রীতিকেও বিলুপ্ত করেছে, যেখানে তারা শুধুমাত্র গোত্রের স্বার্থে মযলুমদের বিরুদ্ধে যালেমকে সমর্থন করতো।(২)

ছাত্র: এই ইসলাম সুন্দর, এটা মানুষকে নৈতিক শিক্ষা দেয়।

---

(১) পূর্বোক্ত।

(২) এখানে শিক্ষক ছাত্রদেরকে পারস্পরিক সহযোগিতার সঠিক ও বেঠিক কিছু নমূনা উল্লেখ করে প্র্যাকটিক্যালী শিক্ষা দিতে পারেন।

শিক্ষক: যখন কুরাইশ মুশরিকরা এই অবরোধে একমত হল, তখন তারা এটা একটি দলিলে বা কাগজে লিখে কাবায় ঝুলিয়ে দেয়- যাতে তারা এই সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে না আসে।

ছাত্র: এই অবরোধে মুসলমানরা কি করেছিল?

শিক্ষক: এই অবরোধ দুই-তিন বছর অব্যাহত ছিল এবং মুসলমান ও তাদের সঙ্গীরা এই অন্যায় অবরোধে ধৈর্য ধরেছিল। তাদের নিকট কোন খাদ্যদ্রব্য আমদানি হতো না; তারা অনাহারে দিনাতিপাত করতেন, এমনকি ক্ষুধার তীব্রতায় তারা গাছের পাতা পর্যন্ত খেয়ে থেকেছেন।

ছাত্র: উস্তাদ, এটা তো দীর্ঘ সময়?

শিক্ষক: হ্যাঁ, অবরোধ এবং ধৈর্যের দীর্ঘ সময়। অবশেষে কুরাইশ কাফেরদের মধ্য থেকে হিশাম বিন আমর বিন হারেস আল-আমেরী নামক এক ব্যক্তি এই দলিলকে অপছন্দ করে এবং গোপনে গোপনে শিয়াবের ভিতরে খাদ্য সামগ্রী পাঠাতে থাকে। সে নিজ উদ্যোগে কুরাইশ কাফেরদের মধ্য থেকে কিছু লোকের সাথে এক এক করে যোগাযোগ করে এবং তারা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, উক্ত অন্যায় দলিলটি তারা ছিঁড়ে ফেলবে। আর প্রচার করা হবে যে, উক্ত দলিলটিতে আল্লাহর নাম ব্যতীত যা কিছু লেখা ছিল সবই মাটি খেয়ে ফেলেছে![১]

ছাত্র: কঠিন পরিস্থিতি, কিন্তু মহান আল্লাহ এই ব্যক্তি তথা হিশাম বিন আমরের হৃদয়ে রহমত স্থাপন করেছিলেন, দলিলটি ছিঁড়ে ফেলতে সাহায্য করার জন্য।

শিক্ষক: সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতেই সবকিছু, তিনিই সেই দলিলটি ছিঁড়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছেন এবং যমীনকে এর মধ্যে লেখা সমস্ত অন্যায় কথা গ্রাস করিয়েছেন।

---

(১) পূর্বোক্ত।

শুধু তাতে অবশিষ্ট ছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর নাম। এটি আমাদের দুঃখকষ্টের মুখে ধৈর্যের গুরুত্ব শেখায়। এও শেখায় যে, যেভাবে আল্লাহ নবী সাঃ ও তার সাহাবীদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন সেভাবে তিনি একজন মুসলমানকেও পরীক্ষা করতে পারেন। আর এ পরীক্ষা মুসলিম ব্যক্তির উপর আল্লাহর গজব নয়, বরং কেয়ামতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে এবং যাতে কষ্টের পর তার কাছে স্বস্তি আসে।

আবু তালিব ও খাদীজা রাঃ-এর মৃত্যু:

শিক্ষক: শিয়াবে আবি তালিব থেকে কিছু সংখ্যক মুসলিম বের হবার পর চাচা আবু তালিব এবং নবী সাঃ-এর স্ত্রী খাদীজা রাঃ মৃত্যু বরণ করেন।[১]

ছাত্র: এটি নবী সাঃ-এর জন্য আরেকটি মসিবত ও পরীক্ষা ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটা পরীক্ষাই ছিল; স্বীয় চাচা এবং স্ত্রীর মৃত্যু একটি পরীক্ষা ছিল। বিশেষ করে যেহেতু কুরাইশদের উপর তার চাচার একটি মহান অবস্থান ছিল এবং তিনি নবী সাঃ-কে সমর্থন করছিলেন। এছাড়াও, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাঃ নবী সাঃ-কে সান্ত্বনা দিতেন ও ধৈর্য ধরতে উৎসাহিত করতেন। তিনি ছিলেন সর্বোত্তম স্ত্রী, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হোন। কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফয়সালা এটাই, আমাদের অবশ্যই এর উপর ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

নবী সাঃ তার চাচা ও স্ত্রীকে হারিয়ে এতটাই দুঃখ পেয়েছিলেন যে, সেই বছরটিকে দুঃখের বছর বলা হয়। বিশেষ করে যেহেতু তার চাচা ইসলাম গ্রহণ করেননি, যদিও তিনি তাকে সমর্থন করেছিলেন, ভালোবাসতেন এবং রক্ষা করেছিলেন। নবী করীম সাঃ বহুবার চেষ্টা ও সাধনা করেছেন ইসলামে ছায়াতলে আনতে, এমনকি তার জীবনের

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৫৭-৫৮।

শেষ মুহূর্তেও। কিন্তু কুরাইশ কাফেররা তাকে তার বাপ-দাদার শির্কী ধর্মে থাকতে উৎসাহিত করছিল।

ছাত্র: সুবহানাল্লাহিল আযীম, তিনি আল্লাহর নবীকে সমর্থন করেছিলেন এবং তাকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি?!

শিক্ষক: হ্যাঁ, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। মূলত কুরাইশ মুশরিকদের কারণে, যারা তাকে ঘিরে রেখেছিল এবং তাকে তার শির্কী বিশ্বাসের উপর স্থির থাকতে উৎসাহিত করেছিল। তাই, আমাদেরকে অবশ্যই খারাপ সঙ্গের কুফল থেকে সাবধান থাকতে হবে, যা একজন ব্যক্তিকে আল্লাহর অবাধ্য হতে উৎসাহিত করে।

তারপর আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি; আমাদেরকে মুসলমান করার জন্য। কেননা এটা অনেক বড় নেয়ামত; কারণ হেদায়াত আমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি দান, যেমনটি আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছেন যখন তিনি তার চাচাকে হেদায়াত চেষ্টা করছিলেন:

﴿إِنَّكَ لَا تَهۡدِي مَنۡ أَحۡبَبۡتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهۡدِي مَن يَشَآءُۚ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ﴾ [القصص: ٥٦]

অর্থ: [আপনি যাকে ভালবাসেন তাকে হেদায়েত করতে পারবেন না, তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি ভাল জানেন কারা সৎপথে আছে।] সূরা আল-কাসাস: ৫৬।

তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা:

শিক্ষক: চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা তার চাচার জীবদ্দশায় নবী সাঃ-এর যতটা ক্ষতি করেছিল তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করতে শুরু করে। তাই আল্লাহর

রাসূল সাঃ তায়েফের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, এই আশায় যে তিনি হয়তো সাকিফ গোত্রের কাউকে পাবেন যে তাকে সমর্থন করবে এবং আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ করবে।[১]

ছাত্র: নবী সাঃ কি সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে তাদের কাছে গিয়েছিলেন?

শিক্ষক: না, তিনি একাই তায়েফে গিয়েছিলেন যাতে কেউ তার সম্পর্কে জানতে না পারে। নচেৎ তারা তো তাকে বাধা দেবে, অথবা তারা বনু সাকিফের কাছে গিয়ে নবী সাঃ-কে সমর্থন করার বিরুদ্ধে সতর্ক করবে।

ছাত্র: তাহলে তো এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা যা আল্লাহর রাসূল সাঃ নিয়েছেন। কিন্তু তায়েফের সাকিফ গোত্র আমাদের নবী মুহাম্মদ সাঃ-কে সমর্থন করেছিল কি?

শিক্ষক: নবী সাঃ যখন তায়েফে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানকার নেতৃবর্গের কাছে গেলেন। আর তারা ছিল তিন ভাই: আবদ ইয়ালিল বিন উমর বিন উমাইর, তার ভাই মাসুদ ও তৃতীয় ভাই হাবিব।

তারপর আল্লাহর রাসূল সাঃ তাদের সাথে বসলেন, তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করলেন এবং তার ও এই দ্বীনের জন্য তাদের সমর্থন চাইলেন। কিন্তু তারা তার আহ্বান বা সমর্থন প্রার্থনা গ্রহণ করেনি। তিনি তাদের কাছে তার সফরের খবর গোপন রাখার অনুরোধ করেন, যাতে মক্কায় তার কওমের লোকেরা জানতে না পারে এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে।[২]

ছাত্র: আল্লাহর কসম, এটা খুবই কঠিন পরিস্থিতি। নবী সাঃ ধৈর্য সহকারে এসব পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন।

---

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৬০-৬২

(২) পূর্বোক্ত।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটা এক কঠিন পরিস্থিতি; যখন তুমি কারও কাছে যাবে আর তারা তোমাকে ফেরত দেয়। বিশেষ করে যেহেতু তাদের কাছে যিনি এসেছেন তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী সাঃ এবং তিনি তাদের কাছে অর্থকড়ি বা পার্থিব কোন কিছু চাইতে আসেননি। বরং তিনি সত্য নিয়ে এসেছেন যা আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন। কিন্তু আল্লাহ আমাদের জন্য এটাকে উপদেশ বানিয়েছেন যাতে আমরা শিখতে পারি, ধৈর্য ধরতে পারি এবং হতাশ না হই। অন্যথায়, আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর নবুওয়তকে খুব সহজ করে দিতে সক্ষম। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাঃ কী কী সমস্যা মোকাবেলা করেছেন, কীভাবে তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন, তারপর ধৈর্য ও পরিশ্রমের পরে সফল হয়েছিলেন এবং বাধা-বিপত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেননি।

অতএব আমরাও সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করবো না। বরং আমরা চেষ্টা করে যাবো, ধৈর্য ধারণ করবো, কাজ অব্যাহত রাখবো, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইবো এবং তাঁর উপর ভরসা রাখবো। আর এটা আমাদের সমস্ত বিষয়ে প্রযোজ্য।

ছাত্র: তারা তার আহ্বান ও সমর্থন প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করার পর নবী সাঃ কী করেছিলেন?

শিক্ষক: তারা শুধু নবী সাঃ-এর আহবান প্রত্যাখ্যানই করেনি, বরং তারা তাদের ছোট বাচ্চাদেরকে ডেকে তাদেরকে ও তাদের দাসদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল, যেন তারা তার উপর পাথর নিক্ষেপ করে, তাকে গালিমন্দ করে এবং তার বিরুদ্ধে চিৎকার করে- যতক্ষণ না তার বিরুদ্ধে লোকজন জড়ো হয়। অতঃপর তিনি একটি প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভিতরে একটি বাগানে আশ্রয় নিলেন। তারপর বাচ্চারা ও মূর্খ লোকগুলো চলে যায়। রাসূল সাঃ একটি আঙ্গুরের মাচার নিচে ছায়ায় বসলেন। মাচা বলতে একটি কাঠের শেড যার উপর আঙ্গুরের ডালপালা ও পাতা ছড়িয়ে থাকে।

ছাত্র: আল্লাহর কসম, আমাদের নবী সাঃ-এর এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া খুবই দুঃখজনক।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটি একটি অত্যন্ত দুঃখজনক পরিস্থিতি, যেমন তোমরা বলেছ। তবে এই দ্বীনের দাবি হল আমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যে এবং প্রত্যেক কষ্ট-মসিবতে ধৈর্য ধরতে হবে। তাই আমাদেরকে সালাত আদায়ে ধৈর্যশীল হতে হবে, তা পরিত্যাগ করা বা তাতে অলসতা করা যাবে না, সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকতে হবে, মিথ্যা বলা যাবে না, দ্বীনী বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হবে, মাসআলা-মাসায়েল শিখতে হবে, কুরআন হিফজের চেষ্টা করতে হবে, হাদিস শিখতে হবে, পিতামাতার আনুগত্য করতে হবে, আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করতে হবে এবং পার্থিব দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য ধারণ করতে হবে; অধ্যবসায়, কঠোর পরিশ্রম ও উদ্যমতার সাথে।

ছাত্র: ঠিক বলেছেন উস্তাদ! যদি আমাদের নবী সাঃ নির্যাতনে ধৈর্য্য ধরেন এবং কষ্ট সহ্য করেন, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই তিনি আল্লাহর কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন তার উপর আমল করতে হবে এবং ইবাদত পালনে ধৈর্য ধরতে হবে।

শিক্ষক: ঠিক বলেছো। যখন নবী সাঃ আঙ্গুরের মাচার নিচে বসলেন, যা উতবা বিন রাবিয়া ও তাঁর ভাই শায়বার ছিল। রাসূলুল্লাহ সাঃ তার নিচে স্বস্থি অনুভব করছিলেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন। তিনি দোয়ায় বললেন: (হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে আমার শক্তির দুর্বলতা, কৌশলের স্বল্পতা ও মানুষের নিকটে অপদস্থ হওয়ার অভিযোগ পেশ করছি। হে শ্রেষ্ঠ দয়াবান! তুমি দুর্বলদের প্রতিপালক! আর তুমিই আমার একমাত্র পালনকর্তা। ...)[১]

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৬২।

তোমরা চিন্তা করে দেখ, যেখানে আল্লাহর রাসূল সাঃ তার শক্তি ও কৌশলের দুর্বলতার অভিযোগ করেছেন। আর আল্লাহ তায়ালা পরম করুণাময় এবং নিপীড়িতদের প্রভু।

ছাত্র: উস্তাদ, এটা খুব সুন্দর। আমরা এ থেকে শিখতে পাই যে, যখনই আমাদের উপর বিপর্যয় আসে, বা আমাদের কিছু প্রয়োজন হবে, তখন আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে যাব, যার দিকে আমাদের রাসূল মুহাম্মদ সাঃ ফিরে এসেছিলেন এবং যা প্রয়োজন তা আমরা তাঁর কাছেই চাইবো।

শিক্ষক: চমৎকার হে স্নেহের ছাত্ররা। দোয়া একটি মহান ইবাদত, তাই আমাদের প্রত্যেক প্রয়োজনের জন্য আল্লাহর কাছেই দোয়া করতে হবে।

ছাত্র: তারপর রাসূল সাঃ ঐ বাগানে কী করেছিলেন?

শিক্ষক: নবী সাঃ যখন বাগানে বসেছিলেন তখন আঙ্গুর বাগিচার মালিক উতবা ও শায়বা যখন দূর থেকে রাসূল সাঃ-এর এ দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা দেখলেন, তখন তারা তাদের খ্রিষ্টান গোলাম 'আদ্দাস'-কে বললেন: এই এক গোছা আঙ্গুর নিয়ে ঐ লোককে দিয়ে আস। আদ্দাস তাই করলো, সে নবী সাঃ-কে তা থেকে খেতে বললো। রাসূলুল্লাহ সাঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে তা হাতে নিয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। বিস্মিত হয়ে আদ্দাস বলে উঠল, এ ধরনের কথা তো এ অঞ্চলের লোকেরা বলে না! রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তুমি কোন দেশের লোক? তোমার ধর্ম কি? সে বলল, আমি একজন খ্রিষ্টান। আমি 'নীনাওয়া' এর বাসিন্দা। রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, 'সৎকর্মশীল ব্যক্তি ইউনুস বিন মাত্তা-এর এলাকার লোক'? লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি ইউনুস বিন মাত্তা-কে কিভাবে চিনলেন? রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, 'তিনি তো আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন এবং আমিও নবী'। একথা শুনে আদ্দাস রাসূল সাঃ-এর মাথা, হাত ও পায়ে চুমু খেল।

দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে উতবা ও শায়বা দু'ভাই একে অপরকে বলতে লাগল, দেখছি শেষ পর্যন্ত লোকটা আমাদের ক্রীতদাসকেও বিগড়ে দিল। ক্রীতদাসটি ফিরে এসে তার মনিবকে বলল: 'হে আমার মনিব! পৃথিবীতে এই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কেউ নেই'। তিনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে খবর দিয়েছেন, যা নবী ব্যতীত কেউ জানে না'। তারা বলল, 'সাবধান আদ্দাস! লোকটি যেন তোমাকে তোমার ধর্ম থেকে ফিরিয়ে নিতে না পারে। কেননা তোমার দ্বীন তার দ্বীন অপেক্ষা উত্তম'।[১]

ছাত্র: কেন তারা আদ্দাসকে বলল যে, তোমার দ্বীন তার দ্বীন অপেক্ষা উত্তম?

শিক্ষক: কেননা তারা জানত না যে নবী সাঃ-এর নিকটে কি আছে এবং তারা না জেনেই একথা বলেছে।

অতঃপর, নবী সাঃ তার উপর যে নির্যাতন করা হয়েছিল তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: **(তখন আমি এমনভাবে বিষণ্ণ চেহারা নিয়ে ফিরে এলাম যে, 'কারনুস সাআলিব'** -মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী এক স্থান-**এ পৌঁছা পর্যন্ত আমার চিন্তা দূর হয়নি। তখন আমি মাথা উপরে উঠালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম এক টুকরো মেঘ আমাকে ছায়া দিচ্ছে। আমি সে দিকে তাকালাম। তার মধ্যে ছিলেন জিব্রাঈল আঃ। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে এবং তারা উত্তরে যা বলেছে তা সবই আল্লাহ শুনেছেন। তিনি আপনার নিকট পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠিয়েছেন। এদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে আপনি তাকে হুকুম দিতে পারেন। তখন পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন। অতঃপর বললেন, হে মুহাম্মাদ! এসব ব্যাপার আপনার ইচ্ছাধীন। আপনি যদি চান, তাহলে আমি তাদের উপর 'আখশাবাইন'** -মক্কার দুটি পাহাড়-**কে চাপিয়ে দিব। উত্তরে নবী সাঃ বললেন, বরং আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম**

(১) পূর্বোক্ত।

দেবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, আর তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না।) সহীহ বুখারী।

ছাত্র: যারা নবী সাঃ-কে মারধর করেছে এবং তাকে নির্যাতন করেছে তাদের সম্পর্কে তিনি কি বলবেন বলে আপনি আশা করেন? তিনি কি বলবেন: হ্যাঁ, তাদের উপর 'আখশাবাইন' তথা মক্কায় হারামের পার্শ্ববর্তী দুটি পাহাড়কে চাপিয়ে দিতে বলবেন? নাকি তিনি তাদের ক্ষমা করবেন, তাদের উপর ধৈর্য ধরবেন এবং তাদের বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন; এই আশায় যে, হয়তো তারা ইসলাম গ্রহণ করবে?

নবী সাঃ তো পাহাড়ের ফেরেশতাকে বলেছেন: **(বরং আশা করি মহান আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন সন্তান জন্ম দেবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদাত করবে, আর তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না।)** অর্থাৎ তুমি তাদের উপর পাহাড়কে চাপিয়ে দিবে না। বরং তাদের ছেড়ে দাও; হয়তো আল্লাহ তাদের বংশধরদের মধ্যে এমন লোক তৈরি করবেন যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইবাদত করবে। কেননা আল্লাহ যদি তাদেরকে ধ্বংস করে দেন, তবে তাদের মৃত্যুর কারণে তাদের কোন বংশ থাকবে না। কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ তো নিজের প্রতিশোধের কথা ভাবেন না, বরং ইসলামে প্রবেশ করিয়ে মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর কথা ভাবেন।

তারপর তোমরা ভেবে দেখ যে, নবী সাঃ তার রবকে ডাকলেন, আর কিভাবে আল্লাহ তার কাছে জিবরাঈল আঃ-কে পাঠিয়ে তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন?

ছাত্র: হ্যাঁ, এটা এক মহান ও সম্মানজনক অবস্থান ছিল।

শিক্ষক: নবী সাঃ তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়, মাঝরাতে নাখলা নামক এলাকায় সালাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। অতঃপর জিনদের একটি দল তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং তারা নবী সাঃ-এর নামাজের সময় কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পেল।

তারপর তারা ঈমান আনলো। রাসূল সাঃ-এর নামাজ শেষ হলে তারা নিক কওমের নিকট সতর্ককারী রূপে ফিরে গেল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَإِذۡ صَرَفۡنَآ إِلَيۡكَ نَفَرٗا مِّنَ ٱلۡجِنِّ يَسۡتَمِعُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوۡاْ إِلَىٰ قَوۡمِهِم مُّنذِرِينَ﴾ [الأحقاف: ٢٩]

অর্থ: [আর স্মরণ কর, যখন আমি জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। তারা কুরআন পাঠ শুনছিল। যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হল, তখন তারা বলল, 'চুপ করে শোন। তারপর যখন পাঠ শেষ হল তখন তারা তাদের কওমের কাছে সতর্ককারী হিসেবে ফিরে গেল।] সূরা আল-আহকাফ: ২৯।

সুতরাং ভেবে দেখ: যখন তার কওমের লোকেরা তাকে বাধা দিয়েছিল এবং তার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন কীভাবে আল্লাহ তায়ালা জিনদেরকে অনুগত করালেন; তারা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিল এবং নবী সাঃ-এর রিসালাতে বিশ্বাস করেছিল?

ছাত্র: নিশ্চয় এটা দ্বীনের জন্য কোরবানি, কিন্তু মহান আল্লাহ রাসূল সাঃ-এর সাথে আছেন।

ইসরা ও মেরাজ:

শিক্ষক: তায়েফ সফরের পর, যেখানকার নেতারা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং আল্লাহর রাসূলকে অপমান করেছিল, ইসরা ও মেরাজের সফর আসে।

ছাত্র: উস্তাদ, ক্ষমা করবেন, ইসরা ও মেরাজের অর্থ কী?

শিক্ষক: ইসরা হল রাতে গমন করা বা সফর করা। আর মেরাজ এর শাব্দিক অর্থ উপরে উঠা বা আরোহণ করা। এর মানে হল নবী সাঃ-এর দুটি ঘটনা ঘটেছিল: এক. ইসরা; তথা মক্কা থেকে রাতের বেলায় বায়তুল মুকাদ্দাসে গমন। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِيٓ أَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِۦ لَيۡلٗا مِّنَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ إِلَى ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡأَقۡصَا ٱلَّذِي بَٰرَكۡنَا حَوۡلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنۡ ءَايَٰتِنَآۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾ [الإسراء: ١]

অর্থ: *[*পবিত্র মহান সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে নিয়ে গিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার আশপাশে আমি বরকত দিয়েছি, যেন আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাতে পারি। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।*]* সূরা আল-ইসরা: ০১। দুই. মেরাজ; তথা নবী সাঃ-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল।

ছাত্র: তাহলে নবী সাঃ-এর সাথে দুটি জিনিস ঘটেছিল: প্রথমটি. তাকে মসজিদুল হারাম থেকে আল-আকসা মসজিদে রাত্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়টি: তিনি আকাশে আরোহণ করেছেন। কিন্তু এটা কিভাবে হলো উস্তাদ? আশা করছি আপনি আমাদের এই মহান বিষয় ব্যাখ্যা করবেন।

শিক্ষক: আনাস বিন মালেক রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূল সাঃ বলেন: *(***আমার কাছে বুরাক আনা হল। বুরাক গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙের লাম্বা জন্তু। যতদুর দৃষ্টি যায়, এক এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে।***)* সহীহ মুসলিম। হাদিসের এই অংশটি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দেয় যে, নবী সাঃ যে পশুতে চড়েছিলেন তাকে বুরাক বলা হয়। এটা রঙে সাদা এবং লম্বা। এটা গাধার চেয়ে বড় ও খচ্চর থেকে ছোট, যা ঘোড়ার সদৃশ।

বুরাকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় রাসূল সাঃ বলেন: *(***যতদুর দৃষ্টি যায়, এক এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে।***)* অর্থাৎ অর্থাৎ, সে চলার সময় গতিতে বিদ্যুতের মতো দ্রুত ছিল, এবং যদি সে তার পা বাড়াতো, তবে তার গতির তীব্রতার কারণে তার দৃষ্টিশক্তি যেখানে পৌঁছতো সেখানে পা ফেলতো।

তারপ রাসূল সাঃ বলেন: *(***আমি এতে আরোহন করলাম এবং বায়তুল মাকদাস পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম। তারপর অন্যান্য নবীগণ তাদের বাহনগুলো যে রশিতে বাধতেন, আমি

সে রশিতে আমার বাহনটিও বাঁধলাম। তারপর মসজিদে প্রবেশ করলাম ও দু-রাকাত সালাত আদায় করে বের হলাম।) তারপর তাকে নিয়ে জিবরাঈল আঃ আসমানে উঠে গেলেন।

ছাত্র: এটা একটা চমৎকার ভ্রমণ ছিল, তাই না উস্তাদ?

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটি এক বিস্ময়কর ভ্রমণ ছিল যা আল্লাহর অনুগ্রহে রাসূল সাঃ-এর প্রাপ্য ছিল। এটা এমন সময়ের পরে ছিল যখন তার কওমের লোকেরা তাকে যাদুকর, পাগল ও গণক বলে অপবাদ দিয়েছিল এবং তার উপর উটের নাড়িভূড়ি নিক্ষেপ করেছিল ও সাহাবীদের নির্যাতন করেছিল; তারপর তারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন, এদিকে তিনি শিয়াবে আবি তালেবে অবরুদ্ধ হন, তারপর চাচা আবু তালিব ও স্ত্রী খাদিজা রাঃ মারা যান, এরপর তিনি তায়েফ থেকে বিতাড়িত হন। নবী সাঃ এই সমস্ত ক্লেশ, অসুবিধা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন- ফলে এই মহান সফরের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর পুরষ্কার পেয়েছেন।

ছাত্র: উস্তাদ, আপনি কি আমাদেরকে আসমানে আরোহণের যাত্রা সম্পর্কে বলবেন?

শিক্ষক: মহান আল্লাহ আমাদের বলেছেন যে, আকাশ সাতটি, যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿فَقَضَىٰهُنَّ سَبۡعَ سَمَٰوَاتٖ﴾ [فصلت: ١٢]

অর্থ: [অতঃপর তিনি এগুলোকে সাত আসমানে নির্ধারণ করেছেন।] সূরা ফুসসিলাত: ১২।

নবী সাঃ-কে সর্বপ্রথম দুনিয়ার আসমানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং জিবরাঈল আঃ আসমানের রক্ষক ফেরেশতাকে বললেন: খুলে দাও। সে বললো, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি জিবরাঈল। বলা হল, আপনার সাথে কে? বললেন, মুহাম্মাদ। বলা হল, আপনাকে কি তাকে আনতে পাঠানো হয়েছে? বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর দরজা খুলে দেয়া

হলে তারা দুনিয়ার আসমানের উপরে গেলন। সেখানে আদম আঃ-এর সাক্ষাত পেয়ে যান। আদম আঃ হলেন মানব জাতির পিতা; কেননা আল্লাহ তায়ালা হাওয়াকে তার স্ত্রীকে বানিয়েছেন, তারপর তারা সন্তান জন্ম দেন এবং তাদের বহু সন্তান জন্ম নেয়। তাই মানব জাতির সবার মূল আদম ও হাওয়া।

ছাত্র: উস্তাদ, প্রত্যেক আসমানেই কি পাহারাদার ফেরেশতা আছে?

শিক্ষক: হ্যাঁ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ এই মহাবিশ্বকে সুন্দর ও সুনির্দিষ্টভাবে সাজিয়েছেন। এর অন্তর্গত হল তিনি প্রত্যেক আসমানকে পাহারা দেয়ার জন্য ফেরেশতা নিয়োগ করেছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা প্রজ্ঞাময় ও মহান।

ছাত্র: এর পরে কী ঘটেছে?

শিক্ষক: অতঃপর তাকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং এর রক্ষক জিবরাঈল আঃ-কে একই কথা বললেন, যা নিম্ন আকাশের রক্ষক বলেছিলেন। আর জিবরাঈল আঃ তাকে বলেছেন যে, তার সাথে মুহাম্মাদ সাঃ আছেন, এবং তাকে তার কাছে পাঠানো হয়েছিল। অতঃপর তিনি আসমানগুলোতে আদম, ইদ্রিস, মূসা, ঈসা ও ইবরাহীম আঃ-এর সাক্ষাত পেয়েছিলেন।

এই সফরে মহান আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মদ সাঃ ও তার উম্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করে দেন, যা আসমানে ফরজকৃত এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাহাত্ম্য নির্দেশ করে।

এই সফরে রাসূল সাঃ জান্নাত দেখেছিলেন এবং তাতে প্রবেশ করেছিলেন।

এই সফরটি আল্লাহর নিকট মহানবী সাঃ-এর মর্যাদা ও তার অবস্থানকে নির্দেশ করে। কেননা তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করেছিলেন, তাকে আসমানে

উঠানো হয়েছিল, কয়েকজন নবীর সাক্ষাত পেয়েছিলেন এবং তিনি জান্নাত দেখেছিলেন ও তাতে প্রবেশ করেছিলেন। এমনকি এই সফরে তার উপর নামাজ ফরজ করা হয়।

সুতরাং ধৈর্যশীল, প্রভুর আনুগত্যকারী এবং উচ্চ নৈতিকতার অধিকারী নবী সাঃ-এর জন্য মহান আল্লাহর পুরস্কার দেখ- যিনি স্বীয় কওমের অত্যাচার সহ্য করেছিলেন। অতএব, আমরা যদি আমাদের বরকতময় প্রভুর আনুগত্য করি এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলি, তাহলে তিনি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও সফলতা দান করবেন এবং আমাদেরকে বরকত দেবেন। কাজেই আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা আমাদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ।

দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন গোত্রের নিকট আবেদন পেশ:

শিক্ষক: আল্লাহর রাসূল সাঃ তায়েফবাসীদের কাছ থেকে যে আচরণের শিকার হয়েছিলেন তাতে নিরাশ হননি, বরং হজ্জের জন্য মক্কায় আগত অথবা আরবের বাজারের জন্য আগত বিভিন্ন গোত্রের লোকদের নিকট তার দাওয়াত উপস্থাপন শুরু করেছিলেন।

ছাত্র: তখন কি আরবদের বড় কোন বাজার ছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, আরবদের অনেক বড় প্রসিদ্ধ বাজার ছিল, যেখানে মক্কা ও বাইরের এলাকা থেকে বিভিন্ন গোত্রের বণিকরা আসতেন। তাদের মধ্যে কেউ পণ্য আনতেন, কেউ কিনতে আসতেন এবং তাদের কেউ উভয় কাজেই আসতেন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল সূক ওকাজ, সূক যুল-মাজায এবং মাজান্না। এমনকি কবিরা তাদের কবিতা আবৃত্তি করতেন সেই বাজারে, যাতে লোকেরা তা শুনে ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

ছাত্র: নবী সাঃ কীভাবে গোত্রের লোকদের কাছে তার দাওয়াত পেশ করেছিলেন?

শিক্ষক: আল্লাহ্‌র রাসূল সাঃ গোত্রের উপরে দাঁড়িয়ে বলতেন, "হে বংশ, আমি তোমাদের মাঝে প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল; আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে এবং আমাকে বিশ্বাস করার নির্দেশ দিচ্ছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা বাস্তবায়ন করা পর্যন্ত আমি দাওয়াত দিয়ে যাব।)[১]

তিনি আরো বলতেন: (হে মানুষ, তোমরা বল 'আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন ইলাহ নেই'। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।)[২]

তিনি আরো বলতেন: (কে আমাকে আশ্রয় দেবে যতক্ষণ না আমি আমার প্রভুর বাণী পৌঁছে দিব? তার জন্য জান্নাত রয়েছে।)[৩]

রাবিয়া বিন আব্বাদ এটার বর্ণনা করতে গিয়ে কী বলেছেন তা চিন্তা করে দেখ, যেখানে তিনি বলেছেন: আমি যুল-মাজাযে আল্লাহর রাসূল সাঃ-কে লোকদের দাওয়াত দিতে দেখেছি। তখন তার পিছনে একজন বাকা চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল; সে বলছিল: এই লোক যেন তোমাদেরকে তোমাদের উপাস্যদের ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়। আমি বললাম: এ লোকটি কে? তারা বলল, এটা তার চাচা আবু লাহাব![৪]

ফলে এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, নবী সাঃ মানুষের কাছে গিয়ে তাদের বুঝিয়ে বলতেন যে, তিনি রিসালাতসহ আল্লাহর প্রেরিত নবী। আর তার চাচা আবু লাহাব তার পেছন পেছন চলতো ও বলতো: এ যেন তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন তথা মূর্তির পূজা থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়।

---

(১) মুসনাদে আহমাদ: (৩/৪৯২)

(২) মুসনাদে আহমাদ: (৩/৪৯২)

(৩) মুসনাদে আহমাদ: (৩/২২৩-২২৪)

(৪) মুসনাদে আহমাদ: (৩/৪৯২)

আবু লাহাব একজন টেরা চোখবিশিষ্ট লোক ছিল।

ছাত্র: তার মানে নবী সাঃ-এর চাচা আবু লাহাব তাকে দাওয়াতী কাজে কষ্ট দিতেন?

শিক্ষক: হ্যাঁ, তার চাচা ও অন্যান্য লোকেরা নবী সাঃ-এর দাওয়াতে বাধা দিত ও তাকে কষ্ট দিত এবং মানুষকে বলত: তোমরা একে বিশ্বাস করো না।

ছাত্র: তারা যখন এই ক্ষতি করছিল তখন আল্লাহর রাসূল সাঃ কী করেছিলেন?

শিক্ষক: তিনি ছিলেন ঈমানে শক্তিশালী, দাওয়াত প্রদানে অনড়; এসব বাধা-বিপত্তিতে তিনি থেমে যাননি। বরং এসবকে মোকাবেলা করেছেন, অতিক্রম করেছেন ও এড়িয়ে গেছেন এবং অন্য গোত্রে চলে যেতেন। এসব নির্যাতনকারীর দিকে ভ্রুক্ষেপ করতেন না। আমাদেরও উচিত, এভাবে কাজ করা; কাজেই আমরা নির্যাতনকারীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করব না, বরং তাকে নিয়ে ব্যস্ত না হয়ে এড়িয়ে যাব ও কাজ চালিয়ে যাব, যাতে আমাদের সময় অপচয় না হয়।

ছাত্র: খুব চমৎকার উস্তাদ, যাতে আমরা তাদের দিকে না তাকাই এবং যারা আমাদের সাধনা, অধ্যবসায় ও প্রশংসনীয় কাজ সম্পাদন থেকে বিভ্রান্ত করে তাতে ক্ষান্ত হয়ে না পড়ি। বরং আমরা তাদেরকে এড়িয়ে যাব এবং কল্যাণের দিকে আমাদের পথচলা অব্যাহত রাখব।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আমরা আমাদের কল্যাণের পথচলা অব্যাহত রাখব। আমরা জানি যে, এমন কিছু লোক আছে যারা অন্যের ভাল চায় না, বরং দুর্নীতি ও খারাপ নৈতিকতা চায়; কাজেই আমরা তাদের কারণে থেমে থাকব না, বরং আমরা সৎ নৈতিকতার দিকে ধাবিত হব, যেভাবে নবী সাঃ তার দাওয়াতে ক্ষান্ত হননি। বরং যারা তার দাওয়াত নষ্ট করতে চেয়েছিল তাদেরকে তিনি এড়িয়ে গেছেন।

ছাত্র: কেউ কি আমাদের নবী সাঃ-এর দাওয়াত কবুল করেছিল?

শিক্ষক: যেমন তোমরা জানতে পেরেছো যে, নবী সাঃ থেমে যাননি; তিনি এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে এবং এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির কাছে দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন। তাদের মধ্যে মদিনার একটি দল ছিল, পরবর্তীতে যাদের নাম হয় আনসার; কেননা তারা রাসূল সাঃ-কে সহযোগিতা করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি সুয়াইদ বিন সামেত আনসারী নামক এক ব্যক্তিকে পেয়ে যান, সে হজের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাচ্ছিল এবং তাকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন। তখন সুয়াইদ বলেন: এটা তো সুন্দর কথা। তারপর সুয়াইদ মদিনায় আগমণ করেন এবং এখানেই নিহিত হন।(১)

ছাত্র: তিনি কি মুসলিম ছিলেন?

শিক্ষক: তার নিজ গোত্রের লোকেরা বলতেন যে, আমরা মনে করি যে, সে মুসলিম অবস্থায় নিহিত হয়েছে।(২)

তারপর আউস গোত্রের একদল লোক মক্কায় আগমণ করেন। তাদের আগমণের কথা নবী সাঃ শুনে তাদের নিকট এলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন ও কুরআন শুনালেন।(৩)

ছাত্র: তারা কি ইসলাম গ্রহণ করেছিল?

শিক্ষক: কথিত আছে যে, মদিনায় আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, যেখানে ইয়াস বিন মুয়ায নিহত হয়েছিল। তার কওমের লোকেরা তাকে তাহলীল তথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করতে শুনেছিল। তারা তাকে মৃত্যু অবধি তাকবীর, তাহমীদ ও তাসবীহ পাঠ করতে শুনেছিল। অর্থাৎ তিনি বলতেন: আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এটা প্রমাণ করে যে, নবী সাঃ-এর দাওয়াত

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/৬৭-৬৯।

(২) পূর্বোক্ত।

(৩) পূর্বোক্ত।

মদিনায় ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল। তারপর মদিনাবাসীদের সাথে প্রথম ও দ্বিতীয় বায়আতে আকাবা সংঘটিত হয়। এ সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা করা হবে।

প্রথম বায়আতে আকাবা:

শিক্ষক: মদিনার কিছু লোকের সাথে নবী সাঃ-এর সাক্ষাতের ঐ বছরের পরের মৌসুমে, অর্থাৎ নবুওয়তের দ্বাদশ বছরে, আওস ও খাযরাজ গোত্রের বারোজন লোক এলো। নবী সাঃ 'আকাবায় তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আকাবা হল পাহাড়ের কঠিন দুর্গম রাস্তা। এজন্য এটাকে বায়আতে আকাবা বলা হয়। তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহনের প্রস্তাব করেন। উবাদা বিন সামিত রাঃ উক্ত সাক্ষাতের বিষয়ে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: **(আমরা কোন এক বৈঠকে রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার কাছে এ বায়আত গ্রহণ কর যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবেনা এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করবেনা যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে যে তা পূর্ণ করবে, সে তার প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাবে। আর যদি কেউ উল্লিখিত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয়ে শাস্তি ভোগ করে, তবে তাই তার জন্য কাফফারা হয়ে যাবে। আর যদি কোন ব্যক্তি উল্লিখিত অপরাধের কোন একটিতে পতিত হয় অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তা গোপন রাখেন, তবে বিষয়টি মহান আল্লাহর ইখতিয়ারে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তিও দিতে পারেন।)** সহীহ মুসলিম।

ছাত্র: সুবহানাল্লাহিল আযীম, নবী সাঃ প্রতিনিধিদলকে যা বলেছিলেন তা ছিল সুন্দর গুণাবলী ও প্রশংসনীয় কর্ম। এতে কোনো ক্লান্তি বা কষ্ট নেই।

শিক্ষক: ঠিক বলেছো প্রিয় ছাত্ররা। আমাদের ধর্ম নৈতিকতা ও শিষ্টাচারের ধর্ম, এতে কোন অসুবিধা বা ঝামেলা নেই। বরং এটি সবকিছুতেই সহজ ও সুন্দর। এটি মানুষকে

নৈতিকতার শিক্ষা দেয়, ভালবাসা শেখায়, হত্যা না করতে ও চুরি না করতে শেখায়; যাতে মানুষ নিরাপত্তা ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

ছাত্র: ঐ প্রতিনিধিদল কি মদিনায় ফিরে এসেছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, তারা মদিনায় ফিরে আসে এবং নবী সাঃ তাদের সাথে মুসআব বিন উমাইর রাঃ-কে প্রেরণ করেন। তাদেরকে কুরআন এবং ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দেন। তিনি তাদের নামাজের ইমামতিও করতেন।

ছাত্র: এটা আল্লাহর দয়া যে, মদিনার লোকেরা দাওয়াত গ্রহণ করেছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আমার বাচ্চারা, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তোমরা লক্ষ্য করে দেখ যে, একটু একটু করেই স্বস্তি ও আনন্দ আসতে থাকে। এই সাহাবীদের হাতেই মদিনায় ইসলামের প্রসার শুরু হয়। এমনকি আনসারদের কোন বাড়ি ছিল না, যেখানে কমপক্ষে তিন থেকে দশজনের মতো ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেনি

দ্বিতীয় বায়আতে আকাবা:

শিক্ষক: নবুওয়ত লাভের ত্রয়োদশ বছরের পরবর্তী হজের মৌসুমে, আকাবার দ্বিতীয় বায়আত সংঘটিত হয়েছিল। সেখানে আনসারগণ মক্কায় আসার আগে সমবেত হয়েছিল এবং বলেছিল: আর কতদিন আমরা রাসূল সাঃ-কে বিতাড়িত ও শঙ্কিত অবস্থায় ফেলে রাখব? তাই তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন লোক মক্কায় সফর করে হজের মৌসুমে তার নিকট আগমণ করে। তিনি তাদেরকে আকাবায় জড়ো হতে বলেন; ফলে এক, দুজন করে সেখানে তারা নবী সাঃ-এর নিকট সমবেত হয়।

ছাত্র: উস্তাদ, আপনি বললেন তারা এক, দু'জন করে এসেছে, তারা সবাই একত্রে আসেনি কেন?

শিক্ষক: খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, মুহাম্মাদ সাঃ-এর জীবনীর ব্যাপারে তোমাদের মনোযোগ প্রশংসনীয়: একজন বা দু'জন করে আসতো, যাতে কুরাইশরা তাদের জড়ো হওয়ার বিষয়ে টের না পায়। যদি তারা সবাই দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হতো, তাহলে কুরাইশ জেনে যেতো এবং তাদেরকে একত্রিত হতে বাধা দিত। তোমরা কি হিকমতটি বুঝতে পেরেছ?

ছাত্র: এটা তো সুন্দর কাজ। এর মানে হল, আমাদেরকে সকল কাজে হিকমত অবলম্বন করতে হবে।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আমাদেরকে বিচক্ষণ হতে হবে; আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে কাজে নামতে হবে, যাতে আমরা জীবনে সফল হতে পারি। সেই সাথে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করতে হবে; কেননা তাওফীক কেবলই আল্লাহর হাতে।

ছাত্র: নবী সাঃ-এর নিকট জড়ো হয়ে তারা কী করেছিল?

শিক্ষক: তারা নবী সাঃ-কে বলেছিল: আমরা আপনার নিকট কিসের বায়আত বা অঙ্গিকার করব?

তখন নবী সাঃ বললেন: *(***তোমরা আমার নিকট এই মর্মে বায়আত করবে যে, সর্বাবস্থায় আনুগত্য করবে, স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায় দান করবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে, আল্লাহর জন্য সত্য বলবে; কোন নিন্দুকের নিন্দার তোয়াক্কা করবে না, আর আমাকে সহযোগিতা ও সমর্থন দিবে; আমি যখন তোমাদের নিকট আগমণ করবো তখন আমাকে সুরক্ষা দিবে যেমনভাবে তোমরা নিজেদের ও স্ত্রী-সন্তানদের সুরক্ষা দিয়ে থাক; বিনিময়ে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।***)* মুসনাদে আহমাদ। তারপর এ সমবেত সকলে দাঁড়িয়ে গেল এবং রাসূল সাঃ-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করলো, অর্থাৎ তিনি যা যা বলেছেন তা মেনে নিল।

ছাত্র: তার মানে বায়আত গ্রহণের অর্থ নবী সাঃ-কে সহযোগিতার জন্য একমত হওয়া।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এ বায়আত গ্রহণ নির্দেশ করে যে, আনসারগণ নবী সাঃ ও তার দ্বীনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল, তারা তার সঙ্গে ছিল এবং তিনি অচিরেই তাদের নিকট আগমণ করবেন- অর্থাৎ মদিনায় হিজরত করবেন; যেখানে তাকে সাহায্যকারী ও সমর্থনদাতা পাবেন।

তোমরা চিন্তা করে দেখ, কীভাবে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীক লাভ করলেন; দীর্ঘ তেরটি বছর এত বাধা-বিপত্তির পরও নবী সাঃ তাদের নির্যাতন ও অনিষ্টতা সহ্য করে গেছেন। একজন মুসলিমেরও উচিৎ, নবী সাঃ যেমন ধৈর্য ধরেছেন- আল্লাহর আনুগত্যে তেমন ধৈর্যশীল হওয়া।

তৃতীয় অধ্যায়:

মদিনায় হিজরত

মদিনায় হিজরত:

শিক্ষক: হিজরত দ্বারা নবী সাঃ-এর শুধু এমন ইচ্ছা ছিল না যে, তিনি যাত্রা শুরু করে মদিনায় চলে আসবেন। বরং এটা নানা প্রেক্ষাপট ও চিন্তাভাবনা এবং সম্ভাব্য হুমকি মোকাবেলার পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে ছিল। এর সাথে বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত ছিল- যেখান থেকে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষা নিতে পারি ও অনেক উপকার লাভ করতে পারি। যেমনটি এর পটভূমিকা ও পর্যায়গুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা প্রথমে হিজরতের পটভূমিকা দিয়ে শুরু করব।

ছাত্র: এর মানে, আমরা মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাঃ-এর হিজরত থেকে অনেক কিছু শিখবো?

শিক্ষক: হ্যাঁ, আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানতে পারব ইনশা আল্লাহ।

হিজরতের পটভূমিকা:

শিক্ষক: কুরাইশ কাফেরদের কাছ থেকে মক্কায় আল্লাহর রাসূল সাঃ ও তার সাহাবীরা যে কষ্ট ও দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তারপরে নবী সাঃ একদিন একটি স্বপ্ন দেখেন। আর নবীদের স্বপ্ন সত্য। তারপর তিনি সাহাবীদেরকে বললেন: **(আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মক্কা থেকে খেজুর গাছ সমৃদ্ধ এক এলাকায় হিজরত করছি। আমার মনে হলো, সেই এলাকা 'ইয়ামামা' অথবা 'হাজার' হবে। কিন্তু আসলে তা মদীনা, যার নাম ইয়াসরিব।)** সহীহ বুখারী।

ছাত্র: উস্তাদ, কয়েকটি শব্দ যার অর্থ বুঝতে পারলাম না?

শিক্ষক: ঠিক আছে, আমি ব্যাখ্যা করছি:

মদিনা তার খেজুর বাগানের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং এখনও বিখ্যাত। অনুরূপভাবে ইয়ামামা, যাকে নজদ বলা হয়। তেমনি হাজর-ও এ জন্য বিখ্যাত, যাকে আল-আহসা বলা হয়। ঐ সময় মদিনার নাম ছিল ইয়াসরিব।

যেহেতু এই তিনটি এলাকাই খেজুর গাছের জন্য বিখ্যাত, তাই নবী সাঃ ভেবেছিলেন এটি ইয়ামামা বা হাজর হবে। কিন্তু বাস্তবে এটা ছিল মদিনা, যেখানে আল্লাহর রহমতে হিজরতের ভূমিকা ও প্রস্তুতি হিসাবে আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বায়আত সংঘটিত হয়েছিল।

ছাত্র: সমস্ত মুসলমান কি আল্লাহর রাসূলের সাথে একত্রে হিজরত করেছিল, নাকি তারা আলাদাভাবে গিয়েছিল যাতে কুরাইশরা তাদের সম্পর্কে জানতে না পারে, যেমনটি আনসাররা করেছিল- যখন তারা আকাবার দ্বিতীয় বায়আতের জন্য নবী সাঃ-এর নিকট একত্র হয়েছিল?

শিক্ষক: এটা একটা চমৎকার উপলব্ধি, আমার বাচ্চারা। এটা ইঙ্গিত দেয় যে, তোমরা নবীর জীবনীর ঘটনাগুলো থেকে উপকৃত হয়েছ এবং ভাল জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছ, যা তোমাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করবে।

সাহাবীগণ ব্যক্তি ও দলগতভাবে মদিনায় হিজরত করেছেন। প্রতিবার এক, দুই বা তারচেয়ে বেশি সংখ্যায় যেতেন। মুসআব বিন উমাইর ও ইবনে উম্মে মাকতুম রাঃ গিয়েছেন, তারপর আম্মার বিন ইয়াসের, সাদ ও বিলাল রাঃ, তারপর উমর বিন খাত্তাব রাঃ বিশজন সাহাবী নিয়ে আগমণ করেন। তাছাড়া আবিসিনিয়ায় যারা ছিল তারা সবাই মদিনায় হিজরত করে চলে আসেন।

ছাত্র: উস্তাদ, মুসলমানদের মদিনায় চলে আসার খবরটি কি কুরাইশরা জানতে পেরেছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, কুরাইশরা এ বিষয়ে জানত, এবং তারা মদিনায় হিজরত করতে ইচ্ছুক মুসলমানদের বা তাদের পরিবারকে তাদের সাথে যেতে বাধা দিয়ে অসুবিধা সৃষ্টি করতে শুরু করে। যেমন উম্মে সালামা রাঃ; তারা তাকে তার স্বামী আবু সালামা রাঃ-এর সাথে যেতে বাধা দেয়। তাই তিনি স্ত্রীকে রেখে একাই চলে যান এই আশায় যে, হয়তো সে সময়মতো তার সাথে মিলিত হবে।[১]

হিজরতের প্রস্তুতি:

ছাত্র: নবী সাঃ কীভাবে হিজরত করেছিলেন?

শিক্ষক: রাসূল সাঃ-এর সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক রাঃ হিজরত করার কথা ভাবছিলেন। তিনি মদিনায় হিজরত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নবী সাঃ তাকে অপেক্ষা করতে বললেন, হয়তো আল্লাহ তাকেও মদিনায় হিজরত করার অনুমতি দেবেন। ফলে আবু বকর রাঃ নবী সাঃ-এর সাথেই মদিনায় যেতে পারবেন।

ছাত্র: তার মানে নবী সাঃ আল্লাহর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত হিজরত করেননি?

শিক্ষক: হ্যাঁ, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে অনুমতি দিয়েছেন। কেননা বিষয়টি অনেক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। আর আল্লাহই এটার উপযুক্ত সময় সম্পর্কে অবহিত। তারপর আবু বকর সিদ্দীক রাঃ দুটি বাহন প্রস্তুত করে রাখেন; একটি নবী সাঃ এর জন্য, অপরটি নিজের জন্য।

একদিন যোহরের সময় নবী সাঃ আবু বকর সিদ্দীক রাঃ-এর বাড়িতে আসেন এবং বলেন: **(আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হয়েছে। তখন আবু বকর রাঃ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য আমার মাতাপিতা কুরবান হোক! আমি কি আপনার সঙ্গী হতে পারি? রাসূল সাঃ বললেন: হ্যাঁ।)** সহীহ বুখারী।

---

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: ২/১১২-১১৩।

এটা একজন ভাল বন্ধু ও অনুগত সঙ্গী নির্বাচনের গুরুত্ব নির্দেশ করে। যেমন আবু বকর রাঃ বলেছেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা ও মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। অর্থাৎ আমি আপনার জন্য আমার মা-বাবাকে উৎসর্গ করব। অর্থাৎ, আমি আপনাকে আমার পিতা ও মাতার চেয়ে অগ্রাধিকার দিব, এমনকি যদি আপনার কারণে তাদেরকে হারাতে হয় তবুও। সুতরাং, এভাবেই আল্লাহর রাসূলের প্রতি আমাদের ভালবাসা আমাদের নিজেদের ও পরিবারের প্রতি ভালবাসার চেয়ে বেশি হতে হবে।

ছাত্র: খুব সুন্দর কথা, আমরাও আমাদের নবী সাঃ-কে আমাদের নিজেদের ও পরিবারের চেয়ে বেশি ভালবাসবো; কেননা আমরা যেন মুসলিম হই সেজন্য তিনি কতই না কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করেছেন।

শিক্ষক: যখন তিনি মদিনায় হিজরত করার সংকল্প করলেন, তখন আবু বকর রাঃ দুটি বাহন প্রস্তুত করলেন এবং নিজের সমস্ত অর্থকড়ি- পাঁচ হাজার বা ছয় হাজার দিরহাম সাথে নিলেন, যাতে তিনি সফর অবস্থায় সেগুলো আল্লাহর রাসূল সাঃ-এর খেদমতে ব্যয় করতে পারেন।

এই বিষয়টি একজন ব্যক্তি যখন ভ্রমণ করতে চায় তখন যা প্রয়োজনীয় তা প্রস্তুত করার ও তা সাথে নেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে। আবু বকর রাঃ-এর পরিবারের একজন একটি বড় ব্যাগের মতো থলে তৈরি করেছিলেন যাতে একজন ব্যক্তির প্রয়োজনীয় জিনিস রাখা যায়। আর আসমা বিনতে আবু বকর রাঃ তার কোমর বন্ধের কিছু অংশ কেটে সে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারনেই তাকে 'যাতুন নেতাক' (কোমর বন্ধ বিশিষ্ট) বলা হত।

নবী সাঃ-এর সফরে আবু বকর রাঃ-এর পরিবারের লোকদের আন্তরিকতার কথা চিন্তা করে দেখ। তারা এই দ্বীনের জন্য সব রকমের সেবা প্রদান করেছিলেন। কাজেই আমাদের অবশ্যই আবু বকর রাঃ ও তার পরিবারের উদাহরণ অনুসরণ করতে হবে

এবং এই ধর্মের জন্য আমরা যা করতে পারি তা আঞ্জাম দিতে হবে। এ জন্য আমরা কোনো কিছুতেই কমতি করবো না।

ছাত্র: নবী সাঃ-এর এই সফরের প্রস্তুতি সম্পর্কে সম্ভবত কুরাইশরা কিছু জানত না।

শিক্ষক: রাসূল সাঃ এই বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন, এবং শুধুমাত্র আবু বকর রাঃ ও তার পরিবার এ সম্পর্কে জানতেন। তারা জানতেন যে এই বিষয়টি কতটা গোপনীয়। কিন্তু কুরাইশরা যখন দেখল বিপুল সংখ্যক মুসলমান মদিনায় যাচ্ছে, তখন তারা সেখানে তাদের জমায়েত হওয়ার আশঙ্কা করলো। কেননা তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তারা মক্কায় শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবে। তারা যখন বিষয়টি অনুভব করল, তখন কুরাইশের কাফেররা এ বিষয়ে বৈঠক করে পরামর্শ করে এবং বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের মধ্যে কেউ বলল: সকাল হলে তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ, কেউ বলল: তাকে হত্যা করে ফেল, আবার কেউ বলল: তাকে দেশ থেকে বের করে দাও। কিন্তু কুরাইশরা কী পরিকল্পনা করছে তা মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে জানিয়ে দেন। ফলে নবী সাঃ জানতে পারেন যে তারা তার সাথে কী করতে চায়।

ছাত্র: এটা ভয়ঙ্কর বিষয় যে, তারা আল্লাহর রাসূল সাঃ এর সাথে খারাবী করছে। কুরাইশদের এ বিষয়টি জানতে পেরে নবী সাঃ কী করেছিলেন?

শিক্ষক: হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণের সময় নবী সাঃ যখন এটি জানতে পারলেন, তখন তিনি আলী বিন আবি তালিব রাঃ-এর সাথে একমত হলেন; তাই তিনি রাসূল সাঃ-এর বিছানায় রাত কাটালেন।

ছাত্র: আলী রাঃ কেন রাসূল সাঃ-এর বিছানায় রাত কাটালেন?

শিক্ষক: কারণ নবী সাঃ আবু বকর সিদ্দিক রাঃ-এর সাথে সাওর গুহায় গিয়েছিলেন। তখন আলী রাঃ রাসূল সাঃ-এর জায়গায় ঘুমিয়েছিলেন, যাতে তারা মনে করে যে নবী সাঃ তার ঘরেই ঘুমাচ্ছেন, ফলে তারা তাকে খুঁজবে না এবং তিনি গুহায় পৌঁছে যাবেন।

ছাত্র: কঠিন পরিকল্পনা উস্তাদ।

শিক্ষক: হ্যাঁ, একটি দৃঢ় চিন্তা ও পরিকল্পনা যা নানা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার গুরুত্ব তুলে ধরে। এটি নবী সাঃ-এর প্রতি আলী রাঃ-এর ভালবাসার পরিমাণও প্রকাশ করে। কারণ তিনি তার জায়গায় ঘুমিয়েছিলেন যখন তার উপর কুরাইশদের পক্ষ থেকে হুমকি ছিল।

ছাত্র: মহান আল্লাহ আলী বিন আবি তালিব রাঃ-এর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। তিনি সাহসী ছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসতেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আলী বিন আবি তালিব রাঃ সারা জীবন সাহসী, শক্তিশালী এবং রাসূল সাঃ-এর প্রতি মহব্বত পোষণকারী ছিলেন এবং তিনি ছিলেন তার চাচাতো ভাই।

ছাত্র: উস্তাদ, তারপর কী হল?

শিক্ষক: কুরাইশের কাফেররা আলীকে রাসূল সাঃ ভেবে সারারাত পাহারা দেয়। সকাল হলেই তারা তার উপর আক্রমণ করে। আলী রাঃ-কে দেখে তারা বলল: তোমার বন্ধু কোথায়? তিনি বললেন: আমি জানি না। এভাবে আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।[১]

তোমরা মাধ্যম/উপকরণ গ্রহণের গুরুত্ব বিবেচনা করে দেখ, যেমনটি নবী সাঃ আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখার পাশাপাশি তা গ্রহণ করেছিলেন। তাই আমাদেরকেও অবশ্যই আমাদের সমস্ত বিষয়ে উপকরণ গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার সাথে সাথে সেগুলির জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে।

ছাত্র: উস্তাদ, খুব সুন্দর তথ্য ও পরামর্শ। এ পরিস্থিতি হবার পর কুরাইশরা কী করেছিল?

---

(১) মুসনাদে আহমাদ: (১/৩৪৮)।

শিক্ষক: এর পরে, কুরাইশরা নবী সাঃ-এর সন্ধান করতে শুরু করে। ফলে তারা নবী সাঃ-এ পদচিহ্নকে চিহ্নিত করতে থাকে, অর্থাৎ মাটিতে নবী সাঃ-এর পায়ের ছাপ চিহ্নিত করছিল। কারণ, প্রাচীনকালে আরবরা এই বিষয়ে খুব গুরুত্বারোপ করতো এবং তারা একে অপরকে শেখাতো কীভাবে পদচিহ্ন সন্ধান করতে হয়।

এভাবে কুরাইশের লোকজন পদচিহ্ন অনুসরণ করে হাঁটতে থাকে, অবশেষে তারা সাওর পাহাড়ে পৌঁছে যায়, আর সেখান থেকে রাসূল সাঃ-এর পদচিহ্ন তাদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। ফলে তারা জানতে পারেনি তিনি কোথায় গিয়েছেন। যখন তারা সাওর পর্বতের গুহার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, তারা গুহার প্রবেশমুখে একটি মাকড়সার জাল দেখতে পেল এবং বলল, "সে যদি এখানে প্রবেশ করত তবে মাকড়সার জাল এর মুখে থাকত না।" তারপর রাসূল সাঃ ঐ গর্তে ভিতরে তিনদিন অবস্থান করেন।

ছাত্র: উস্তাদ, এখানে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে; প্রথমত: তিনি কেন তিনদিন সেখানে অবস্থান করেছিলেন?

শিক্ষক: যাতে তারা তাকে খুঁজে না পেয়ে হতাশ হয় এবং মক্কা ও এর আশপাশ এলাকায় তাকে অনুসন্ধান করা বাদ দেয়; ফলে তিনি সহজেই মদিনায় চলে যেতে পারবেন।

ছাত্র: চমৎকার চিন্তা। সাওর গুহা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এটি কি হেরা গুহা ছাড়া অন্য কোন গুহা?

শিক্ষক: হ্যাঁ, হেরা গুহাটি মক্কার প্রায় পূর্ব দিকে এবং সাওর পর্বতটি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, যা মদিনার বিপরীত দিকে। কারণ, এটি মক্কার প্রায় উত্তর দিকে অবস্থিত।

ছাত্র: এটাও আরেক দুর্দান্ত ধারণা। কিন্তু তাদের গুহার পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাঃ কি তাদের আওয়াজ টের পেয়েছিলেন?

শিক্ষক: হ্যাঁ, তিনি তাদের কণ্ঠস্বর শুনেছেন এবং তাদের পা দেখেছেন, যেমনটি অচিরেই তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ।

সাওর গুহার পরিস্থিতি:

শিক্ষক: আবু বকর রাঃ বলেন: **(আমি রাসূলুল্লাহ্ সাঃ-এর সঙ্গে গুহায় ছিলাম। আমি আমার মাথা উঠিয়ে উপরের দিকে তাকালাম এবং লোকজনের পা দেখতে পেলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! তাদের কেউ নীচের দিকে তাকালেই আমাদের দেখে ফেলবে। রাসূল সাঃ বললেন, হে আবু বকর! চুপ থাক। আমরা দু'জন আল্লাহ্ যাদের তৃতীয়জন।)**[১] ঐ পরিস্থিতি খুবই নাজুক ছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথেই ছিলেন; তিনিই সেই যে মাকড়সাকে এত দ্রুত ঘর তৈরি করিয়েছিলেন এবং তিনিই কুরাইশ কাফেরদেরকে তাদের পায়ের দিকে তাকাতে দেননি, যাতে তারা নবী সাঃ ও তার সাথীকে দেখতে না পায়। তিনিই সেই জায়গায় তাদের দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব ঢেকে রেখেছেন। কিন্তু আল্লাহর সংসর্গের বিষয়ে রাসূল সাঃ-এর বিশ্বাস এবং তাদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ যত্ন- আবু বকর সিদ্দিক রাঃ-কে আশ্বস্ত করেছিল। সুতরাং এটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে তৃতীয়জন, সুরক্ষা ও সাহায্য দানের মাধ্যমে। উক্ত অবস্থার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেন:

﴿إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدۡ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذۡ أَخۡرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثۡنَيۡنِ إِذۡ هُمَا فِي ٱلۡغَارِ إِذۡ يَقُولُ لِصَٰحِبِهِۦ لَا تَحۡزَنۡ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَاۖ﴾ [التوبة: ٤٠]

অর্থ: [যদি তোমরা তাকে সাহায্য না কর, তবে আল্লাহ তো তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফেররা তাকে বহিস্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন

(১) সহীহ বুখারী: (৪৯২২)।

তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল; তিনি তখন তার সঙ্গীকে বলেছিলেন, বিষন্ন হয়ো না, আল্লাহ তো আমাদের সাথে আছেন।] সূরা আত-তাওবা: ৪০।

ছাত্র: এই অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর প্রশংসা, যা দিয়ে তিনি তাঁর নবী ও তার সঙ্গীকে রক্ষা করেছেন এবং তাদেরকে প্রশান্তি দান করেছেন। এটি একটি মহান অবস্থান, কিন্তু তারা গুহায় তিন দিন বেঁচে থাকলেন কীভাবে? তাদের সাথে কি তিন দিনের জন্য পর্যাপ্ত খাবার ও পানি ছিল?

শিক্ষক: সুন্দর প্রশ্ন প্রিয় ছাত্ররা। রাসূল সাঃ গুহায় যাওয়ার পূর্বে এর জন্য একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। তারা দু'জনে আবদুল্লাহ ইবনে আবি বকর সিদ্দিক রাঃ-এর সাথে একমত হয়েছিল যে, সে রাতের অন্ধকারে তাদের কাছে আসবে ও তাদের সাথেই রাত কাটাবে এবং রাতের শেষাংশে মক্কায় ফিরে যাবে। আর সকাল হলে লোকদের সাথে মিশে কুরাইশরা কি বলছে ও তারা কি পরিকল্পনা করছে তা শুনবে। সে সময় সে ছিল বয়সে তরুণ যুবক, কিন্তু বুদ্ধিমান ও সচেতন ছিল। তারপর সে রাতে এসে নবী করীম সাঃ-কে কুরাইশরা তার ব্যাপারে যা বলাবলি করতো তা জানাতো।[১]

আমের বিন ফুহায়রা, যে আবু বকর সিদ্দিক রাঃ-এর গোলাম ছিল, সে রাতের বেলায় ভেড়া নিয়ে তাদের কাছে আসতো এবং তারা দুধ পান করতেন, তারপর রাতের শেষে সে মক্কায় ফিরে যেতেন। এতে করে ভেড়া আবদুল্লাহ বিন আবু বকরের হাঁটাচলা ও পদক্ষেপের চিহ্ন মুছে ফেলতো, যাতে কুরাইশরা জানতে না পারে যে, সে গুহায় যাতায়াত করছে, যাতে তারা নবী সাঃ-এর অবস্থান সম্পর্কে জানতে না পারে।

ছাত্র: খুব শক্তিশালী ও চমৎকার পরিকল্পনা ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটি একটি শক্তিশালী ও বিস্ময়কর পরিকল্পনা ছিল, যার মাধ্যমে তারা খবর জানতে পেরেছেন, খাদ্য প্রাপ্ত হয়েছেন এবং গুহায় তাদের উপস্থিতির যেকোন

(১)

চিহ্ন মুছে দিয়েছেন। অতএব, আমাদেরকেও অবশ্যই পরিকল্পনা করতে হবে যখন আমরা আমাদের লক্ষ্য ও আকাঙ্খা অর্জন করতে চাই, সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়ে। আমাদেরকে অবশ্যই আমাদের পাঠ, আমাদের সাফল্য ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে যাতে আমরা মানবজাতির জন্য সর্বকালের সেরা জাতি হতে পারি, যারা সৎকাজের নির্দেশ করবে এবং অসৎকাজে নিষেধ করবে।

ছাত্র: রাসূলুল্লাহ সাঃ ও তার সঙ্গী আবু বকর সিদ্দিক রাঃ যে তিন রাত অবস্থান করেছিলেন, তার পর তারা কী করলেন?

গুহা থেকে উপকূলীয় রাস্তায় গমণ:

শিক্ষক: তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর তারা গুহা থেকে বের হয়ে গেলেন। গুহায় যাওয়ার পূর্বে নবী সাঃ ও আবু বকর সিদ্দিক রাঃ তাদের মদিনায় যাওয়ার জন্য একজন দক্ষ লোক নিয়োগ করেছিলেন। লোকটি কুরাইশ কাফেরদের ধর্ম অনুসরণ করতো। তারা গুহায় যাওয়ার আগে তাকে তাদের উট দিয়েছিল এবং তারা তাকে তিন রাত পর অর্থাৎ তৃতীয় দিনের সকালে সাওরের গুহায় যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তার নাম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকাত। সে-ই তাদেরকে উপকূলীয় সড়কে নিয়ে যায় এবং আমের ইবনে ফুহায়রা তাদের সাথে ছিল।

ছাত্র: কিন্তু উপকূলীয় সড়ক মানে কী?

শিক্ষক: প্রথমত: উপকূলীয় রাস্তা মানে সমুদ্রের পাশের রাস্তা। দ্বিতীয়ত: আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে, সাওর গুহা মক্কার দক্ষিণে এবং মদিনা ছিল ঠিক বিপরীত দিকে, অর্থাৎ এটি মক্কার উত্তরে ছিল। এতে হিকমত রয়েছে, যাতে কুরাইশরা সন্দেহ করতে না পারে যে, 'নবী সাঃ ঐ দিকে ঐ জায়গায় আছে এবং মক্কার উত্তর দিকে গিয়ে তার লুকিয়ে থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।' আর শত্রু যা ভাবে বা চিন্তা করে তার বিপরীত চিন্তা করা একটি চমৎকার পরিকল্পনা। তারপর তারা লোহিত

সাগরের দিকে চলে গেলেন, যাতে মুশরিকদের কেউ টের না পায়। তারপর তারা মদিনার দিকে রওনা হলেন।

ছাত্র: এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর চিন্তা এবং এটা আল্লাহর তাওফীকেই হয়েছে।

শিক্ষক: ঠিক বলেছো স্নেহের ছাত্ররা, এটা সঠিক পরিকল্পনার পাশাপাশি আল্লাহর তাওফীকেই সম্ভব হয়েছে। এভাবে আমাদেরকেও অবশ্যই আমাদের বিষয়গুলি সম্পর্কে গভীরভাবে ও সঠিকভাবে চিন্তা করতে হবে, যাতে আমরা অনুশোচনায় না ভূগি। তারপরে আল্লাহর নিকট সাহায্য চেয়ে আমাদেরকে প্রতিটি ভুল থেকে দূরে থাকতে হবে।

তবে স্নেহের ছাত্ররা, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যা তোমাদের অবশ্যই জানা উচিত। তা হল: আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাঃ-কে এসব অসুবিধার সম্মুখীন না হতে দিতে সক্ষম; তিনি চাইলে তাকে চোখের পলকে কিছুক্ষণের মধ্যে মদিনায় নিয়ে আসতে পারেন, যেমন তাকে আল-আকসা মসজিদে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নবী সাঃ-এর রিসালাত হল জ্ঞান এবং আমাদের জীবনের সকল বিষয়ে আমাদের জন্য মানহাজ। আর তাই মানুষ যেসব ক্লান্তি, কষ্ট ও শত্রুর ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের সম্মুখীন হতে পারে এমন সমস্ত বিষয়ে নবী সাঃ জর্জরিত হয়েছিলেন। যাতে আমরা সব পরিস্থিতিতে তাকে অনুকরণ করতে পারি।

ছাত্র: ঠিক বলেছেন উস্তাদ, তাকে যদি মদিনায় উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো, তাহলে আমরা তার জীবন থেকে এসব ফায়দা ও শিক্ষা পেতাম না। আল্লাহ এটিকে আমাদের জন্য একটি হুজ্জত, পথ ও পদ্ধতি বানিয়েছেন যা অনুসরণ করে আমরা চলবো।

একটি পাথরের ছায়ায়:

শিক্ষক: অতঃপর বরকতময় এ কাফেলাটি সারারাত চলে পরদিন দুপুর পর্যন্ত চললো, তখন রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এমতবস্থায় তারা একটি ছায়াযুক্ত বড় পাথর দেখতে পেয়ে সেখানে থামল।

এদিকে আবু বকর রাঃ উঠে দাঁড়ালেন এবং সেই বড় পাথরের ছায়ায় নবী সাঃ-এর ঘুমানোর জন্য স্বহস্তে একটি জায়গা তৈরি করলেন এবং তার উপর ভেড়ার পশমযুক্ত একটি চামড়ার বিছানা পেতে দিলেন। তারপর আবু বকর রাঃ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য পাহারায় নিযুক্ত রইলাম। রাসূল সাঃ শুয়ে পড়লেন। আর তিনি চারপাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

কাজেই তোমরা নবী সাঃ-এর প্রতি আবু বকর রাঃ-এর যত্ন ও তার জন্য তার উদ্বেগ বিবেচনা করে দেখ; তিনি জায়গাটি পরিষ্কার করলেন, পরিপাটি করলেন, তার জন্য চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিলেন এবং স্থানটি তদারকি করতে লাগলেন।

ছাত্র: উস্তাদ, আমি এ থেকে বুঝতে পারলাম যে, আবু বকর রাঃ একজন অনুগত সাহাবী ছিলেন এবং তিনি তার নবীকে খুব ভালোবাসতেন ও সম্মান করতেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আবু বকর রাঃ এমনি মহব্বত পোষণকারী ও অনুগত সাহাবী ছিলেন। নবী সাঃ-এর প্রতি এমনি আচরণ হওয়া উচিত, যার মাধ্যমে এবং তাকে অনুসরণ করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করব, ইনশা আল্লাহ। কাজেই আমাদেরকে অবশ্যই তার সুন্নাহকে ভালবাসতে হবে এবং এটাকে গুরুত্ব দিতে হবে যেমন আবু বকর রাঃ করেছেন।

ছাত্র: তারপর কী ঘটেছিল?

শিক্ষক: আবু বকর রাঃ উক্ত পাথরের চারপাশে পায়চারি করে এদিক সেদিক নজর রাখছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন, একজন মেষ রাখাল তার মেষপাল নিয়ে পাথরটির দিকে ছুটে আসছে। সেও এ পাথরের ছায়ায় আশ্রয় নিতে চায়। তিনি তাকে বললেন,

তোমার মেষপালে কি দুগ্ধবতী মেষ আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, তুমি কি আমাকে দোহন করে দিবে? সে বলল, হ্যাঁ। তারপর আবু বকর রাঃ তাকে বললেন, এর স্তন থেকে ময়লা ও পশম পরিষ্কার করে নাও। তারপর সে একটি কাঠের পাত্রে দুধ দোহন করে দিল।

অতঃপর আবু বকর রাঃ বলেন, আমি নবী সাঃ-কে দুধ পান করাতে এসেছি এবং তাকে ঘুম থেকে জাগানো সমীচিন মনে করছিলাম না, কিন্তু দেখলাম তিনি ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন। রাসূল সাঃ তা থেকে পান করলেন। তারপর বললেন: যাত্রা শুরু করার সময় হয়নি? আবু বকর রাঃ বললেন, হ্যাঁ। ফলে তারা সেখান থেকে আবার মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

ছাত্র: চমৎকার পরিবেশ।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আল্লাহর তাওফীকে পরিবেশটি চমৎকার ছিল। কেননা আল্লাহেই তাদের জন্য এই রাখালকে প্রস্তুত করেছিলেন যে তার মেষগুলো তাদের কাছে নিয়ে এসেছিল। তারপর নবী সাঃ দুধ দোহনের পর উপযুক্ত সময়ে ঘুম থেকে উঠেছিলেন এবং আবু বকর রাঃ তা নবীজীর কাছে নিয়ে এলেন।

তারপর আবু বকর সিদ্দিক রাঃ কর্তৃক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি যত্নের কথা বিবেচনা করে দেখ; তিনি নবী সাঃ-কে যে দুধ সরবরাহ করবেন তার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তিনি কতটা আগ্রহী ছিলেন! তিনি রাখালকে বললেন: চুল ও ময়লা ঝেড়ে ফেলে দাও; যাতে নবীজি সাঃ খাঁটি দুধ পান করতে পারেন এবং পান করার সময় কোন কিছুতে যেন বিরক্তবোধ না করেন।

এটি আমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব ও যত্ন নেওয়ার বিষয়টিও নির্দেশ করে। যখন আমাদের কাছে কিছু চাওয়া হবে, তখন আমরা সেটার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে যত্ন নিব, এমনকি আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়েও আমরা সেই যত্নবান হবো। কারণ, পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ, যেমনটি আমাদের নবী মুহাম্মদ সাঃ বলেছেন। তাই আমাদের ধর্ম পরিচ্ছন্নতার ধর্ম এবং এটি আমাদেরকে তা করার নির্দেশ দেয়।

ছাত্র: আমি আবু বকর সিদ্দিক রাঃ-এর প্রতি গভীর ভালবাসা অনুভব করছি। কারণ তিনি আমাদের নবীর প্রতি আন্তরিক ও যত্নবান ছিলেন।

শিক্ষক: এ অনুভূতি খুবই চমৎকার স্নেহের ছেলেরা। আমাদের অবশ্যই আবু বকর সিদ্দিক রাঃ-কে ভালোবাসতে হবে। কারণ তিনি এমন ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্য। বরং তিনি নবী সাঃ-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন।

ছাত্র: উস্তাদ, তারপরে কি কাফেলা চলে গিয়েছিল? আর কী ঘটেছিল এবং তারা কী করেছিল?

সুরাকা বিন মালেক নবী সাঃ-কে খুঁজছে:

শিক্ষক: রাস্তায় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে; তা হল: কুরাইশ কাফেরদের পক্ষ থেকে সুরাকা বিন মালেক নামক এক ব্যক্তি তাদের পিছু ধাওয়া করে। আবু বকর রাঃ বললেন: 'আমাদেরকে তো ধরে ফেলা হলো'! তখন রাসূল সাঃ বললেন: 'চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' তারপর রাসূল সাঃ তার উপর বদ-দোয়া করলেন। এতে তার ঘোড়া পেট পর্যন্ত জমিনে ধ্বসে গেল![১] অর্থাৎ ঘোড়ার পা'গুলো সম্পূর্ণ মাটিতে ঢুকে যায়, ফলে শুধু এর পেট ও পিঠ মাটির উপরে ছিল। বস্তুত কুরাইশরা নবী সাঃ-এর খুঁজে তাকে পাঠিয়েছিল।

এখানে তোমরা চিন্তা করে দেখ, নবী সাঃ কীভাবে ঐ পরিস্থিতি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে সামাল দিলেন। তারপর ভেবে দেখ নবী সাঃ-এর দোয়ার প্রভাব কেমন

(১) সহীহ মুসলিম: (২০০৯)।

ছিল এবং কীভাবে আল্লাহ তায়ালা দ্রুততার সাথে তার দোয়া কবুল করলেন ও জমিনকে ঘোড়ার পায়ের জন্য নরম করে দিলেন, ফলে তা মাটিতে ধ্বসে যায়!

ছাত্র: আল্লাহর শপথ! দোয়া কবুলের মধ্যে বিশাল ব্যাপার ছিল?

শিক্ষক: মানুষ যত আল্লাহর আনুগত হবে ততই তিনি তার দোয়া কবুল করবেন। তবে বান্দার দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে আল্লাহর হিকমত রয়েছে; তিনি কখনো দ্রুত তার দোয়ায় সাড়া দেন, কখনো তা বিলম্ব করেন, কখনো এর কারণে তার উপর থেকে অনিষ্ট দূর করে দেন, আবার কখনো তার চাওয়া ও প্রত্যাশার চেয়ে অধিক কল্যাণকর কিছু তাকে দান করেন। কেননা কোনটি আমাদের জন্য উত্তম ও অধিক কল্যাণকর তা আমাদের চেয়ে আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি বলেছেন:

﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: ٦٢]

অর্থ: [বরং তিনি, যিনি নিরুপায়ের আহবানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে কি অন্য কোন ইলাহ আছে? তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাক।] সূরা আন-নামল: ৬২।

ছাত্র: উস্তাদ, এগুলো খুবই উপকারী তথ্য যা আমরা জানতে পারলাম। উস্তাদ, ঐ অবস্থায় সুরাকা কী করেছিল? নিশ্চয় সে ঘাবড়ে গিয়েছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, এতে সুরাকা বিন মালেক ভয় পেয়ে যায় এবং বলে: আমি জানি, তোমরা দুজনে আমার বিরুদ্ধে বদ-দোয়া করেছ। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তো তোমাদের সন্ধানে বের হয়েছিলাম, এখন আমি তোমাদের সন্ধানকারীকে ফিরিয়ে দিব। সুতরাং তোমরা আমার জন্য দোয়া করো। অর্থাৎ তোমরা যদি আমার

জন্য দোয়া করে এ অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করো, তাহলে যারা তোমাদেরকে খুঁজতে আসবে তাদেরকে আমি ফিরিয়ে দিব।

এখানে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, কিভাবে নবী সাঃ-কে রক্ষা করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য মু'জিযা প্রকাশ করলেন এবং জমিনকে এতটা নরম করে দিলেন যে সুরাকার ঘোড়ার পা তাতে ঢুকে যায়! বস্তুত আল্লাহ চাইলে সবকিছুই তাঁর বাহিনীতে পরিণত হয়।

ছাত্র: সুরাকা কি তার কথা রেখেছিল, সে অনুযায়ী মানুষকে নবী সাঃ থেকে ফিরিয়েছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, সে প্রতিশ্রুতি পরায়ণ ব্যক্তি ছিল। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর যে ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হয়েছিল তাতে প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে তার উপায় ছিল না। ফলে সে যাকেই পেত তাকেই ফিরিয়ে দিত এবং তাদেরকে বলতো: তোমাদের জন্য এদিকে আমিই যথেষ্ট। অর্থাৎ এদিকে আমি সব দেখে এসেছি, এদিকে কেউ নেই।[১]

ছাত্র: সম্মানিত উস্তাদ, তারপর কী ঘটেছিল? এই সফরটি তো ঘটনাবহুল ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এই সফরটি বিভিন্ন শিক্ষা, উপদেশ ও উপকারিতায় পরিপূর্ণ ছিল। এগুলো নিয়ে আমাদের সুন্দরভাবে চিন্তা করা উচিত।

উম্মে মা'বাদের তাঁবু:

মদিনা যাওয়ার পথে নবী সাঃ ও তার সফরসঙ্গী আবু বকর সিদ্দিক রাঃ উম্মে মা'বাদ খুজায়ীর তাঁবুর পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তারা উম্মে মা'বাদের নিকট গোশত ও রুটি কিনতে চাইলেন। কিন্তু তার নিকট কিছুই পেলেন না। সেখানে রাসূল সাঃ একটি বকরী দেখতে পেয়ে বললেন: হে উম্মে মা'বাদ, এ বকরীর কী অবস্থা? সে

(১) সহীহ মুসলিম: (২০০৯)।

বলল: এটা এতই দুর্বল যে, দলের বকরীগুলোর সাথে যাওয়ার মতো ক্ষমতা নেই। তাই এটা ছাগলের পাল থেকে পেছনে রয়ে গেছে। তখন রাসূল সাঃ বললেন: এর ওলানে কি দুধ আছে? সে বলল: এটা নিজেই বিপদগ্রস্তা; অতএব দুধ দেবে কিভাবে?, অর্থাৎ তাতে দুধ নেই। নবী সাঃ বললেন, আমি দুধ দোহন করতে চাই, তুমি কি আমাকে অনুমতি দিবে? সে বলল: আপনার জন্য আমার বাবা মা কুরবান হোক! আপনি যদি মনে করেন যে, তাতে দুধ আছে তাহলে তা দোহন করুন। অতঃপর রাসূল সাঃ বকরীটি নিয়ে আসতে বললেন, তারপর বিসমিল্লাহ বলে এটার ওলানে হাত বুলিয়ে দিলেন এবং উম্মে মা'বাদের জন্য এই বকরীতে বরকত চেয়ে দোয়া করলেন। এতে ওলানে দুধ চলে আসে; তিনি একটি পেয়ালা আনতে বললেন, তাতে স্বহস্তে দুধ দোহন করলেন। তারপর তা থেকে তিনি উম্মে মা'বাদকে তৃপ্তি সহ দুধ পান করালেন, তারপর নিজ সাহাবীদেরকে পান করালেন, তারাও পরিতৃপ্ত হলো; সবার শেষে নবী সাঃ নিজে পান করলেন।

ছাত্র: উস্তাদ, আল্লাহর কসম, ঐ ঘটনাটি খুব চমৎকার ও বিস্ময়কর ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এই ঘটনায় বিশাল মু'জেযা ছিল। কেননা বকরীটি ছিল দুর্বল জীর্ণশীর্ণ, ওলানে দুধ ছিল না; রাসূল সাঃ বিসমিল্লাহ বলে ওলানে হাত বুলিয়ে দেন এবং উম্মে মা'বাদের এ বকরীর জন্য দোয়া করেন, ফলে আশ্চর্যজনকভাবে তাতে দ্রুত দুধ চলে আসে এবং শুকনো ওলানে দুধে পরিপূর্ণ হয়ে যায়! নিঃসন্দেহে এটা এক মু'জেযা যা আল্লাহই তাঁর নবীর জন্য প্রকাশ করেছেন।[১]

তারপর চিন্তা করে দেখ, রাসূল সাঃ কতটা ভদ্র ও উত্তম আচরণের অধিকারী ছিলেন! তিনি ঐ মহিলার নিকট অনুমতি চেয়ে কাজগুলো করেছিলেন, অনুমতি না নিয়ে তিনি হাত বাড়াননি।

---

(১) মুস্তাদরাক হাকেম: (৩/৯-১০)।

ছাত্র: আল্লাহ্‌র কসম, এটা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক মহান উদারতা ও অলৌকিক বিষয়। আমরা নবী সাঃ-এর কাছ থেকে উচ্চ শিষ্টাচার শিখেছি। আমরা অনুমতি না চাওয়া পর্যন্ত আমাদের মালিকানা নেই এমন কিছুর দিকে হাত প্রসারিত করব না, যদিও সেই জিনিসটি সহজলভ্য হয়।

শিক্ষক: তারপর নবী সাঃ-এর উদারতা দেখ; বকরীর দুধ দোহন করার পর তিনি নিজে আগে পান করেননি, অথচ তিনি তাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত ছিলেন। বরং প্রথমে বকরীর মালিক মহিলাকে পান করালেন, সে পরিতৃপ্ত হলো। তারপর সঙ্গীদেরকে পান করালেন, সবার শেষে নিজে পান করলেন।

ছাত্র: প্রকৃতপক্ষে, এটি আমাদের শেখায় কীভাবে অন্যদের সাথে সদাচরণ করতে হয় এবং কীভাবে মানুষকে তাদের অধিকার অনুযায়ী অগ্রাধিকার দিতে হয়।

শিক্ষক: বরং এটিও তার উদারতার অংশ ছিল যে, তিনি পান করার পর হাতে নিয়ে এটি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দুধ দোহন করেন, তারপর দুধ ভর্তি পাত্রটি উম্মে মা'বাদকে দেন। অতঃপর উম্মে মা'বাদ ইসলামের বায়আত গ্রহণ করার পর নবী সাঃ সেখান থেকে চলে যান।

ছাত্র: তার মানে উম্মে মা'বাদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?

শিক্ষক: হ্যাঁ, তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন; যখন নবী সাঃ-এর সাথে তার সাক্ষাত হল এবং তিনি তার কাছ থেকে সামনাসামনি ঘটে যাওয়া সমস্ত অলৌকিক ঘটনা দেখলেন। তার নৈতিকতা, ভাল ব্যবহার, মার্জিত আচরণ ও সুন্দর স্বভাব দেখে অবশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

ছাত্র: ঠিক, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর নৈতিকতা নির্দেশ করে যে, তিনি একজন মহান নবী।

শিক্ষক: নবী সাঃ চলে যাওয়ার পর তার স্বামী আবু মা'বাদ এলেন। দুধ দেখে তিনি অবাক হলেন। তার স্ত্রীকে এই দুধ এবং দুধবিহীন বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর উম্মে মা'বাদ তাকে সব খুলে বলেন। আবূ মাবাদ বললেন: আল্লাহর কসম, ইনিই কুরাইশদের টার্গেট। অতঃপর তিনি বললেন: 'আমি তাকে সঙ্গ দেবার ইচ্ছা করেছিলাম এবং যদি আমি কোন উপায় পাই তাহলে তা করব।' আবু মা'বাদের এ কথার অর্থ হল: কুরাইশরা নবী সাঃ-কে খুঁজছে- এই খবরটি চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেছে, এমনকি তা এখানেও পৌঁছেছে! কিন্তু আল্লাহই তো তাঁর নবীর হেফাযতকারী।

ছাত্র: হে আমাদের মাননীয় উস্তাদ, আমি ও বাকি ছাত্ররা লক্ষ্য করছি যে, নবী সাঃ-এর হিজরতের ঘটনাগুলো আমাদেরকে আকৃষ্ট করেছে এবং সেগুলো জানতে আগ্রহী করে তুলেছে।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটি নানা ঘটনা ও সংকটে পরিপূর্ণ একটি হিজরত, তবে এটি নানা শিক্ষা ও উপদেশেও পরিপূর্ণ।

ইসলম গ্রহণকারী রাখাল:

শিক্ষক: নবী সাঃ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় একজন মেষপালককে তার ভেড়ার সাথে দেখতে পেলেন। তিনি তার কাছে দুধ চেয়েছিলেন। কিন্তু রাখাল অপারগতা প্রকাশ করল, কারণ তার ভেড়ার মধ্যে দুধ দেওয়ার মতো কোন ভেড়া ছিল না। তবে একটি ব্যতীত, সেটারও দুধ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, এটাকে নিয়ে আস। অতঃপর তিনি ওলানে হাত বুলালেন ও দোয়া করতে লাগলেন। অবশেষে তাতে দুধ চলে আসে; তখন তারা পান করল। রাখাল বলল: আল্লাহর কসম, আপনি কে? আপনার মত আগে কখনো কাউকে দেখিনি। নবী সাঃ বললেন: তুমি কি গোপন রাখতে পারবে যদি আমি তোমাকে আমার সম্পর্কে খবর দিই? সে বলল: হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমি মুহাম্মাদ, আল্লাহর রাসূল। তখন রাখাল বলল, আপনিই কি সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে কুরাইশরা

‘সাবেয়ী বা নতুন ধর্মাবলম্বী’ বলে? মানে তার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগকারী বলে। রাখাল লোকটি এও বলল: ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি একজন নবী এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যা নিয়ে এসেছেন তা সত্য। আর আপনি যা করেছেন তা একজন নবী ছাড়া কেউ করতে পারে না।’

ছাত্র: চমৎকার, সেও উম্মে মা’বাদ রাঃ-এর ন্যায় ইসলাম গ্রহণ করেছে!

শিক্ষক: হ্যাঁ, খুবই চমৎকার বিষয়, তিনি তো বরকতময় নবী; যেখানেই যান সেখানেই কল্যাণ আগমণ করে। প্রথম কল্যাণ হল তাদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়া যা জান্নাতের প্রবেশ পথ ও জাহান্নাম থেকে উদ্ধারকারী। তারপর তো নবী সাঃ-এর দোয়ার বরকতে তাদের বকরীর সাথে যা ঘটেছে।

ছাত্র: আমি লক্ষ্য করেছি যে, নবী সাঃ শুধুমাত্র বকরীর ওলানে হাত দিতেন না, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে দোয়াও করতেন- যা নির্দেশ করে যে, আমাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য দোয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষক: এ কথাগুলো তো সেই ছাত্রদের কাছ থেকে সুন্দর কথা যারা তাদের রসূলকে ভালোবাসে এবং তার জীবনীকে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অনুসরণ করে। মহান আল্লাহ তোমাদেরকে রক্ষা করুন ও হেফাযত করুন।

পথিমধ্যে পোষাক উপহার লাভ:

ছাত্র: উস্তাদ, এরপরে কী ঘটেছিল?

শিক্ষক: পথিমধ্যে যুবায়ের রাঃ-এর সঙ্গে নবী সাঃ-এর সাক্ষাত হয়। তিনি মুসলিমদের একটি বানিজ্যিক কাফেলার সাথে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। তখন জুবায়ের রাঃ রাসূল সাঃ ও আবু বকর রাঃ-কে সাদা রঙের পোশাক দান করলেন।[১] বস্তুত এটা নবী সাঃ-

(১) সহীহ বুখারী: (৩৯০৬)

এর প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ, যাতে তিনি নতুন সাদা পোশাক পরে মদিনায় প্রবেশ করতে পারেন।

ছাত্র: তাহলে সম্ভবত নবী সাঃ ও তার সঙ্গী মদিনার কাছাকাছি চলে এসেছিলেন?

শিক্ষক: হ্যাঁ, নবী করীম সাঃ-এর আগমণ উপলক্ষে মদিনাবাসীর প্রস্তুতি ছিল দারুণ ও বিশাল।

মদিনায় প্রবেশ এবং বর্ণাঢ্য অভ্যর্থনা:

শিক্ষক: এদিকে মদিনায় মুসলিমদের নিকট নবী সাঃ মক্কা থেকে মদিনার পথে রওয়ানা হয়েছেন মর্মে খবর পৌঁছে যায়। তারা অত্যন্ত আনন্দে উল্লাসিত হয়; তাই তারা প্রত্যহ সকালে মদিনার বাইরে হার্‌রায় গিয়ে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। দুপুরে রোদ প্রখর হলে তারা ঘরে ফিরে আসতো। একদিন তারা পূর্বাপেক্ষা অধিক সময় অপেক্ষা করার পর নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেল। এমন সময় একজন ইহুদী লোক নবী সাঃ-কে সাথী সঙ্গীদের নিয়ে মদিনায় আগমণ করতে দেখতে পেল। তখন ইহুদী লোকটি উচ্চস্বরে চিৎকার করে বলে উঠল, হে আরব সম্প্রদায়! ইনিই তোমাদের সেই ব্যক্তি যার জন্য তোমরা অপেক্ষা করছ।[১] বস্তুত এটা রাসূল সাঃ-এর প্রতি তাদের বিশাল আন্তরিকতা ও ভালোবাসা নির্দেশ করে। তাই নবী সাঃ যারা তার প্রতি শত্রুতা পোষণ ও নির্যাতন করছিল তাদেরকে ছেড়ে এমন লোকদের নিকট আগমণ করলেন যারা তাকে সমর্থন করে ও ভালবাসে এবং তার দ্বারা যাতে মদিনা শহরটি কল্যাণ ও ঈমানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

ছাত্র: উস্তাদ, আপনি বললেন যে, 'তারা প্রত্যহ সকালে মদিনার বাইরে হার্‌রায় গিয়ে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতো।' হার্‌রা মানে কী?

---

(১) পূর্বোক্ত।

শিক্ষক: হার্‌রা হচ্ছে কালো পাথরবিশিষ্ট যমীন, মনে হবে যেন এগুলো আগুনে পুড়িয়ে কালো করা হয়েছে।

ছাত্র: জটিল অবস্থা, কিন্তু ইহুদী লোকটি যখন নবী সাঃ-এর আগমনের খবর দিল তখন মুসলমানরা কি করল?

শিক্ষক: মুসলমানরা তাদের অস্ত্র নিয়েছিল আল্লাহর রাসূল সাঃ-কে অভিবাদন ও স্বাগত জানাতে এবং তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে- যা তার আগমনে তাদের ভালবাসা ও আনন্দ প্রকাশ করে। ... তারপর রাসূল সাঃ কুবায় বনু আমর ইবনে আউফের দিকে রওনা হন। দিনটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের সোমবার। তিনি সেখানে প্রথমে কুবা মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাতে নামাজ আদায় করেন। প্রায় চৌদ্দ রাত তিনি কুবায় অবস্থান করেন।

কুবা মসজিদ প্রতিষ্ঠা মসজিদের গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে। কারণ কুবায় আসার পর নবী সাঃ প্রথম যে কাজটি করেছিলেন তা ছিল সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা। তিনি নিজে এবং তার সাহাবীরা মসজিদটি নির্মাণের জন্য পাথর বহন করেছিলেন। এভাবে তিনি তাদের সাথে মসজিদ নির্মাণ কাজে অংশ নিয়েছিলেন।

ছাত্র: কেন তিনি কুবা দিয়ে শুরু করলেন, উস্তাদ?

শিক্ষক: প্রথমত: কুবা মদিনার সাথে সংযুক্ত ছিল না। কারণ, সে সময় জনসংখ্যা ছিল খুব কম। ফলে তৎকালীন মদিনা শহরটি আজকের মতো ছিল না, যেখানে বাসস্থান, বাড়ি ও বিল্ডিং সংযুক্ত রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: যখন নবী সাঃ মদিনায় আগমণ করেন তখন তার রাস্তা ছিল 'আইর' নামক পাহাড়ের পেছন দিক থেকে কুবা অভিমুখে। তাছাড়া নবী সাঃ ছিলেন তার আচরণে বিচক্ষণ, তিনি জানেন কোন রাস্তা চলাচলের জন্য সবচেয়ে ভাল। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা তাকে পথ দেখান এবং তিনি যা করেন তার সর্বোত্তম দিকে পরিচালিত করেন।

ছাত্র: এটি আপনার কাছ থেকে আমাদের জন্য একটি আদর্শ নির্দেশিকা ও শিক্ষা যা আমরা আপনার কাছ থেকে লালন করি। আপনাকে ধন্যবাদ, আমাদের প্রিয় উস্তাদ।

শিক্ষক: অতঃপর তিনি তার সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। লোকজন তার সাথে আনন্দে ও খুশি হয়ে চলতে লাগলো। আনসারী নারী, পুরুষ ও শিশুরা অত্যন্ত খুশি হয়েছিল; এমনকি তাকে দেখার জন্য তারা বাড়ির ছাদেও উঠেছিল। ছোট ছোট বালক-বালিকারা ও ভৃত্যরা রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল এবং উচ্চস্বরে বলছিল: হে মুহাম্মাদ, হে আল্লাহর রাসূল! তারা নিম্নের কবিতাও গাইতে ছিল:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع *** وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع *** جئت شرفت المدينة جئت يا خير داع

ছাত্র: আল্লাহর কসম, এটা অনেক আনন্দের। আমরা এখনও তা অনুভব করছি, তাহলে আনসার ও তাদের সন্তানদের অনুভূতি কেমন ছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, এ আনন্দ হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। কেনিই বা হবে না, অথচ আগমণকারী ব্যক্তি হলেন মদিনায় আগমণকারী, প্রবেশকারী ও বসবাসকারী সের্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি হলেন এখানে হাঁটাচলাকারী ও সালাত আদায়কারীদের সেরা। তিনিই সর্বোত্তম ব্যক্তি যে এখানে আহার করেছেন, ঘুমিয়েছেন ও সমাহিত হয়েছেন।

ছাত্র: উস্তাদ, এরপরে কী হল?

শিক্ষক: তিনি যখন মদিনায় প্রবেশ করলেন, তখন তার সাথে লোকজন চলতে লাগল। অবশেষে তার উটনীটি এমন জায়গায় থেমে গেল যেখানে তিনি তার মসজিদ নির্মাণ করেছেন। যখন তার উটনী থেমে গেল তিনি বললেন: (ইনশাআল্লাহ, এ স্থানটিই হবে মনযিল।)

চতুর্থ অধ্যায়:

ইসলামী রাষ্ট্র গঠন

তৎকালীন মদিনার সামাজিক জীবন

শিক্ষক: সামাজিক জীবন মানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মদিনার মানুষের জীবন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনায় আগমণ করেন, তখন তিনি একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন যেখানে তারা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে সমবেত হবে এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালিত করাও সম্ভব হবে। তাছাড়া নবী সাঃ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বও ভ্রাতৃত্বও স্থাপন করেছিলেন। তিনি মদিনায় বসবাসকারী মুসলমানদের সাথে এবং অমুসলিমদের সাথে চুক্তি লিপিবদ্ধ করেছিলেন- যা অচিরেই ব্যাখ্যা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এভাবে সমাজ জীবনের উপর ইসলামের প্রভাব প্রকাশ পেতে থাকে।

ছাত্র: এটা খুবই ভালো যে, সেখানে মুসলমানদের জন্য বিশেষ জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

মসজিদ নির্মাণ:

শিক্ষক: তিনি যখন মদিনায় প্রবেশ করলেন, তখন তার সাথে লোকজন চলতে লাগল। অবশেষে তার উটনীটি এমন জায়গায় থেমে গেল যেখানে তিনি তার মসজিদ নির্মাণ করেছেন। যখন তার উটনী থেমে গেল তিনি বললেন: (ইনশাআল্লাহ, এ স্থানটিই হবে মনযিল।)

ঐ সময় সেখানে কতিপয় মুসলিম পুরুষ ব্যক্তি সালাত আদায় করতেন। এ জায়গাটি ছিল আসআদ ইবনু যুরারার আশ্রয়ে পালিত সাহল ও সুহাইল নামক দু'জন ইয়াতীম বালকের খেজুর শুকাবার স্থান। তারপর রাসুলুল্লাহ সাঃ সেই বালক দু'টিকে ডেকে পাঠালেন এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য তাদের নিকট জায়গাটির মূল্যের বিনিময়ে বিক্রয়ের আলোচনা করলেন। তারা বলল ইয়া রাসুলাল্লাহ! বরং এটি আমরা আপনার জন্য বিনামুল্যে দিচ্ছি। কিন্তু রাসূল সাঃ তাদের কাছ থেকে বিনামুল্যে গ্রহণে অসম্মতি

জানালেন এবং অবশেষে স্থানটি তাদের থেকে খরিদ করে নিলেন। তারপর সেই স্থানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করলেন।[১]

ছাত্র: নবী সাঃ-এর সাথে এ দুজন বালকের আচরণ খুবই ভদ্র ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, তারা ভদ্রতা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনমূলক আচরণই করেছে। তবে রাসূল সাঃ সেটাকে মুল্যায়ণ করেছেন এবং এ ভদ্রতার অনুরূপ আচরণ করেছেন; ফলে তিনি তাদেরকে মুল্য পরিশোধ করেছেন। আর এ মুল্য আল্লাহর নবীর পক্ষ থেকে হওয়া তা নিঃসন্দেহে বরকতময় ছিল।

ছাত্র: নবী সাঃ কীভাবে মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন?

শিক্ষক: মসজিদটি পাথর, কাদামাটি, খেজুরের ডাল ও কাণ্ড দিয়ে নির্মিত হয়েছিল।[২]

ছাত্র: কারা নির্মাণ কাজ করেছিল?

শিক্ষক: সে সময় বর্তমান যুগের ন্যায় শ্রমিক, কোম্পানি এবং উত্তোলন মেশিনের মতো আধুনিক ব্যবস্থা ছিল না। বরং সাহাবায়ে কেরামই নির্মাণ করছিলেন। স্বয়ং নবী সাঃ তাদের সাথে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মদিনায় তার আগমনের পর পরই মসজিদ নির্মাণে তার আগ্রহ ইসলামের দৃষ্টিতে মসজিদের গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে। কারণ, এটাই হয়ে উঠে তাদের মিলনস্থল যার মাধ্যমে তারা নবী সাঃ-এর সাথে সাক্ষাত করতো এবং তিনি তাদেরকে দ্বীনের বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। অতএব, আজও মসজিদ শিক্ষাদান, সালাত আদায় এবং মুসলমানদের মিলনের স্থান হিসাবে স্বীকৃত।

---

(১) সহীহ বুখারী: (৩৯০৬)।

(২) সহীহ বুখারী: (৩৯৩২)।

মুসলমানরা নামাজের সময় খুব আন্তরিকতার সাথে মসজিদে আসতেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা নামাজের আযান ফরজ করেন, যা তোমরা আজ শুনতে পাও এবং মুখস্থ করেছ। বিলাল বিন রাবাহ রাঃ মসজিদে নববীর মুয়াজ্জিন ছিলেন।

মদিনায় প্রবেশের পর রাসূল সাঃ-এর বাসস্থান:

শিক্ষক: যখন নবী সাঃ মদিনায় আসেন, তখন তিনি আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ-এর নিকট অবতরণ করেন। তার বাড়ি ছিল দু'তলা বিশিষ্ট। নবী সাঃ প্রথম তলায় থাকতেন এবং আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ উপরের তলায় থাকতেন।

ছাত্র: আবু আইয়ুব আনসারীর জন্য এটি একটি বড় গর্বের বিষয় যে, নবী সাঃ তার বাড়িতে থাকতেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটা বিরাট সম্মান ও মর্যাদার বিষয় যে, তার বাড়িতে রাসূল সাঃ থেকেছেন।

কিন্তু আবু আইয়ুব রাঃ যখন উপরের তলায় উঠলেন, তখন তিনি নবী সাঃ-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করলেন এবং বললেন: আমরা তো রাসূলের মাথার উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি! তাই তারা একপাশে সরে গিয়ে ঘরের একপাশে রাত্রি যাপন করলেন এবং ঘরের এদিক সেদিক হাঁটাহাঁটি করলেন না, নবী সাঃ-এর মাথার উপর চলে আসার ভয়ে। তাই সকাল না হওয়া পর্যন্ত তারা ঘরের একপাশেই রাত কাটালেন। তারা বিষয়টি নবী সাঃ-কে জানালে তিনি বললেন: নীচ তলা-ই অধিক সহজ ও আরামদায়ক। তখন আবু আইয়ুব রাঃ বললেন: আমি তো ঐ ছাদের উপর উঠব না যার নীচে আপনি অবস্থান করবেন। অবশেষে নবী সাঃ উপর তলায় চলে গেলেন।[১] বস্তুত এটা নবী সাঃ-এর প্রতি তাদের গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের বহিঃপ্রকাশ।

---

(১) সহীহ মুসলিম: (২০৫৩)।

ছাত্র: আল্লাহর কসম, এটা নবী সাঃ-এর সাথে উন্নত শিষ্টাচারিতার বহিঃপ্রকাশ। যেখান থেকে আমরা শেখতে পারি যে, কিভাবে আমাদের নবীকে ভালবাসতে হবে, তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে এবং আমাদের জন্য তার অবশিষ্ট সুন্নতের মুল্যায়ন করতে হবে। মহান সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ আমাদেরকে মহানবী সাঃ-এর সাথে মহান আচার-আচরণ শিখিয়েছেন।

শিক্ষক: বরং আবু আইয়ুব রাঃ নবী সাঃ যা ভালোবাসতেন তা ভালোবাসতে আগ্রহী ছিলেন- এমনকি পানাহারেও। তিনি নবী সাঃ-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করতেন এবং যখন নবীর কাছ থেকে অবশিষ্ট খাবার ফিরে আসত, তখন আবু আইয়ুব রাঃ জিজ্ঞাসা করতেন খাবারে নবী সাঃ-এর আঙ্গুলগুলো কোথায় ছিল। তারপর তিনি সেখান থেকে খেতেন।[১] বস্তুত এটা নবী সাঃ-এর প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসার কারণে। তারা তাকে খুব ভালবাসতেন। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই নবী সাঃ-কে ভালবাসতে হবে এবং আবু আইয়ুব রাঃ-এর মতো তার সুন্নাহর অনুসরণ করতে হবে।

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন:

শিক্ষক: মদিনার মুসলমানরা আনসারে পরিণত হয়েছিল যারা নবী সাঃ এবং তার সাহাবীদের হিজরতকে স্বাগত জানিয়েছিল। অনুরূপভাবে মুহাজির তারা যারা মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন এবং নিজেদের অর্থ, বাড়িঘর, জিনিসপত্র ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করে শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে মদিনায় চলে আসেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এর বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি বলেছেন:

﴿لِلۡفُقَرَآءِ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخۡرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِمۡ وَأَمۡوَٰلِهِمۡ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضۡوَٰنٗا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ

(১) সহীহ মুসলিম: (২০৫৩)।

إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةٗ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٩﴾ [الحشر: ٨-٩]

অর্থ: *[*এ সম্পদ নিঃস্ব মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের বাড়িঘর ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্য করে। এরাই তো সত্যাশ্রয়ী।* আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের অন্তরে কোন (না পাওয়াজনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। বস্তুতঃ যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।*]* সূরা আল-হাশর: ৮-৯।

ছাত্র: উস্তাদ, এটা তো মুহাজিরদের জন্য একটি বেদনাদায়ক পরিস্থিতি, যখন তাদের কিছুই ছিল না তখন তারা কীভাবে বেঁচে ছিল?

শিক্ষক: মুহাজিরদের জন্য এটি সত্যিই একটি বেদনাদায়ক পরিস্থিতি, বিশেষ করে যেহেতু তারা মদিনায় চলে এসেছিলেন আর মদিনার লোকেরা কৃষিকাজ করতো। অথচ এতে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল সামান্য। তাদের বেশিরভাগ অভিজ্ঞতা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যে, তাদের মক্কা শহর থেকে বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও, যেখানে তারা বসবাস করতেন। ফলে তাদের অবস্থার অধিক যত্ন ও খেয়াল রাখার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

ছাত্র: প্রকৃতপক্ষে, তাদের অবস্থা কঠিন হচ্ছিল। তবে হয়তো আল্লাহ তাদের বিষয়গুলো সহজ করে দিয়েছেন উস্তাদ। মুহাজিরগণ আল্লাহর রাস্তায় যা করেছেন সেজন্য তাদের প্রতি আমাদের ভালবাসা গভীর হয়ে উঠেছে।

শিক্ষক: এই দ্বীন যা আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর উপর নাযিল করেছেন তা হল ভালবাসা, ঐক্য ও ভালোর পক্ষে সমর্থনের দ্বীন। এটা এমন একটি ধর্ম যা একজনকে তার ভাইয়ের পাশে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করে। আনসারদের তাদের মুহাজির ভাইদের প্রতি মহান অবদান ছিল, যা আমরা অচিরেই জানতে পারব, ইনশাআল্লাহ। তবে চলো এখন এই বিষয়টির মোকাবিলায় রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিই।

প্রথমত: মহানবী সাঃ আল্লাহর কাছে দোয়া করে মক্কার প্রতি তাদের দুর্বলতা ও এর প্রতি তাদের ভালবাসার সমাধান করেছিলেন। তিনি দোয়ায় বলেছিলেন: ***(হে আল্লাহ, মদিনাকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দিন যেমন আমরা মক্কাকে ভালবাসি বা তার চেয়েও বেশি, এটিকে স্বাস্থ্যকর করুন এবং আমাদের জন্য এর সা' ও মুদ-এর মধ্যে বরকত দান করুন।)*** সহীহ বুখারী।

ফলে নবী সাঃ মক্কার প্রতি তাদের ভালবাসার মোকাবেলা করেছিলেন মদিনার প্রতি তাদের ভালবাসা দেওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করার মাধ্যমে।

তিনি আল্লাহর নিকট দোয়ার মাধ্যমে তাদের অসুস্থতার চিকিৎসা করেছেন; শহরকে রোগমুক্ত করার জন্য এবং তারা যে ওজন ব্যবহার করত সেগুলোতে বরকত চেয়ে। বর্তমানে আমরা যেমন ওজন করার জন্য কিলোগ্রাম ও কিলো অংশ ব্যবহার করি, তেমনি তারা সে সময় সা', মুদ ইত্যাদি ব্যবহার করতেন।

ছাত্র: তারা কি মদিনাকে ভালবাসতে শুরু করেছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, তারা মদিনাকে আস্তে আস্তে ভালবাসতে শুরু করলো, তারা রোগ-বালাই সেরে গেল এবং নবী সাঃ-এর দোয়ার বরকতে মদিনা আজও পর্যন্ত বরকতময় হয়ে আছে।

দ্বিতীয়ত: তিনি মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের মাধ্যমে তাদের জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলো সমাধান করেছিলেন। আলেমগণ বলেছেন: "তিনি তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন, যাতে তাদের থেকে বিচ্ছিন্নতার একাকীত্ব দূর হয়ে যায় এবং তারা পরিবার ও বংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং একে অপরকে সমর্থন করে।"[১] তাই আমাদের উচিত মুসলিমদের সাথে ভাইয়ের মতো আচরণ করা।[২]

ছাত্র: উস্তাদ, আনসারগণ ভ্রাতৃত্বের এ সম্পর্ককে কীভাবে নিয়েছিল?

শিক্ষক: আনসারগণ ছিলেন আল্লাহ ও তাঁর নবীর প্রতি একান্ত অনুগত। তারা উদার, প্রতিশ্রুতি পরায়ণ এবং নবী সাঃ-এর সাহাবীদের প্রতি মহব্বত পোষণকারী। তাই তারা মুহাজিরদের তাদের পরিবারের পরিবর্তে উত্তম ক্ষতিপূরণ দিয়েছিলেন; ভালবাসা, সম্মান ও সমর্থন প্রদান করেছেন। এভাবে মুহাজিররা যা ত্যাগ করে এসেছিলেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এর পরিবর্তে উত্তম কিছু দিয়েছেন। তাইতো আল্লাহ তায়ালা আনসারদের প্রশংসায় বলেছেন:

﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلۡإِيمَٰنَ مِن قَبۡلِهِمۡ يُحِبُّونَ مَنۡ هَاجَرَ إِلَيۡهِمۡ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمۡ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤۡثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةٞۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾ [الحشر: ٩]

অর্থ: [আর তাদের জন্যও, মুহাজিরদের আগমনের আগে যারা এ নগরীকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছে ও ঈমান গ্রহণ করেছে, তারা তাদের কাছে যারা হিজরত করে এসেছে তাদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তার জন্য তারা তাদের

(১) ফতহুল বারী: (৭/২৭০)।

(২) শিক্ষক ছাত্রদের নিকট ইসলামী ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব, বাস্তব জীবনে সাধ্যমত পরস্পরকে সহযোগিতা করার মাধ্যমে এর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরবেন।

অন্তরে কোন (না পাওয়াজনিত) হিংসা অনুভব করে না, আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। বস্তুতঃ যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।] সূরা আল-হাশর: ৯।

ছাত্র: আল্লাহর কসম, আনসারদের জন্য আমাদের হৃদয়ে গভীর ভালবাসা তৈরি হয়েছে।

শিক্ষক: তাদের মুহাজির ভাইদের প্রতি তাদের আনুগত্য ও ভালবাসার একটি উদাহরণ হল যে, নবী সাঃ মুহাজিরদের মধ্য থেকে আব্দুর রহমান বিন আউফ এবং আনসারদের মধ্য থেকে সাদ বিন রাবী'র মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন। আনসারী সাদ রাঃ মুহাজির আব্দুর রহমান বিন আওফকে বললেন: আনসারদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী, আমি আমার অর্থ সমান দু'ভাগ করে ফেলবো।(১)

ছাত্র: খুবই চমৎকার এবং এটা সাদ বিন রাবী' রাঃ-এর মুহানুভবতা।

শিক্ষক: এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রশংসা করে বলেছেন: [আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।] সূরা আল-হাশর: ৯। কিন্তু আব্দুর রহমান বিন আউফ রাঃ আনসারী সাহাবীর এ দান ও উদারতার অফারটি গ্রহণ করেননি, তার ভাইয়ের সম্পদের প্রতি লোভ দেখাননি। বরং তিনি বললেন: "আল্লাহ তায়ালা আপনার সম্পদ ও পরিবার পরিজনে বরকত দান করুন। আপনাদের বাজারটি কোন দিকে?" তারপর তিনি বাজারে গিয়ে নিজে ব্যবসা শুরু করলেন। অবশেষে তিনিও ব্যবসা করে অঢেল সম্পদের মালিক হলেন।

ছাত্র: আব্দুর রহমান বিন আউফ রাঃ-এর এর অবস্থানটিও খুবই চমৎকার ও প্রশংসনীয়। তারা আমাদের সামনে সুন্দর আচার আচরণের নমুনা রেখে গেছেন।

---

(১) সহীহ বুখারী: (৩৭৮০)।

শিক্ষক: হ্যাঁ, তারা আমাদের জন্য একটি শিক্ষালয়; আমরা তাদের কাছ থেকে শিখতে পাই কীভাবে একে অপরের সাথে সহাবস্থান করতে হয়, সদয় হতে হয় এবং কীভাবে নিজের ভাইয়ের অর্থ রক্ষা করতে হয় এবং শোষণ বা লোভ না করতে হয়।

মদিনার মুসলিম সম্প্রদায় এভাবেই রাসূল সাঃ-এর শাসনামলে বসবাস করত। তারা পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের মধ্যে বসবাস করত, তাদের মধ্যে শত্রুতা বা বিদ্বেষ ছিল না। তারা সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর রাসূলের সাহচর্য পাওয়ার যোগ্য ছিল। তাই আমাদের অবশ্যই তাদের সবার প্রতি ভালবাসা পোষণ করতে হবে।

নববী চুক্তিনামা:

শিক্ষক: যেহেতু মদিনায় কিছু ইহুদী এবং আওস, খাযরাজ ও মুহাজির মুসলমানগণ বসবাস করতেন এবং এর নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে চলে আসে, তখন আল্লাহর রাসূল সাঃ তার এবং ইহুদিদের মধ্যে একটি দলিল, তথা একটি চুক্তিনামা লিখেন। এর মাধ্যমে তাদের অধিকার সংরক্ষিত হয় এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তিনি সুরক্ষা পান।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাঃ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যেও একটি অঙ্গিকারনামা লিখেছিলেন এবং তাতে যা বলা হয়েছিল তা নিম্নরূপ ছিল:

- ধার্মিক মুমিনগণ তাদের বিরুদ্ধে থাকবেন যারা তাদের মধ্য থেকে সীমালংঘন করে। অর্থাৎ মুহাজির ও আনসার মুমিনগণ যারা উপর জুলুম করে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান করবে, সে আনসার হোক বা মুহাজির হোক।
- একজন মুমিনের বিরুদ্ধে একজন কাফেরকে সমর্থন করা যাবে না। অর্থাৎ কোন মুমিন ব্যক্তি কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কাফেরদের কাউকে সমর্থন করবে না, যদিও সে তার আত্মীয় হয়। কারণ সব আত্মীয়-স্বজনই মুসলমান নয়।
- যখনই তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হবে, তখন সমাধানকল্পে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাঃ-এর দিকে ফিরে আসতে হবে। এর মানে হল,

মুসলমানদের মাঝে কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে আল্লাহর কিতাব ও মুহাম্মাদ সাঃ-এর বিধানই চুড়ান্ত। কাজেই অন্য কারো মত অথবা জাহেলী যুগের কোন রীতি-নীতির দ্বারস্থ হওয়া যাবে না।

তিনি তার এবং ইহুদিদের মধ্যেও চুক্তিনামা লিখেছিলেন, তাদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায় এবং তাদের অধিকার পুরোপুরি সংরক্ষিত হয়। এর ফলে মদিনার জীবনযাত্রা সুন্দর ও শান্ত হবে। চুক্তিনামায় যা বলা হয়েছিল তা নিম্নরূপ:

- ইহুদীরা তাদের ধর্ম পালন করবে, মুসলমানগণও তাদের ধর্ম পালন করবে। এর অর্থ হল নবী সাঃ তাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেননি অথবা তাদেরকে ইসলাম ও যুদ্ধের মধ্যে কোন একটির এখতিয়ার দেননি। বরং তাদেরকে স্বধর্ম পালনের এখতিয়ার দিয়েছিলেন, তবে তাদের মধ্যে যে ইসলাম কবুল করতে চায় তাকে তা গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। বস্তুত এটা তাদের প্রতি ন্যায়বিচার ও ইনসাফের শামিল।
- মুহাম্মাদ সাঃ-এর অনুমতি ছাড়া কেউ তাদের মধ্য থেকে বাইরে যাবে না।

এর ফায়দা হল: তাদের অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। কেননা এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে কে বাইরে যাচ্ছে, আর কে অনুপ্রবেশ করছে তা জানা যাবে।

- যে ব্যক্তি বাইরে চালে যাবে সে নিরাপত্তা পাবে, যে মদিনার ভেতরে অবস্থান করবে সেও নিরাপত্তা পাবে। তবে জুলুম করবে তার জন্য নিরাপত্তা নেই।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মদিনা ছেড়ে যায় সে মুসলমানদের থেকে নিরাপদ। কেউ তার উপর সীমালঙ্ঘন করবে না, তার পরিবার বা সম্পদের উপরও নয়। আর যে সেখানে অবস্থান করবে সেও নিরাপদ, এবং কেউ তার উপর সীমালঙ্ঘন করবে না। তবে যে অন্যায় করে সে নিরাপদ নয়। তাকে অন্যায়ের জবাবদিহি করতে হবে।

ছাত্র: এ চুক্তিটি খুবই চমৎকার, এতে কোন অবিচার করা হয়নি।

শিক্ষক: হ্যাঁ, ইসলাম যে কারো প্রতি জুলুম বা অবিচার করাকে হারাম করেছে। নবী সাঃ এ দ্বীন আল্লাহর নিকট থেকে নিয়ে আগমণ করেছেন; যাতে সমস্ত মানুষ কুফুরী থেকে বের হয়ে ইসলামে প্রবেশ করে, যাতে তারা জান্নাতে যেতে পারে। মানুষের সাথে শত্রুতা বা যুদ্ধ জড়ানো লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নয়।

ছাত্র: ইসলাম ধর্ম খুবই চমৎকার ও সুন্দর ধর্ম। আমরা মুসলিম হতে পেরেছি এজন্য আল্লাহর প্রশংসা করছি। উস্তাদ, চুক্তির বাকি বাকি অংশ কি কেউ লঙ্ঘন করেনি?

শিক্ষক: ইহুদিদের অধিকার সংরক্ষণের চুক্তি এবং এতে ন্যায়বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা থাকা সত্ত্বেও তারা তা ভঙ্গ করে এবং মক্কার মুশরিকদের সাথে নবী সাঃ-এর উপর হামলা করতে সম্মত হয়। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এবং মদিনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। তাই নবী সাঃ তাদেরকে বিতাড়িত করেছিলেন।

এটি পরে স্পষ্ট ও ব্যাখ্যা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

নবী সাঃ-এর গৃহ:

শিক্ষক: নবী সাঃ আবু আইয়ুব আনসারী রাঃ-এর সাথে থাকার পরে, তিনি নিজের জন্য একটি বাড়ি তৈরি করেছিলেন এবং এর দরজা ছিল মসজিদে নববীর দিকে। এখানেই তিনি আয়েশা রাঃ-কে বিয়ে করেছিলেন।[১] তার এ ঘরটি ছিল এক হুজরা বিশিষ্ট।

মদিনায় আগমণের পর নবী সাঃ একাধিক বিয়ে করেন, যার সংখ্যা নয় জন। সিরিয়াল অনুপাতে তারা হলেন: সাওদা, আয়েশা, হাফসা, উম্মে সালামা, যায়নাব বিনতে জাহশ, উম্মে হাবিবা, জুয়াইরিয়া, সাফিয়্যা, মাইমুনা। নবী সাঃ এদের সবার আগে মৃত্যু বরণ

(১) দেখুন, ইবনে সাদ রচিত 'তাবাকাতুল কুবরা': (১/২৪০)।

করেন।[১] তারা সকলেই উম্মুল মুমিনীন তথা মুমিনদের মাতা। বস্তুত পুরুষদের জন্য চারটি বিয়ে করা জায়েজ। কিন্তু আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ এর চেয়ে বেশি সংখ্যক বিয়ে করেছেন; এটা তার জন্য খাস ছিল যা আল্লাহ তিনি ব্যতীত অন্য কারো জন্য অনুমোদিত করেননি। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য বিশেষ অনুগ্রহ।

ছাত্র: নবী সাঃ-এর স্ত্রীগণ কোথায় থাকতেন?

শিক্ষক: তারা বিভিন্ন হুজরায় থাকতেন। অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের জন্য ব্যক্তিগত আলাদা হুজরা ছিল। যখনই তিনি কাউকে বিয়ে করেছেন, তার জন্য আলাদা হুজরা তৈরি করে দিয়েছেন। এগুলোর অবস্থান বর্তমানে নবী সাঃ-এর কবরের সন্নিকটে।

ছাত্র: আমরা ইতিপূর্বে খাদিজা রাঃ-এর গর্ভের নবী করীম সাঃ-এর সন্তানদের সম্পর্কে জেনেছি, তার কি অন্য সন্তানও ছিল?

শিক্ষক: সুন্দর প্রশ্ন। খাদিজা রাঃ-এর গর্ভের সন্তান ছাড়া রাসূল সাঃ-এর আর কোন সন্তান ছিল না। তবে, মিশরের বাদশা মুকাওকিস নবী সাঃ-কে মারিয়া কিবতিয়াকে উপহার হিসেবে দেন এবং হিজরী অষ্টম সনে তার গর্ভে পুত্রসন্তান ইব্রাহিমের জন্ম হয় এবং সে দুগ্ধশিশু থাকাবস্থায় মৃত্যু বরণ করে।[২]

আহলে সুফফা:

শিক্ষক: সুফফা হল রাসূল সাঃ-এর মসজিদের শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি স্থান, যেখানে একদল মুসলমান অবস্থান করতেন। তারা ইবাদত-বন্দেগি, কুরআন তেলাওয়াত, নবীর সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত থাকতেন। তাদের সংখ্যা আনুমানিক সত্তর জন। তারা ইবাদত-বন্দেগী ও জ্ঞান অন্বেষণে নিমগ্ন হওয়া সত্ত্বেও, এটা তাদেরকে

---

(১) ফতহুল বারী: (৯/১১৩)।

(২) দেখুন: সিরাতে ইবনে হিশাম: (১/২০২), 'তাবাকাতুল কুবরা': (৮/১৯-৩৯)।

জিহাদে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়নি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আবু হুরায়রা রাঃ।

বিভিন্ন প্রতিনিধি দলকে শিক্ষাদান:

শিক্ষক: কিছু কিছু গোত্র মদিনায় এসে আল্লাহর রাসূল সাঃ-এর সাথে সাক্ষাত করত এবং কেউ কেউ তাদের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিত।

ছাত্র: উস্তাদ, প্রতিনিধি দল বলতে উদ্দেশ্য কী?

শিক্ষক: কোন গোত্র বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে মদিনায় বা যে কোন স্থানে যারা আসে তাদেরকে প্রতিনিধি দল বলা হয়। ফলে তারা তাদের গোত্র বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী একদল লোক।

নবী করীম সাঃ প্রতিনিধি দলকে সাদরে গ্রহণ করতেন এবং তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দিতেন। তারপর তারা নিজ পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে যেতেন এবং আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে যা শিখেছিলেন তা তাদেরকে শেখাতেন। এসব প্রতিনিধি দলের মধ্যে অন্যতম হল মালিক বিন হুওয়াইরিস রাঃ-এর প্রতিনিধিদল, যার সম্পর্কে তিনি বলেন: **(আমি আমার কওমের একটি দল নিয়ে নবী সাঃ-এর কাছে এলাম এবং আমরা তার সাথে বিশ রাত ছিলাম। তিনি ছিলেন দয়ালু ও কোমল। তিনি যখন আমাদেরকে আমাদের পরিবারের প্রতি আকুলতা দেখলেন, তখন বললেন: "তোমরা ফিরে যাও এবং পারিবারের সাথে থাক, তাদেরকে দ্বীন শেখাও ও সালাত কায়েম কর..."**) সহীহ বুখারী।

রাসূল সাঃ আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদলকেও বলেছেন: **(তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদেরকে শিক্ষা দাও।)** সহীহ বুখারী।

ছাত্র: উস্তাদ, উক্ত সাহাবী রাসূল সাঃ-কে দয়ালু ও কোমল বলেছেন- যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; এ গুণ দুটি সুন্দর।

শিক্ষক: হ্যাঁ, তিনি ছিলেন দয়ালু, কোমল ও সহানুভূতিশীল- যারা তার সাথে মিশেছে বা উঠাবসা করেছে বা তাকে দেখেছে। তিনি মানুষের উপকার করতে আগ্রহী ছিলেন। তার নিকট আগমণকারীদের মধ্যে যার সম্পর্কে জানতে পেরেছেন যে, সে ইসলামের বিধি-বিধান শিখেছে তাকেই তিনি বলেছেন: 'তুমি তোমার পরিবার ও সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাও এবং তাদেরকে শিক্ষা দাও।' কারণ, তিনি জানতেন যে লোকেরা তাদের পরিবারকে মিস করে এবং সেখানে তাদের স্বার্থ ও জীবিকা রয়েছে। তাই তাদের প্রতি কোমল আচরণ করতেন।

এটি আমাদের শেখায় কীভাবে অন্যদের সাথে থাকতে হয়, তাদের অবস্থার মুল্যায়ন করতে হয়, তাদের প্রতি সদয় হতে হয় এবং সুহৃদ হতে হয়। ঠিক যেমন আল্লাহর রাসূল সাঃ তার সাথে সাক্ষাৎকারীদের সাথে করতেন।

মানুষকে দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষাদান:

শিক্ষক: ইসলাম আগমণের আগে লিখতে-পড়তে জানত এমন লোকের সংখ্যা কম ছিল। মক্কায় তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র সতেরো জন। এছাড়াও মদিনাতেও কম সংখ্যক ছিল।

ছাত্র: সম্ভবত শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল ছিল। কিন্তু নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর আবির্ভাবের সাথে ইসলাম আগমণের ফলে শিক্ষার প্রসার-প্রচার ঘটে এবং যারা লিখতে-পড়তে জানত তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কারণ ইসলাম শিক্ষাকে উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ ٥﴾ [العلق: ١-٥]

অর্থ: *[*পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।* তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড থেকে।* তুমি পড়। তোমার প্রতিপালক তো মহামহিমান্বিত।* যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।* তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।*]* সূরা আল-আলাক: ১-৫। রাসূল সাঃ বলেছেন: **(যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য রাস্তায় বের হয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সুগম করে দেন।)** সুনানে আবু দাউদ।

ছাত্র: এ বিশাল সওয়াবের কারণেই মানুষ ইলম অন্বেষণ করে- তাই না উস্তাদ?

শিক্ষক: হ্যাঁ, আল্লাহর নিকট ইলম বা জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। কেননা জ্ঞানী ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা দেয়। কোন ব্যক্তি জ্ঞানী-আলেমের দ্বারস্ত না হয়ে জ্ঞানী-আলেম হতে পারে না। কাজেই তোমরা ইলম অর্জনে সচেতন হও। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ﴾ [المجادلة: ١١]

অর্থ: *[*তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ্ তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন; আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।*]* সূরা আল-মুজাদালা: ১১।

নবী সাঃ মানুষদেরকে তাদের দ্বীনের বিষয়ে তালিম দিতেন। তবে বেশি সময় ধরে বেশি কিছু শিখাতেন না; যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে এবং বিরক্তবোধ না করে। ফলে তিনি এ বিষয়েও হিকমত অবলম্বনকারী ছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ মানুষদেরকে প্রতি বৃহস্পতিবারে ওয়াজ-নসিহত করতেন এবং বলতেন: **(আমি নসিহত করার ব্যাপারে তোমাদের অবস্থার প্রতি খেয়াল রাখি, যেমনভাবে নবী সাঃ নসিহত করার সময় আমাদের ক্লান্তির আশংকায় আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।)** সহীহ বুখারী।

বর্শা ও তীর নিয়ে খেলা:

শিক্ষক: সাহাবীরা বর্শা ও তীর নিয়ে খেলতেন, যা ছিল যুদ্ধের হাতিয়ার। তারা তীর নিক্ষেপের অনুশীলন করতেন; যাতে তারা যুদ্ধে ইসলাম এবং নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারেন।

আয়েশা রাঃ বলেন: একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাঃ-কে আমার ঘরের দরজায় দেখলাম। তখন হাবশার লোকেরা মসজিদে (বর্শা দ্বারা) খেলা করছিল। অর্থাৎ যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে খেলা করছিল। হাবশী সাহাবী তারা যাদের উৎপত্তি আবিসিনিয়া দেশ থেকে।

শিশুদের প্রতি নবীজির যত্ন:

শিক্ষক: নবী করিম সাঃ শিশুদের যত্ন নিতেন। যেমন তিনি তাদেরকে ভালোবাসতেন, আদর করতেন, স্নেহ করতেন, তাদের সাথে খেলতেন এবং তাদেরকে নিজের সওয়ারীর উপর উঠাতেন।

ছাত্র: উস্তাদ, শিশুরা কি খেলাধুলা করতো?

শিক্ষক: হ্যাঁ, শিশুরা কি খেলাধুলা করতো। এমনকি কখনো কখনো নবী সাঃ তাদের সাথে খেলতেন।

ছাত্র: খুব সুন্দর, কীভাবে উস্তাদ?

শিক্ষক: আল্লাহর রাসূল সাঃ শিশুদের খুব ভালোবাসতেন। তিনি রাস্তার মধ্যে তাদের একজন বা কাউকে পেয়ে তাদের আদর করতেন ও তাদের সাথে খেলতেন। তাদেরকে নিজের সওয়ারীর উপরও উঠাতেন।

ছাত্র: এটি সুন্দর। তিনি খুব বিনয়ী ছিলেন। আপনি কি আমাদেরকে সে সম্পর্কে বলবেন, উস্তাদ?

শিক্ষক: হ্যাঁ বলছি; রাসূল সাঃ আব্দুল্লাহ, উবায়দুল্লাহ সহ আব্বাসীয় বংশের বহু বাচ্চাকে এক লাইনে দাঁড় করাতেন। তারপর বলতেন, যে সবার আগে আমার নিকটে আসতে পারবে তার জন্য এই এই পুরস্কার রয়েছে। ফলে তারা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতো এবং রাসূল সাঃ-এর পিঠে ও বুকে এসে পড়তো এবং তিনি তাদেরকে চুমু দিয়ে আদর করে দিতেন।[১]

ছাত্র: খুব সুন্দর! তার বিনয় আমাদেরকে মুগ্ধ করেছে।

শিক্ষক: তাই তোমাদেরও উচিৎ ছোটদের সাথে বিনয় হওয়া, বড়ত্ব প্রকাশ না করা। বরং তোমরা তাদের সাথে খেলবে, তাদের প্রতি বিনয়ী হবে, তাদেরকে আনন্দ দিবে এবং কষ্ট দিবে না- যেমনটি নবী সাঃ করতেন।

ছাত্র: ঠিক আছে উস্তাদ, সুন্দর উপদেশ।

শিক্ষক: নবী সাঃ শিশুদের সাথে খেলতেন, তাদেরকে নিজের কাঁধে বা বাহনের উপর উঠাতেন। বাহন বলতে এমন পশু যেগুলোর উপর মানুষ আরোহণ করে থাকে, যেমন ঘোড়া, খচ্চর, উট বা গাধা। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ وَيَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: ٨]

অর্থ: [আর তোমাদের আরোহনের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু, যা তোমরা জান না।] সূরা আন-নাহল: ৮।

শিশুরা নবী সাঃ-কে ভালবাসতো, তিনিও তাদেরকে আদর করতেন। তিনি যখন কোন সফর থেকে আসতেন বা তারা তাকে রাস্তায় দেখতে পেতো; তারা তার নিকটে যেতো, তিনি তাদেরকে নিজের বাহনে উঠিয়ে নিতেন। আবদুল্লাহ ইবনু জাফর রাঃ হতে

(১) মুসনাদে আহমাদ: (১/২১৪)।

বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবী সাঃ যখন সফর হতে ফিরতেন তখন আমাদের দ্বারা তাকে স্বাগতম জানানো হত। একদা আমাকে এবং হাসান অথবা হুসাইনের দ্বারা স্বাগতম জানানো হল। তিনি আমাদের একজনকে বসলেন তার সম্মুখে, অন্যজনকে পশ্চাতে।"[১] নবী সাঃ ছিলেন মাঝখানে।

ছাত্র: এটা খুবই বিস্ময়কর। নবীর অবস্থান ও মর্যাদা মহান, তারপরও তিনি শিশুদেরকে অভ্যর্থনা জানাতেন, তারাও তাকে অভ্যর্থনা জানাতো এবং তিনি তাদেরকে সাথে নিতেন। এটি খুব আনন্দের ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, নবী সাঃ থেকে এই ভালবাসা ও যত্ন পাওয়া একটি মূল্যবান আনন্দ। আমরা আমাদের আচরণে নবী সাঃ-এর এ পদ্ধতি ও ধরণ থেকে উপকৃত হতে পারি; বাচ্চাদের আদর করা, তাদের সম্মান করা, তাদের সাথে খেলা করা এবং তাদের রাগান্বিত না করা ইত্যাদি বিষয়ে।

একদিন নবী সাঃ সাহাবীদের সাথে কোন এক ওয়ালিমার দাওয়াত খেতে যান। হঠাৎ দেখেন যে, হুসাইন রাঃ রাস্তার ধারে খেলাধুলা করছিলেন। নবী সাঃ দ্রুত সবার আগে গিয়ে হুসাইনের দিকে দুহাত প্রসারিত করে দিলেন, আর শিশু হুসাইন এদিক সেদিক দৌঁড়াতে লাগলেন, নবী সাঃ তাকে হাসাতে লাগলেন, এভাবে অবশেষে তাকে ধরে ফেললেন ও জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন: (যে হুসাইনকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন।)[২] হুসাইন হলেন নবী সাঃ-এর কন্যা ফাতিমা রাঃ-এর পুত্র, তার পিতা আলী বিন আবি তালিব রাঃ।

সুতরাং চিন্তা করে দেখ, কিভাবে নবী সাঃ এই শিশুটিকে ভালবেসেছেন, রাস্তায় তার সাথে খেলেছেন ও মজা করেছেন এবং তারপর জড়িয়ে ধরে কোলে তুলে নিয়েছেন।

---

(১) সহীহ মুসলিম।

(২) আদাবুল মুফরাদ: (৪৬৩)।

এভাবে আমরাও বাচ্চাদেরকে আদর করবো, হুসাইন রাঃ-কে ভালবাসবো; কেননা নবী সাঃ তাদেরকে ভালবাসতেন। আমরা সকল সাহাবীকেই ভালবাসবো।

ছাত্র: উস্তাদ, তখন কি বাচ্চারা মসজিদে যেত বর্তমানে যেমন মসজিদে বাচ্চাদেরকে যেতে দেখি?

শিক্ষক: হ্যাঁ, তখনও বাচ্চারা মসজিদে গমন করতো। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়ার জন্য তোমরা এই ঘটনাটি গভীরভাবে চিন্তা কর: আবু কাতাদা রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: **(একদা আমরা মসজিদে উপস্থিত থাকাকালে রাসূলুল্লাহ সাঃ উমামা বিনতে আবুল আসকে নিয়ে আমাদের নিকট আসেন, যার মাতা ছিলেন রাসূল সাঃ-এর কন্যা যয়নব রাঃ। এ সময় তিনি (উমামা) শিশু ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাঃ তাকে কাঁধে নিয়ে আসেন এবং ঐ অবস্থায় নামায আদায় করেন। তিনি রুকু করার সময় তাকে নামিয়ে রাখতেন এবং দাঁড়ানোর সময় তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন। এইভাবে তিনি নামায সমাপ্ত করেন।)** সুনানে আবু দাউদ।

ছাত্র: উস্তাদ, তিনি তাকে কাঁধে উঠিয়ে নিতেন এর মানে কি?

শিক্ষক: কাঁধ: এটি দুই স্কন্ধের উপরে এবং মাথার নীচের জায়গা।

বুরাইদা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: **(রাসুলুল্লাহ সাঃ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, ইত্যবসরে হাসান ও হুসাইন রাঃ আসলেন। তাদের পরিধানে দু'টি লাল জামা ছিল। তারা চলছিলেন এবং হোঁচল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। রাসূল সাঃ নীচে নেমে আসলেন এবং উভয়কে দুই হাতে উঠিয়ে নিলেন আর বললেন: আল্লাহ সত্যই বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ"; আমি এদের দেখলাম যে, এরা চলছিল এবং হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল। তখন আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। অবশেষে নীচে নেমে আসলাম এবং তাদের উঠিয়ে নিলাম।)** সুনানে নাসায়ী।

সুতরাং ছোটদের প্রতি নবী সাঃ-এর যত্নের বিষয়টি ভেবে দেখ- তিনি নামাজে ছিলেন, খুতবা দিচ্ছিলেন, তবুও এটা তাকে শিশুদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ ও তাদের যত্ন নিতে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

শিশুদেরকে নবী সাঃ-এর নিকটে আনা হত, তিনি তাদের জন্য দোয়া করে দিতেন।[১] তিনি বাচ্চাদের জন্য বরকত দোয়া করে মাথা হাত বুলিয়ে দিতেন। সায়েব বিন ইয়াযিদ রাঃ বলেন, "আমি আমার খালার সাথে রাসূল সাঃ-এর নিকট গেলাম। আমার খালা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমার বোনের ছেলেটি অসুস্থ। তারপর রাসূল সাঃ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং বরকতের দোয়া করে দিলেন।"

নবী সাঃ-এর কাছ থেকে এই মৃদু ও প্রেমময় আচরণ শিশুদের ও বাচ্চাদের প্রতি তার মহান ভালবাসার ইঙ্গিত দেয়। যেমন তিনি তাদের সাথে খেলতেন, তাদের আদর করতেন এবং তাদের সাথে রসিকতা করতেন।

ছাত্র: আমরা যতই রাসূল সাঃ-এর জীবনী সম্পর্কে জানতে পাচ্ছি, ততই তার প্রতি আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষক: বস্তুত আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবো না যতক্ষণ না আমরা নিজেদের জীবনের চেয়েও আমাদের নবীকে অধিক ভালবাসবো। কিভাবেই বা হবে না, মহান আল্লাহ তাকে তো আমাদের জন্য রহমত স্বরূপ বানিয়েছেন, বরং বিশ্ববাসীর জন্য রহমত, অর্থাৎ সবকিছুর জন্য রহমত স্বরূপ করেছেন।

---

(১) সহীহ বুখারী: (৬৩৫৫)।

পঞ্চম অধ্যায়:

নবী সাঃ-এর যুদ্ধসমূহ

নবী সাঃ-এর গাযওয়া তথা যুদ্ধসমূহ:

শিক্ষক: 'গাযওয়া' বলা হয় সেসব যুদ্ধকে যেগুলোতে নবী সাঃ অংশ গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে 'সারিয়্যা' হল যেগুলোতে তিনি অংশ গ্রহণ করেননি, বরং কোন সাহাবীকে সেনাপতি করে পাঠিয়েছেন।

মদিনায় হিজরত করার পূর্বে রাসূল সাঃ-কে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়নি। বরং হিজরতের পর তাকে এটার অনুমতি দেয়া হয়েছিল।[১] আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ।

ছাত্র: জিহাদ কেন উস্তাদ?

শিক্ষক: স্নেহের ছাত্ররা সুন্দর প্রশ্ন করেছো; সংঘটিত জুলুম অথবা দ্বীনের শত্রুদের দ্বারা সম্ভাব্য অন্যায় প্রতিহত করতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদদের মাধ্যমে কাফেরদের অনিষ্টতা দূরীভূত করেন যা নবী সাঃ-এর গাযওয়া ও সারিয়্যা থেকে বিষয়টি তোমাদের নিকট স্পষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ। বস্তুত তা ছিল শত্রুদের ষড়যন্ত্র মোকাবেলার জন্য, কারো উপর সীমালঙ্ঘন বা জুলুমের উদ্দেশ্যে নয়।

ইসলাম মোটেও জুলুম চায় না, বরং তা থেকে নিষেধ করে এবং মানুষের উপর অত্যাচার করা ও তাদের সম্পদ হরণের লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ وَلَا تَعۡتَدُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُعۡتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠]

(১) যাদুল মাআদ: (৩/৭১)।

অর্থ: [আর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমালংঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।] সূরা আল-বাকারা: ১৯০।

ছাত্র: ইসলাম খুবই সুন্দর ধর্ম; এটা সীমালংঘনকারীদেরকে ভালবাসে না।

শিক্ষক: হ্যাঁ, ইসলাম তার নৈতিকতা, আদেশ ও নিষেধ বিষয়ে খুবই চমৎকার একটি ধর্ম। এ বিষয়টি তোমরা বিভিন্ন গাযওয়া ও সারিয়্যা থেকে জানতে পারবে। ইসলাম সীমালঙ্ঘনকারীদের এবং যারা অন্যের অধিকার হরণ করে বাড়াবাড়ি ও অন্যায় করে তাদেরকে কোনভাবেই পছন্দ করে না।

ছাত্র: নবী সাঃ কতগুলো গাযওয়া তথা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন?

শিক্ষক: নবী সাঃ (২৭) সাতাশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া তিনি (৪৭) সাতচল্লিশটি সারিয়্যা/যুদ্ধে সেনাপতি নির্ধারণ করে পাঠিয়েছিলেন।

যেহেতু গাযওয়া ও সারিয়্যার সংখ্যা অনেক, তাই আমরা বিশেষ কয়েকটি সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

বদরের যুদ্ধ:

শিক্ষক: সিরিয়া থেকে মক্কায় আগমণকারী যে কাউকে মদিনার মধ্য দিয়ে বা এর আশপাশ দিয়ে আসতে হতো।

যখন কুরাইশরা নবী সাঃ ও তার সাহাবীদের উপর নির্যাতন করেছিল, এমনকি এ কারণে তারা মক্কা ছেড়ে চলে আসেন এবং তাদের অর্থ-সম্পদ, পরিবার ও তাদের মালিকানাধীন বাড়িঘর ছেড়ে যান। তখন মুসলিমরা কুরাইশদের বাণিজ্য মদিনার মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করেছিল, যাতে তারা তাদের সাথে যা ঘটেছিল তার বিনিময়ে তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করবে।

মুসলমানরা যখন জানল যে, সিরিয়া থেকে কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কাফেলা আসছে, তখন নবী সাঃ বললেন: (এটি কুরাইশদের কাফেলা, এতে তাদের অর্থ-সম্পদ রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর দিকে এগিয়ে যাও।)[১]

তারপর মুসলমাগণ বদর অভিমুখে রওনা হল, ঐ স্থান দিয়েই কুরাইশদের কাফেলা অতিক্রম করছিল।

তখন নবী সাঃ, আলী বিন আবু তালেব ও আবু লুবাবা রাঃ একটি উটে পালাক্রমে চড়ে গিয়েছেন। অবশেষে তারা বদর প্রান্তরে পৌঁছেন।

ছাত্র: আল্লাহর শপথ, উস্তাদ এটা তো খুব কষ্টসাধ্য ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, কষ্টসাধ্য ছিল বটে, তবে তা আল্লাহর রাস্তায় করতে হয়েছে; যাতে ইসলামের প্রচার হয় এবং মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে। এ থেকে হয়তো আমরা এ নির্দেশনা পেতে পারি যে, আমরা এই দ্বীনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করব, সবকিছু ধৈর্য্যশীল হব এবং শিক্ষা অর্জনের কষ্ট সহ্য করব; যাতে আমরা সকল ক্ষেত্রে ও বিষয়ে আমাদের ধর্ম ও জাতির সেবকে পরিণত হতে পারি।

ছাত্র: উস্তাদ, কুরাইশদের কাফেলার কী অবস্থা হল?

শিক্ষক: কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার নেতা ছিলেন আবু সুফিয়ান- এটা তার ইসলাম গ্রহণের আগের ঘটনা। তিনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। যেহেতু তিনি মদিনার মুসলমানদের খবর জিজ্ঞেস করতেন এবং অবশেষে জানতে পারেন যে, তারা কুরাইশদের ব্যবসার মালামাল দখল নিতে চায়। তাই তিনি যমযম বিন আমর গাফারী

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: (২/২৫৭-২৫৮)।

নামে এক ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠালেন, যাতে সে বিষয়টি তাদের অবহিত করে এবং বদর অঞ্চলে তাদেরকে আসতে বলে।[১]

ছাত্র: উস্তাদ, সে কি বদরে পৌঁছার পর কুরাইশদের কাছে খবর পাঠিয়েছিল?

শিক্ষক: না, সে মদিনার পথে থাকাবস্থায়ই খবর পাঠিয়েছিল; যাতে কুরাইশরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বদরে পৌঁছতে পারে।

ছাত্র: আবু সুফিয়ানের পরিকল্পনা কি মুসলমানরা টের পেয়েছিল?

শিক্ষক: না, আবু সুফিয়ান যে যমযমকে মক্কায় নিজ সম্প্রদায়ের কাছে খবর দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিল তা মুসলমানগণ জানতে পারেননি।

এদিকে নবী সাঃ কিন্তু যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বের হননি। বরং শুধুমাত্র কুরাইশ কাফেলাকে পাকড়াও করার জন্য বের হয়েছিলেন। মুসলিমদের সংখ্যা ছিল মোটে তিনশ উনিশ জন।

ছাত্র: ভয়াবহ পরিস্থিতি। যমযম কি তাড়াতাড়ি কুরাইশদের কাছে পৌঁছতে পেরেছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, যমযম খুব দ্রুত মক্কায় পৌঁছে যায়; ঘটনা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে। ফলে কুরাইশ তাদের গণ্যমান্য ও নেতৃবর্গদের নিয়ে বিশাল বাহিনী গঠন করে রওনা হয়। আবু লাহাব ছাড়া সবাই তাতে অংশ নেয়। উল্লেখ্য যে, যারা মক্কায় নবী সাঃ ও তার সাহাবীদেরকে নির্যাতন করতো তারা সবাই এ বাহিনীর সাথে রওনা হয়।[২]

ছাত্র: মুসলমানরা কি কুরাইশদের আগমণের খবর জানতে পেরেছিল, যাতে তারা প্রস্তুত হতে পারে?

---

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: (২/২৫৮)।

(২) সিরাতে ইবনে হিশাম: (২/২৬১)।

শিক্ষক: হ্যাঁ, নবী সাঃ জানতে পারেন যে, কুরাইশরা বদরের দিতে আসছে। তাই তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। তারা বললেন: ভাল।

সাহাবীদের মধ্য থেকে আবু বকর, উমর ও মিকদাদ রাঃ মূল্যবান পরামর্শ দিলেন। তারা সবাই কুরাইশদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে একমত পোষণ করেন। নবী সাঃ যখন বদর প্রান্তরে উপস্থিত হলেন তখন কয়েকজন সাহাবীকে বদরের ঝর্ণাধারের সন্নিকটে পাঠালেন কুরাইশদের খবরাখবর নেবার জন্য। তারা সেখানে তাদের দু'জন ব্যক্তিকে দেখতে পেল। এদের মাধ্যমে নবী সাঃ কুরাইশদের অবস্থান জানতে পারলেন যে, তারা উপত্যকার শেষপ্রান্তে টিলার অপর পার্শ্বে মক্কার দিক হয়ে শিবির গেড়েছে। আর মুসলমানরা ছিল উপত্যকার নিকট প্রান্তে মদিনার দিক হয়ে।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাঃ তাদের দুজনকে কুরাইশ বাহিনীর সংখ্যা জিজ্ঞেস করলেন, তারা বলল: সঠিক সংখ্যা জানি না, তবে তারা অনেক। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারা দৈনিক কয়টা উট জবাই করে? তারা বলল, কোনদিন নয়টা আবার কোনদিন দশটা। তখন রাসূলুল্লাহ সাঃ বললেন, তাহলে ওদের সংখ্যা নয়শত থেকে হাজারের মধ্যে হবে।

ছাত্র: নবী সাঃ তাদের সংখ্যা কীভাবে আন্দাজ করলেন?

শিক্ষক: সুন্দর প্রশ্ন। নবী সাঃ জানতেন যে, একটি উট প্রায় ১০০ জনের খাদ্য হিসেবে যথেষ্ট। যেহেতু তারা দিনে দশটি উট জবাই করে, এর অর্থ হল দশটি উট এক হাজার মানুষের জন্য যথেষ্ট এবং নয়টি উট নয়শত লোকের জন্য যথেষ্ট। সুতরাং তাদের সংখ্যা নয়শত থেকে এক হাজার লোকের মধ্যে।

বস্তুত এটি নবী সাঃ-এর বিচক্ষণতা, কারণ তিনি বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এ রেজাল্টে পৌঁছেছিলেন। এ থেকে আমরা সঠিক চিন্তাভাবনা করার শিক্ষা নিতে পারি- যা দ্বারা আমরা আমাদের নানা ক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয় উদঘাটন করতে পারব। তাছাড়া

আমাদের বিবেক-বুদ্ধির বিকাশের বিষয়ে আমাদের যত্ন নেওয়া উচিত এবং এটাকে কল্যাণ ও জ্ঞানের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত।

ছাত্র: খুব সুন্দর পাঠ ও শিক্ষা যা আমরা নবী সাঃ এর নিকট থেকে শিখতে পেলাম। কিন্তু মুসলমানগণ কি এত বিশাল সংখ্যক কুরাইশ বাহিনীকে দেখে ঘাবড়ে যাননি? তাদের সংখ্যা তো নগণ্য ছিল?

শিক্ষক: না, মুসলমানগণ এতে ভয় পায়নি। কারণ নবী সাঃ তাদেরকে বিজয় অর্জনের বিষয়ে সুধারণা পোষণের ধারণা দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন: (মক্কা তার কলিজার টুকরাগুলোকে তোমাদের সামনে নিক্ষেপ করেছে।)[১] এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল: মক্কার উঁচু শ্রেণীর ও নেতৃস্থানীয় লোকগুলো সকলে এসেছে এবং তারা তোমাদের সামনে। এ কথায় তাদেরকে পরাজিত করার একটি সুধারণা-মূলক সুক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে। পাশাপাশি সাহাবীদের সাহসিকতা ও রবের প্রতি তাদের আস্থা ছিল। তাছাড়া তারা ছিলেন নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর সাথে। ফলে এসব বিষয় তাদের হৃদয়কে বিশ্বাসে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল।

ছাত্র: তাহলে মনে হচ্ছে সুধারণা পোষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে কঠিন পরিস্থিতিতে। তাই কেউ অসুস্থ হলে তার সুস্থ হওয়ার বিষয়ে সুধারণা রাখতে হবে; যাতে চিকিৎসা নিয়ে উপকৃত হয় এবং আরোগ্য লাভের আশা করতে পারে। একজন ছাত্র তার পড়ালেখায় মুখস্ত ও বুঝ শক্তির বিষয়ে শুভ ধারণা রাখবে; যাতে সে কৃতকার্য হতে উদ্দীপনা পায়। পক্ষান্তরে যে দাবি করে যে, সে বুঝে না বা তার মুখস্ত হয় না; সে মূলত নিজেকে দুর্বল ভাবে, তাই এমনটি হয়ে থাকে।

---

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: (২/২৬১)।

ছাত্র: কুরাইশদের ব্যাপারে উক্ত তথ্যগুলো পাবার পর নবী সাঃ কী করলেন?

শিক্ষক: তথ্যগুলো জানার পর নবী সাঃ দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বারস্ত হলেন। আমাদেরও উচিৎ এরূপ সুধারণা পোষণের পাশাপাশি দোয়া করা; তারপর কাজে নেমে পড়া ও সাধনা করা- যেমনটি নবী সাঃ করেছেন। উমর বিন খাত্তাব রাঃ বলেন: **(বদরের দিন রাসূল সাঃ মুশরিকদের দিকে তাকালেন, তারা ছিল সংখ্যায় এক হাজার। আর তার সঙ্গীদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশত উনিশ জন। তারপর আল্লাহর নবী কেবলামুখী হলেন, দু'হাত প্রসারিত করে স্বীয় রবের নিকট মিনতি করে বলতে লাগলেন: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা দেয়ার ওয়াদা করেছেন তা দিন ....)** সহীহ মুসলিম।

ছাত্র: কুরাইশদের বাণিজ্যিক কাফেলা যাদের সাথে ব্যবসায়িক পণ্য ছিল, কুরাইশ বাহিনীর আগমনের পরে তারা কী করেছিল?

শিক্ষক: সুন্দর, তোমরা তো ঘটনাপ্রবাহ ঠিকভাবেই খেয়াল রাখছো। আবু সুফিয়ান যখন জানতে পারল যে, মুসলমানগণ তাদের কাফের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন সে পথ পরিবর্তন করে বাণিজ্য কাফেলাকে তীরবর্তী রাস্তার দিকে নিয়ে যায় এবং মুসলমানগণ তাদেরকে আর ধরতে পারেনি।

কিন্তু এর মধ্যে ছিল মহান প্রজ্ঞা ও বিরাট লাভ; মুসলমানদের সেই বাণিজ্য কাফেলা হাতছাড়া হওয়া এবং শত্রুর সাথে মুখোমুখি হওয়াতে, যেমনটা পরে তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ছাত্র: সুন্দর! কুরাইশদের বাণিজ্যিক মালামাল অর্জনের কল্যাণের চেয়ে শত্রুর মোকাবেলায় মুসলমানদের বেশি কল্যাণ নিহিত ছিল। কারণ, মহান আল্লাহ আমাদের জ্ঞানের চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন।

শিক্ষক: সুন্দর, তোমরা চমৎকারভাবে বুঝতে পাচ্ছ, তাই ঘটনা প্রবাহ আমি তোমাদেরকে খুলে বলছি:

শত্রুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাথে মিলে যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা এক হাজার ফেরেশতা প্রেরণ করেন।

ছাত্র: মাশাআল্লাহ! তাহলে তো আল্লাহর ইচ্ছায় এটা মুসলিমদেরকে বিজয়ী করবে।

শিক্ষক: নবী সাঃ ও মুসলমানগণ আল্লাহর নিকট দোয়া করার পর তিনি তাদের উপর ফেরেশতা নাযিল করেন। এ মর্মে আল্লাহ মুসলিমদের উদ্দেশ্যে বলেন:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ [الأنفال: ٩]

অর্থ: [স্মরণ কর সেই মুহূর্তের কথা, যখন তোমরা তোমাদের রবের নিকট কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলে, আর তিনি সেই প্রার্থনা কবুল করে বলেছিলেন: নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করব, যারা একের পর এক আসবে।] সূরা আল-আনফাল: ৯।

ছাত্র: উস্তাদ, মুসলমানরা কি ফেরেশতাদেরকে যুদ্ধ করতে দেখেছেন?

শিক্ষক: হয়তো সরাসরি তারা ফেরেশতাদেরকে যুদ্ধ করতে দেখেননি, কিন্তু যুদ্ধে তাদের অংশ গ্রহণের আলামত ও চিহ্ন তারা দেখতে পেয়েছিলেন। বদরের দিন নবী সাঃ বলেছেন: **(এই তো জিবরীল, সমর সাজে সজ্জিত হয়ে তার ঘোড়ার মাথায় হাত রেখে আছেন।)** সহীহ বুখারী। এ হাদিস থেকে বুঝা যায় যে, নবী সাঃ জিবরীল আঃ-কে দেখেছেন। আরেক হাদিসে এসেছে যে, জনৈক মুসলিম সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে তার সামনের এক মুশরিককে আঘাত করতে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু এমন সময় তিনি তার উপর দিক থেকে বেত্রাঘাতের শব্দ শুনতে পেলেন এবং এক আশ্বারোহীকে বলতে শুনলেন, হে হায়যুম (ঘোড়াটির নাম) সামনের দিকে অগ্রসর হও। তারপর মুসলিম ব্যক্তিটি ঐ কাফের ব্যক্তিকে দেখেন যে, সে সামনে চিৎ হয়ে পড়ে আছে! উক্ত সাহাবী নবী সাঃ-কে ঘটনাটি খুলে বললেন। শুনে রাসূল সাঃ বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। এ সাহায্য

আসমান থেকে এসেছে।” তার মানে ফেরেশতারা মুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করেছে।

আর এভাবেই বদরের যুদ্ধে মুসলিমগণ মুশরিকদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে।

ছাত্র: সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ কত মহান! তিনিই আসমান থেকে ফেরেশতা পাঠিয়েছেন যাতে তারা নবী সাঃ ও সাহাবীদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

শিক্ষক: বরং আরো আশ্চর্যের বিষয় হল যে, নবী সাঃ যুদ্ধের আগেই কুরাইশ কাফেরদের কয়েক জনের নিহত হওয়ার স্থান সাহাবীদেরকে বলে দেন। তিনি বলেছেন: এটা অমুকের মৃত্যুস্থল, এটা অমুকের ধরাশয়ী হওয়ার স্থান- এ বলে তিনি মাটিতে হাত রাখছিলেন। আনাস রাঃ বলেন: রাসূল সাঃ যে স্থানে যার নাম নিয়ে হাত রেখেছিলেন, সেখানেই তার মৃত্যু হয়েছে, সামান্যও ব্যতিক্রম হয়নি।[১]

ছাত্র: আল্লাহু আকবার, নিঃসন্দেহে এটা নবী সাঃ-এর একটি মুজেযা।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আল্লাহই তাঁর নবীকে অহির মাধ্যমে তা জানিয়েছেন, যেমনভাবে তিনি ফেরেশতাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের খবর জানিয়েছিলেন।

আবু জাহল ও উমাইয়া বিন খালফ সহ যারা রাসূল সাঃ-কে কষ্ট দিত ও নির্যাতন করত তারা এ যুদ্ধে নিহত হয়। নিহতদের সংখ্যা ছিল (৭০) সত্তর জন।

রাসুল সাঃ কুরাইশদের সবচেয়ে কট্টর কাফেরদের মধ্যে চব্বিশজনকে একটি বিধ্বস্ত ও দূষিত কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। বাকিদেরকে অন্য জায়গায়।[২]

---

(১) সহীহ মুসলিম: (১৭৭৯)।

(২) ফতহুল বারী: (৭/৩০২)।

আর যাদেরকে বন্দী হিসাবে নিয়ে আসা হয় তাদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন। নবী সাঃ তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়েছিলেন, এবং যে ব্যক্তি মুক্তিপণ দিতে অক্ষম ছিল তাকে মুসলিম শিশুদেরকে পড়তে ও লিখতে শেখানোর পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ছাত্র: উস্তাদ, মুসলমানদের কেউ কি এ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন?

শিক্ষক: এই যুদ্ধটিকে মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ গণ্য করা হয়। এ যুদ্ধে বিজয়ের অনেক উপকারিতা ছিল যা কুরাইশ বাণিজ্য লাভের চেয়ে উত্তম ছিল।

- মুসলিমরা কুরাইশদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের লোকদের হত্যা করে, যারা নবী সাঃ ও তার সম্মানিত সাহাবীদের নির্যাতন করত।

- আরবরা যুদ্ধের এই ফলাফল জেনেছে, ফলে তারা মুসলমানদের শক্তিমত্তা জেনে তাদেরকে ভয় ও সমীহ করতো।
- মুসলমানরা জানতে পেরেছিল যে, কিভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করেছেন, অথচ তারা সংখ্যায় কম ছিল।
- মুসলমানরা মুশরিকদের কাছ থেকে অনেক গনীমতের মাল পেয়েছিল।
- কয়েকজন মুসলিম শহীদ হয়েছিলেন। আর শহীদদের জন্য এটা বড় লাভ।

- এই বরকতময় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের জন্য একটি মহান পুরস্কার ও উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছিল। কিয়ামতের দিন বদরী সাহাবীদেরকে ক্ষমা করা হবে।

উহুদের যুদ্ধ:

শিক্ষক: বদরের যুদ্ধে কুরাইশরা পরাজিত হলে তারা আরব গোত্রগুলোর মধ্যে নিজেদের ক্ষমতা ও মর্যাদা ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠে। তাই কুরাইশরা তিন হাজার সেনা সদস্য দ্বারা বাহিনী সজ্জিত করে।

এ যুদ্ধটি হয়েছিল শাওয়াল মাসের সপ্তম তারিখ শনিবারে, মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাঃ-এর হিজরতের বত্রিশ মাস পর, অর্থাৎ হিজরতের তৃতীয় বছরে।

ছাত্র: কুরাইশদের এ পরিকল্পনা কি রাসূল সাঃ জানতে পেরেছিলেন?

শিক্ষক: হ্যাঁ, নবী সাঃ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য কুরাইশদের মক্কা থেকে মদিনায় আগমণের কথা জানতে পারেন। তাই মহানবী সাঃ তার সাহাবীদের সাথে যুদ্ধে বের হওয়া বা মদিনায় অবস্থান করার বিষয়ে পরামর্শ চান।

এখানে লক্ষ্যনীয় যে, নবী সাঃ সাহাবীদের নিকট পরামর্শ করেন, তিনি একাকি কোন সিদ্ধান্ত নেননি। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে সমাজের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে একে অপরের সাথে আচরণ করতে হয়। আমরা তার পদ্ধতি থেকে সম্মিলিত বিষয়ে পরামর্শ করতে এবং একা সিদ্ধান্ত না নেওয়ার বিষয়টি শিখতে পাই।

ছাত্র: নবী সাঃ ছিলেন অতি বিনয়ী এবং সাহাবীদেরকে তিনি সম্মান করতেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, নবী সাঃ নম্র ছিলেন এবং তার সাহাবীদের শ্রদ্ধা করতেন ও তাদের ভালোবাসতেন। তাই আমাদের অবশ্যই তার মতো নম্র হতে হবে এবং আমাদের বন্ধুদেরকে শ্রদ্ধা করতে হবে, তাদের ভালোবাসতে হবে ও তাদের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করতে হবে।

ছাত্র: উস্তাদ, তারপর কী ঘটল?

শিক্ষক: রাসূল সাঃ মুসলিম বাহিনীকে প্রস্তুত করলেন; তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার সাহাবী। অপর পক্ষে মুশরিকদের সংখ্যা তিন হাজার।

ছাত্র: মুশরিকদের তুলনায় মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা নগণ্য ছিল?

শিক্ষক: ঠিক বলেছ। কিন্তু আল্লাহ তো মুসলিমদের তাদের সংখ্যাধিক্যতার কারণে বিজয় দেন না। বরং ঈমান ও তাদের ধৈর্যের কারণে তাদেরকে সাহায্য করেন। আল্লাহই

বলেছেন যে, ধৈর্যশীল বিশ জন মুসলিম দুই'শ জনের উপর বিজয় লাভ করবে। আর ধৈর্যশীল একশ জন মুসলিম এক হাজার অমুসলিমের উপর আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় লাভ করতে পারবে। এ মর্মে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ عَلَى ٱلۡقِتَالِۚ إِن يَكُن مِّنكُمۡ عِشۡرُونَ صَٰبِرُونَ يَغۡلِبُواْ مِاْئَتَيۡنِۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٞ يَغۡلِبُوٓاْ أَلۡفٗا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَفۡقَهُونَ﴾ [الأنفال: ٦٥]

অর্থ: *[*তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দু'শ জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে এক'শ জন থাকলে এক হাজার কাফিরের উপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই।*]* সূরা আল-আনফাল: ৬৫।

ছাত্র: এটি মুসলমানদের জন্য আল্লাহর দয়া যে, তাদের ধৈর্যের মধ্যে তাদের শক্তি নিহিত রয়েছে। উস্তাদ, এটা ধৈর্যের গুরুত্বের প্রমাণ বহন করে, তাই না?

শিক্ষক: হ্যাঁ, ঠিক বুঝেছ।

ছাত্র: তারপর কী হল?

শিক্ষক: নবী সাঃ সৈন্যবাহিনী নিয়ে উহুদ পাহাড়ের দিকে রওনা হলেন। পথিমধ্যে আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল এক তৃতীয়াংশ লোক নিয়ে মদিনায় ফিরে আসে।

ছাত্র: সে এই মারাত্মক কাজটি কেন করল?

শিক্ষক: সে সময় অনেক মুনাফিক ছিল। আর মুনাফিক সে যে ইসলামকে প্রকাশ করে এবং কুফুরী গোপন করে, অর্থাৎ তার মধ্যে কুফুরী লুকায়িত রাখে। তাদের মধ্যে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই বিন সালুল অন্যতম। তবে আল্লাহর অনুগ্রহে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈমান নিয়ে মুসলিম বাহিনীতে ফিরে আসে।

মুসলমানদের সাথে কিছু তরুণ মুসলমান ছিল যারা নবী করীম সাঃ-এর সাথে অংশগ্রহণ করতে চেয়েছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজনের বয়স ছিল পনের বছরেরও কম।

ছাত্র: উস্তাদ, তারা তো ভাল সাহসী ছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, তারা সাহসী ছিল এবং রাসূল সাঃ-কে গভীরভাবে ভালবাসতো। তারা জীবন দিয়ে হলেও নবী সাঃ-কে রক্ষা করার তামান্না পোষণ করতো।

ছাত্র: নবী সাঃ তাদের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন?

শিক্ষক: নবী সাঃ যাদের বয়স পনের বছর হয়েছিল তাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন। আর যাদের বয়স তার চেয়ে কম তাদেরকে ফেরত দেন, যাতে তারা বিপদের সম্মুখীন না হয়।

ফলে নবী সাঃ সামুরা বিন জুনদুব আল-ফাজারি এবং রাফি বিন খাদিজকে অনুমতি দিয়েছিলেন, যাদের বয়স ছিল পনের বছর। পক্ষান্তরে উসামা বিন যায়েদ, আবদুল্লাহ বিন ওমর বিন খাত্তাব, যায়েদ বিন সাবিত, বারা বিন আযেব, আমর বিন হাযম এবং উসাইদ বিন জহীর প্রমূখকে ফেরত দেন। তবে যখন তারা পনের বছর বয়সে পদার্পণ করেছিল তখন তিনি তাদের খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন।

ছাত্র: উস্তাদ, তারপরে কী ঘটেছিল?

শিক্ষক: উহুদ পর্বতের প্রান্তরে মুসলমানগণ মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। সেখানে উহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে একটি ছোট উঁচু পাহাড় ছিল। নবী সাঃ সেখানে কয়েকজন তীরন্দাজ মোতায়েন করেন এবং তাদেরকে ঐ পাহাড় ত্যাগ করতে নিষেধ করেন- এমনটি মুসলিমদের অথবা মুশরিকদের বিজয় হলেও। তারপর থেকে ঐ পাহাড়কে 'জাবালে রুমা' নামে ডাকা হয়।

ছাত্র: উস্তাদ, এর কারণ কি আমরা জানতে পারি?

শিক্ষক: হ্যাঁ, অবশ্যই। এ পাহাড়টির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম; কেননা তা থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের উপর নজরদারি করা যেত, উভয় বাহিনীই এ পাহাড়ের নীচে অবস্থান করছিল। ফলে তীরন্দাজ বাহিনী সহজেই এ পাহাড়ের উপর থেকে শত্রু পক্ষের উপর তীর নিক্ষেপ করতে পারত। তাছাড়া সেখানে তীরন্দাজ বাহিনীর উপস্থিতি মুশরিকদেরকে যুদ্ধের ময়দানের এ গুরুত্বপূর্ণ অংশে আসতে বাধাগ্রস্ত করবে।

ছাত্র: নবী সাঃ-এর চয়েজ খুব চমৎকার ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আল্লাহর তাওফীকে এটা খুব সুন্দর চয়েজ ছিল। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলিমগণ বিজয় লাভ করেছিল। কিন্তু যখন তীরন্দাজ বাহিনী দেখল যে, মুসলিমরা জয় লাভ করেছে, তারা নীচে নেমে আসল। এ সুযোগে তৎকালীন মুশরিক বাহিনীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ পেছন দিক থেকে ঐ পাহাড়ের কাছে চলে আসে এবং পাহাড়ের উপর থেকে মুসলিমদের উপর তীর নিক্ষেপ করে আঘাত করতে থাকে। ইবনে আব্বাস রাঃ বলেন: "যখন তীরন্দাজ বাহিনী ঐটাকে ফাঁকা করে চলে আসল, অর্থাৎ পাহাড় ছেড়ে চলে আসল, তখনই শত্রুর অশ্ববাহিনী ঐখান দিয়ে সাহাবীদের উপর অতর্কিত হামলা চালালো এবং বহু মুসলিম শহীদ হলেন।"[১]

ছাত্র: এ থেকে যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে উক্ত পাহাড়ের গুরুত্ব বুঝা যায়।

শিক্ষক: হ্যাঁ, পাহাড়টি গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আর তাই নবী সাঃ তাদেরকে পাহাড় ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন, এমনকি মুসলিমরা বিজয় লাভ করলেও। নবী সাঃ কথা মেনে চলার গুরুত্বও এ থেকে বুঝা যায় এবং তা অমান্য করা সর্বক্ষেত্রে পরাজয়ের কারণ, চাই তা পার্থিব বিষয়ে হোক বা পরলৌকিক বিষয়ে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ সকল বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা; যাতে

(১) ফতহুল বারী: (৭/৩৫০-৩৫১)।

সে জীবনে সফলতা অর্জন করতে পারে। অনুরূপভাবে প্রত্যেক দল বা বাহিনীর উচিৎ দলপতি বা সেনাপতির নির্দেশনা মেনে চলা; যাতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কৃতকার্য হওয়া যায়।

ছাত্র: উস্তাদ, তারপর কী হল?

শিক্ষক: এ যুদ্ধে নবী সাঃ আহত হন, তার সামনের দাঁত ভেঙ্গে যায়, শরীর থেকে রক্ত ঝরে; রাসূল সাঃ-এর কন্যা ফাতিমা রাঃ এসে নিজ পিতার শরীর থেকে রক্ত ধুয়ে পরিস্কার করেছেন এবং তার স্বামী আলী বিন আবু তালেব রাঃ পানি ঢেলে দিয়েছেন। বেশ কয়েকজন সাহাবী মিলে রাসূল সাঃ-কে তীরের আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঘিরে রেখেছিলেন। তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন শাহাদত বরণ করেন। তারা সবাই আনসারী সাহাবী ছিলেন।

ছাত্র: নবী সাঃ-এর সাথে এমনটি ঘটে যাওয়া নিঃসন্দেহে বড় মসিবত ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটা ছিল বিশাল মসিবত যাতে নবী সাঃ ও তার সাহাবীগণ আক্রান্ত হয়েছিলেন। এমনকি তখন মুসলিমদের মাঝে গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, নবী সাঃ-কে হত্যা করা হয়েছে! ফলে এটা যুদ্ধের ময়দানে মুসলমানদেরকে আরো দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল।

পরাজয়, হত্যা, নবী সাঃ-এর আহত হওয়া এবং তার মৃত্যুর গুজব সহ মুসলমানদের উপর একটি বড় বিপর্যয় নেমে আসে। গুজবের বিষয়টি ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। কিন্তু এই ঘটনায় আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্য এবং আমাদের জন্য উপদেশ ও শিক্ষা রেখেছেন। সেই যুদ্ধে যে শিক্ষা হয়েছিল তা থেকে তোমরা আজ উপকৃত হচ্ছ এবং সাহাবায়ে কেরাম সেই বিষয়টি থেকে উপকৃত হয়েছেন।

এত কিছুর পর, মুসলমানরা যখন জানতে পারল যে, নবী সাঃ জীবিত আছেন; তারা এতে চরম আনন্দিত হয় এবং হত্যা, ক্ষত এবং তাদের উপর যে সমস্ত বিপদ নেমে

এসেছিল তা ভুলে গিয়েছিল। ফলে নবী সাঃ-এর জীবনটাই ছিল তাদের জন্য গণীমত যা নিয়ে মুসলমানরা মদিনায় ফিরে এসেছিল।

ছাত্র: হ্যাঁ, এগুলো ছিল একই সাথে ভীতিকর, দুঃখজনক, বেদনাদায়ক এবং আনন্দদায়ক পরিস্থিতি। কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে রক্ষা করেছিলেন এবং তিনি মদিনায় ফিরে আসেন।

শিক্ষক: মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন:

﴿وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحۡزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلۡأَعۡلَوۡنَ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١٣٩ إِن يَمۡسَسۡكُمۡ قَرۡحٞ فَقَدۡ مَسَّ ٱلۡقَوۡمَ قَرۡحٞ مِّثۡلُهُۥۚ وَتِلۡكَ ٱلۡأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيۡنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعۡلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمۡ شُهَدَآءَۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٤٠ وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمۡحَقَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ١٤١ أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَعۡلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ مِنكُمۡ وَيَعۡلَمَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٤٢﴾ [آل عمران: ١٣٩-١٤٢]

অর্থ: [তোমরা হীনবল হয়ো না এবং চিন্তিতও হয়ো না; তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও।* যদি তোমাদের আঘাত লেগে থাকে, অনুরূপ আঘাত তো ওদেরও লেগেছে। মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আমি এ দিনগুলোর আবর্তন ঘটাই, যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যককে শহীদরূপে গ্রহণ করতে পারেন। আর আল্লাহ যালেমদেরকে পছন্দ করেন না।* আর যাতে আল্লাহ পরিশুদ্ধ করেন ঈমানদারদেরকে এবং ধ্বংস করে দেন কাফিরদেরকে।* তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কে ধৈর্যশীল তা এখনো প্রকাশ করেননি?] সূরা আলে ইমরান: ১৩৯-১৪২।

অতএব, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে চিন্তিত ও হীনবল হতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের বলেছেন যে, তারাই কাফেরদের উপর বিজয়ী হবে। আর তাদের মধ্যে যেমন আহত বা নিহত হয়েছে- ইতিপূর্বে তেমন তো মুশরিকদের উপরও হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, জয় ও পরাজয় পালা বদল করে ঘটে থাকে। তাছাড়া মহান আল্লাহ চান এমন মৃত্যুর মাধ্যমে সাহাবীদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তিকে শহীদরূপে গ্রহণ করতে। এ যুদ্ধে নবী সাঃ-এর চাচা হামযা, মুসআব বিন উমাইর এবং অন্যান্য বেশ কিছু সাহাবী শাহাদাত বরণ করেছেন। শহীদদের সংখ্যা ছিল সত্তর জন।[১]

বনু নাযিরের যুদ্ধ:

শিক্ষক: বনু নাযির ও বনু কুরায়যা সহ কিছু আরব ইহুদি মদিনায় বসবাস করত। নবী সাঃ ইহুদীদের সাথে একটি চুক্তিপত্র লিখেছিলেন, যেমনটি আমরা আগেই জেনেছি। এ চুক্তিপত্রটি তাদের শালীন জীবন এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার নিশ্চিত করে। এতদসত্ত্বেও, তারা বারবার চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।

ছাত্র: উস্তাদ, তারা কেন বারবার চুক্তি ও অঙ্গিকার ভঙ্গ করেছিল?

শিক্ষক: কারণ, তারা হৃদয়ে নবী সাঃ-এর প্রতি হিংসা পোষণ করত। তাই তারা নবী সাঃ-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেষ্টা করেছে। নবী সাঃ তাদের কাছে দুই ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধের জন্য সহায়তা চেয়েছিলেন এবং তারা বলেছিল, "আমরা আপনাকে সাহায্য করব।" তাই নবী সাঃ তাদের কাছে এসে তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে বসলেন। এদিকে তারা ঐ বাড়ির উপর থেকে তার উপর পাথর ফেলে হত্যা করার

[১] সহীহ বুখারী: (৪০৭৯)।

পরিকল্পনা করে। কিন্তু সুমহান আল্লাহ তাঁর নবীর কাছে তাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করে দেন। সুতরাং, তিনি সেখান থেকে চলে আসলেন।[১]

ছাত্র: আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহই আমাদের নবী সাঃ-কে তাদের ষড়যন্ত্র ও গাদ্দারী থেকে হেফাযত করেছেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আল্লাহই তাঁর নবীকে সাহায্য ও হেফাযত করেছেন। তাই আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা ও সাহায্য কামনা করা। কেননা তিনিই বান্দাদেরকে অকল্যাণ থেকে হেফাযতকারী।

একবার কুরাইশরা ইহুদিদের হুমকি দিয়েছিল যে, তারা নবী সাঃ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করলে কুরাইশরা তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে...! ইহুদীদের উচিত ছিল বিষয়টি নবী সাঃ-কে অবহিত করা। কিন্তু তারা কুরাইশদের অনুরোধে রাজি হল এবং নবী সাঃ-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে উদ্যত হল। তবে নবী সাঃ তা টের পেয়ে গেলেন এবং বনু নাযিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে মদিনা থেকে বের করে দিলেন। ফলে তারা খায়বারে আশ্রয় নিল এবং কিছু সংখ্যক সিরিয়ায় চলে গেল।[২]

ছাত্র: বনু কুরায়যার কী পরিণতি হয়েছিল, নবী সাঃ কি তাদের ছেড়ে দিয়েছিলেন?

শিক্ষক: না, তিনি তাদেরকে ছেড়ে দেননি, বরং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন যে, তারা বিশ্বাসঘাতকতা বা যুদ্ধ করবেন না। ফলে তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং তিনি তাদের ছেড়ে চলে আসলেন। কিন্তু তারা সেই চুক্তির সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তাই নবী সাঃ তাদের বিরুদ্দে যুদ্ধ করেছিলেন। অচিরেই এর ব্যাখ্যা আসবে, ইনশাআল্লাহ।

---

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: (৩/১৯৯-২০০)।

(২) সিরাতে ইবনে হিশাম: (৩/২০১)।

ছাত্র: এমন করুণ পরিণতি তাদের প্রাপ্য ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এমন নিকৃষ্ট পরিণতি তাদের প্রাপ্যই ছিল। বিশেষ করে যেহেতু নবী সাঃ তাদেরকে কোন বিষয়েই নির্যাতন করেননি, বরং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন- তারপরও তারা তার সাথে গাদ্দারী করেছিল। তোমরাও লক্ষ্য করেছ যে, নবী সাঃ কারো প্রতি কখনো আক্রমণ করেননি। বরং কাফেরদের থেকেই যুদ্ধের কারণগুলোর সূচনা হয়েছে- যেমনটি তোমাদের কাছে আগে স্পষ্ট হয়েছে এবং আসন্ন যুদ্ধের ঘটনা থেকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

খন্দক/আহযাবের যুদ্ধ:

শিক্ষক: আহযাবের যুদ্ধ হিজরী পঞ্চম সালে সংঘটিত হয়।[১]

এ যুদ্ধের কারণ হল: মদিনা থেকে বিতাড়িত ইহুদী গোত্র বনু নাযিরের একদল লোক এবং বুন ওয়ায়েলের একদল লোক কুরাইশদের সাথে একত্রিত হয় এবং তারা তাদেরকে নবী সাঃ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করত উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করার অঙ্গিকার ব্যক্ত করে। তারপর তারা গাতফান গোত্রের লোকজনের কাছে গিয়ে নবী সাঃ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আহ্বান জানালে তারাও সম্মতি জ্ঞাপন করে।

অবশেষে কুরাইশ তাদের সহযোগী ও অনুগত লোকদের নিয়ে বের হয়। এতে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজার; তাদের সেনাপতি ছিল আবু সুফিয়ান (তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বের ঘটনা)।[২]

এটা ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে সমর্থন ও লড়াই করার জন্য ইহুদী, মক্কার কুরাইশ ও কয়েকটি গোত্রভিত্তিক দলের ঐক্যজোট। এ জন্যই এ যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয়।

---

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: (৩/২২৪)।

(২) সিরাতে ইবনে হিশাম: (৩/২২৬)।

ছাত্র: এটা ছিল নবী সাঃ ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐক্যজোট ও সহযোগিতা। এ বিষয়টি কি নবী সাঃ জানতে পেরেছিলেন?

শিক্ষক: হ্যাঁ, তিনি জানতে পেরেছিলেন। অতঃপর তিনি সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন। সালমান ফারেসী রাঃ মদিনায় খন্দক তথা পরিখা খনন করতে পরামর্শ দেন।[১]

ছাত্র: উস্তাদ, পরিখা খনন কী?

শিক্ষক: মদিনা ছিল বহু ছোট-বড় পাথরবিশিষ্ট উঁচু উঁচু পাহাড় বেষ্টিত ভূখন্ড। সেখানে মানুষ বা পশু-প্রাণীর কারোরই স্বাচ্ছন্দ্যে চলার স্থান ছিল না। তাই কেউ সহজে চলাফেরা করতে পারত না। এ পাহাড়গুলো উত্তর-পশ্চিম দিক ব্যতীত মদিনার বাকি দিকগুলোকে বেষ্টন করে ছিল। ফলে মদিনার এই দিক ব্যতীত বাকি দিকগুলো ছিল নিরাপদ। তাই তারা এখানে পরিখা খনন করেন; অর্থাৎ দীর্ঘ ও গভীর গর্ত খনন করা হয়, যাতে এ উন্মুক্ত এলাকা দিয়ে কেউ মদিনায় প্রবেশ করতে না পারে। কেননা এ দিকে উঁচু উঁচু পাহাড় ছিল না।

ছাত্র: উস্তাদ, এটাতো বিশিষ্ট সাহাবী সালমান ফারেসী রাঃ-এর চমৎকার বুদ্ধি।

শিক্ষক: হ্যাঁ, খুব সুন্দর বুদ্ধি ও পরিকল্পনা। এটা পরামর্শের গুরুত্ব নির্দেশ করে। মানুষের উচিত শুভাকাঙ্খী ও সহকর্মীদের নিকট পরামর্শ চাওয়া। কেননা হতে পারে তাদের কারো নিকট এমন ভাবনা বা পরামর্শ রয়েছে যা সকলের জন্য মঙ্গলজনক। তাই আমরা প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের শিক্ষা নিতে পারি এবং এতে লজ্জাবোধ করব না।

---

(১) তাবাকাতুল কুবরা: (২/৬৬)।

এজন্য কুরাইশরা আসার পর এ অভিনব বিচক্ষণতাপূর্ণ কাজ দেখে হতচকিত ও অবাক হয়ে যায়!

ছাত্র: সম্মানিত উস্তাদ, তারা কিভাবে এ পরিখাটি খনন করেছিলেন?

শিক্ষক: তোমরা জান যে, প্রাচীন যুগে গভীর গর্ত খনন করার জন্য এ যুগের ন্যায় আধুনিক যন্ত্রপাতি, কম্পানি ও শ্রমিক ছিল না। বরং তারা নিজেরাই এ জাতীয় কাজ সম্পাদন করত। এ ক্ষেত্রে তারা সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করত; যেমন কোদাল ও কুড়াল, যা হাত দ্বারা খনন কাজে ব্যবহার হয়। তারা নিজেরাই মাটি কেটে গর্ত থেকে বের করে নিয়ে আসত। নবী সাঃ স্বয়ং সাহাবীদের সাথে খনন কাজ ও মাটি বহনে অংশ নিয়েছেন। তার শরীরে ধুলা-মাটি লেগেছে। তিনি সাহাবীদেরকে এ কাজের সময় উৎসাহ দিয়েছেন এবং তাদের সাথে নাশীদ গেয়ে বলেছেন: "হে আল্লাহ! আপনি দয়া না করলে আমরা হেদায়াত পেতাম না, দান-সদকা করতাম না এবং সালাত আদায়ও করতাম না।" (১)

ছাত্র: উস্তাদ, এটা কতই না সুন্দর যে, নবী সাঃ পরিখা খননে সাহাবাদের সাথে যোগদান করেছেন। তাদের সাথে সেই সুন্দর কথাগুলো নাশীদ আকারে গাওয়াও কতই না মধুর ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এ সবই সুন্দর ও বিস্ময়কর, যা আমাদেরকে দলগত কাজে নবী সাঃ-কে অনুকরণ করা এবং সবার সাথে কাজ করার গুরুত্ব শেখায়। আরো শেখায় যে, আমরা যেন এ ক্ষেত্রে অলসতা না করি, বরং অংশগ্রহণ করি ও কঠোর পরিশ্রম করি যেভাবে নবী সাঃ কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। তাছাড়া ক্লান্তি ও কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কাজের সময় নাশীদ গাওয়া জায়েজ, তবে অবশ্যই তা সুন্দর অর্থবোধক হতে হবে।

---

(১) সহীহ বুখারী: (৪১০৬)।

ছাত্র: তারা কি বাড়িতে যেতেন?

শিক্ষক: তারা কাজের সময় বাড়ি যেতেন না, তবে অতি প্রয়োজন হলে নবী সাঃ-এর অনুমতি নিয়ে যেতেন। তারপর দ্রুত ফিরে আসতেন; কেননা তারা এ কাজ থেকে আল্লাহর নিকট সওয়াব ও প্রতিদানের আশা করতেন। কিন্তু কিছু মুনাফিক ছিল যারা অল্প কাজ করে নবী সাঃ-এর কাছ থেকে লুকিয়ে তাদের পরিবারের কাছে চলে যেত।

ছাত্র: উস্তাদ, তারা কিভাবে খাওয়া দাওয়া করতেন?

শিক্ষক: তখন জীবন খুবই কঠিন ছিল, কিন্তু তাদের দৃঢ় ঈমানের কারণে তারা ক্ষুধায় ধৈর্য ধারণ করতেন। তাদের কেউ কজি ভর্তি যব নিয়ে আসত এবং তা দিয়ে তাদের জন্য খাবার তৈরি করত। বরং নবী করীম সাঃ প্রচন্ড ক্ষুধার কারণে পেটের সাথে ছোট পাথর বেঁধে রাখতেন।

অতএব, আমাদের অবশ্যই কাজের পরিস্থিতিতে ধৈর্যের গুরুত্বের কথা মনে রাখতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, নবী সাঃ এবং সাহাবায়ে কেরাম কতটা ধৈর্যশীল ছিলেন। আমাদেরকে অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে তাঁর নেয়ামতের জন্য এবং তিনি আমাদেরকে যেসব কল্যাণ, রিযিক ও নানা প্রকারের খাদ্য দিয়েছেন সে জন্য শুকরিয়া আদায় হবে।

ছাত্র: উস্তাদ, ঠিক বলেছেন; আমরা বিশাল নেয়ামতের মধ্যে আছি। তাই আমাদের আল্লাহর শুকরিয়া করা উচিত।

শিক্ষক: সে সময় নবী সাঃ-এর আরেকটি মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছিল। তা হল: যখন জাবের রাঃ দেখলেন যে, নবী সাঃ খুবই ক্ষুধার্ত এবং সাহাবীরা তিনদিন যাবত কোন খাদ্য গ্রহণ করতে পারেননি। তখন জাবের রাঃ নবী সাঃ-এর নিকট অনুমতি নিয়ে নিজের বাড়িতে গেলেন। বাড়িতে কিছু যব ছিল এবং একটি ছোট বকরী; তিনি বকরীটি জবাই করলেন এবং যব পিষলেন ও তা রান্না করলেন। তারপর তিনি নবী সাঃ-এর

নিকট এসে বিষয়টি জানিয়ে বললেন: হে আল্লাহ রাসূল, আপনি এবং এক বা দুইজন লোক আসুন।

কেননা ঐ খাবার মাত্র তিন বা চারজনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ তা সামান্যই ছিল। কিন্তু নবী সাঃ বললেন, "তা অনেক এবং ভালো।" তারপর রাসূল সাঃ তার সঙ্গে থাকা মুহাজির ও আনসার সকল সাহাবীকে বললেন: "তোমরা সবাই চল।" ফলে সবাই জাবের রাঃ-এর বাড়িতে গেলেন দাওয়াত খেতে। ... তারপর রাসূল সাঃ সাহাবীদেরকে এক এক করে পাত্র থেকে খাবার দিলেন; সবাই তৃপ্তিসহ আহার গ্রহণ করল, কিন্তু খাবার মোটেও কম পড়েনি। অথচ তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার![১]

তোমরা থেকে নবী সাঃ-এর এ মু'জিযাটি চিন্তা করে দেখ, আল্লাহই এ খাবারে বরকত দিয়েছেন; ফলে সবাই খেয়েছেন এবং খাবার মোটেও কমেনি! তাছাড়া রাসূল সাঃ বলেছিলেন: "তা অনেক এবং ভালো।" এটা ছিল শুভ ধারণার সূচনা এবং অল্প খাদ্যকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকতের আশায় বেশি মনে করা।

ছাত্র: উস্তাদ, এটা তো বিশাল ব্যাপার ছিল!

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটি একটি মহান বিষয়, তবে এটি আল্লাহর জন্য একেবারেই সহজ। তাই আমাদেরকে অবশ্যই সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আমাদের যা আছে তাতে বরকত চাওয়া উচিত। আল্লাহ যদি কোন কিছুতে বরকত দেন তবে তা বিশাল ও মহা কল্যাণকর হয়। কাজেই তোমরা স্বাস্থ্য, সময়, জ্ঞান, অর্থকড়ি সবকিছুতেই আল্লাহর কাছে বরকত চাইবে, যাতে জীবন বরকতময় হয়।

ছাত্র: খুব সুন্দর শিক্ষা, তারা অনেক ও কঠিন কষ্ট এবং সংকট সহ্য করেছেন। কিন্তু উস্তাদ, তারা কি পরিখা খনন পূর্ণ করতে পেরেছিলেন? আর কাফেররা যারা নবী সাঃ-এর সাথে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল তাদের কি হয়েছিল?

---

(১) সহীহ বুখারী: (৪১০১)।

শিক্ষক: হ্যাঁ, তারা পরিখা খনন সম্পন্ন করেছিলেন। এদিকে মুশরিক বাহিনী এসে তাদের সামনে পরিখা দ্বারা রাস্তা অবরুদ্ধ দেখতে পায়। তাদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার এবং মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল তিন হাজার। অবশেষে তারা বিশ দিনেরও বেশি সময় ধরে মদিনা ঘেরাও করে রেখেছিল। অর্থাৎ খন্দকের পাশেই অবস্থান করেছিল এবং মদিনায় প্রবেশের চেষ্টা করেছিল, নতুবা মুসলমানরা তাদের কাছে বেরিয়ে আসবে- এই আশায় ছিল। সেই সময়ে এবং সেই কঠিন পরিস্থিতিতে বনু কুরাইজা নবী সাঃ-এর সাথে তাদের অঙ্গীকার ও চুক্তি ভঙ্গ করে। তারা মদিনার আল-আওয়ালীতে বসবাস করত।

ছাত্র: এর মানে কি?

শিক্ষক: মুসলমানরা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল। আর তখন বনু কুরাইজা মদিনার অভ্যন্তরে অবস্থান করছিল; ফলে তারা মদিনার মুসলিম বাসিন্দা নারী, শিশু এবং সহায় সম্পদের উপর আক্রমণ করবে- এমন সম্ভবনা ছিল। তাই পরিস্থিতিটি ছিল খুব জটিল ও সংকটময়; একদিকে বহিরাগত শত্রু মদিনার প্রবেশদ্বারে খন্দকের কাছে অবস্থান করছে, অন্যদিকে অভ্যন্তরিন শত্রু তথা বনু কুরাইজা মদিনার ভেতরেই আছে! আল্লাহ তায়ালা এ যুদ্ধের নাম বহনকারী সূরা আল-আহযাবে মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন:

﴿إِذۡ جَآءُوكُم مِّن فَوۡقِكُمۡ وَمِنۡ أَسۡفَلَ مِنكُمۡ وَإِذۡ زَاغَتِ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَبَلَغَتِ ٱلۡقُلُوبُ ٱلۡحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا۠﴾ [الأحزاب: ١٠]

অর্থ: [যখন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল তোমাদের উপরের দিক ও নীচের দিক হতে, তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত হয়েছিল এবং তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত, আর তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে।] সূরা আল-আহযাব: ১০। যারা উপর দিক থেকে এসেছিল তারা হল বহিরাগত বিভিন্ন দল, আর

যারা নিচ থেকে এসেছিল তারা হল বনু কুরাইজা; যার ফলে মুসলিমরা এ কঠিন পরিস্থিতিতে ভয় ও উদ্বেগ অনুভব করছিল।

এ কঠিন পরীক্ষা আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, মুমিন ব্যক্তি কখনো কখনো তার ঈমানের পরীক্ষায় আক্রান্ত হবে, যেমনভাবে এ যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের পরীক্ষা নিয়েছেন। তবে অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের সাথে থাকেন, তিনি কখনই তাদেরকে কাফেরদের সামনে ছেড়ে দেন না। কিন্তু যুদ্ধের ফলাফল কী হবে তা কেবল মহান আল্লাহই জানেন। আর তাই আমাদের নবী সাঃ দোয়া করে বলেছেন: (اللهم مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الأحزابَ، اللهم اهزمهم وزلزلهم/**হে আল্লাহ, কিতাব নাযিলকারী ও তড়িৎ বিচার ফায়সালাকারী! হে আল্লাহ! তুমি শত্রুর সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করো। হে আল্লাহ! তাদেরকে তুমি পরাজিত করো এবং তাদেরকে পর্যদস্ত-বিচলিত করে দাও।**) সহীহ বুখারী।

ছাত্র: এ দোয়াটিই ছিল নবী সাঃ-এর প্রথম অস্ত্র। আমার মনে পড়ছে নবী সাঃ বদরের যুদ্ধের সময়ও দোয়া করেছিলেন, ফলে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করেছিলেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, মুমিনের প্রথম অস্ত্র হল দোয়া, যার দ্বারা তারা শত্রুর বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে জয় লাভ করে। তাই আমরা যেন কাঙ্খিত বিষয় অর্জনে বা শঙ্কা দূরকরণে দোয়া করতে অবহেলা না করি।

নবী সাঃ সালামা বিন আসলাম রাঃ-কে দুইশত লোকের সাথে এবং যায়েদ বিন হারেসা রাঃ-কে তিনশত লোক নিয়ে মদিনা পাহারা দিতে এবং উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে বনু কুরাইজার বিষয়টি মোকাবেলা করেন।

আর যে বহিরাগত শত্রুদল যারা খন্দকের পিছনে ছিল, আল্লাহ তাদের উপর প্রবল বাতাস পাঠালেন, তারা আর বসে থাকতে পারল না; ফলে তাদের অন্তরে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, প্রবল বাতাসের কারণে তাদের হাঁড়ি পাতিল উল্টে গেল, তাদের আগুন

নিভে গেল এবং তাদের তাঁবুকে উপড়ে ফেলল। অবশেষে তারা মদিনা ছেড়ে পালিয়ে গেল। এভাবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরকে বাতাস দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, যা মূলত আল্লাহ্র অন্যতম সৈন্য। সূরা আল-আহযাবে আল্লাহ তায়ালা তা বর্ণনা করে বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ جَآءَتۡكُمۡ جُنُودٞ فَأَرۡسَلۡنَا عَلَيۡهِمۡ رِيحٗا وَجُنُودٗا لَّمۡ تَرَوۡهَاۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ٩]

অর্থ: [হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল। অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম প্রবল বায়ু এবং এমন বাহিনী যা তোমরা দেখনি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা।] সূরা আল-আহযাব: ৯।

নবী সাঃ এ সম্পর্কে বলেতেন: (এক আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার অর্থে কোন ইলাহ নেই। তিনিই তাঁর বাহিনীকে মর্যাদাবান করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তিনি একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করেছেন। এরপর শত্রুর ভয় বলতে আর কিছুই থাকল না।) সহীহ বুখারী।

বনু কুরাইজার যুদ্ধ:

শিক্ষক: যখন নবী সাঃ আহযাবের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি তার অস্ত্রগুলি নামিয়ে রাখেন এবং গোসল করেন। এমন সময় জিবরাঈল আঃ তার কাছে এসে বললেন: আপনি অস্ত্র নামিয়ে রেখেছেন? আল্লাহর শপথ, আমি অস্ত্র ছাড়িনি! আপনি তাদের উদ্দেশ্যে বের হন। নবী সাঃ বললেন: কোথায়? তিনি বললেন: বনু কুরাইজার উদ্দেশ্যে। অতঃপর খন্দকের যুদ্ধের পর হিজরতের পঞ্চম বছরে যিলক্বদ মাসে বনু কুরাইজার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাদের মধ্যে অনেকেই নিহত হয়, মুসলমানগণ গনীমত লাভ করেন, তাদের মধ্যে অনেকেই নবী সাঃ-এর সাথে যোগদান করলে তিনি তাদেরকে

নিরাপত্তা দেন এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করে। বাকি ইহুদীদের সবাইকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করা হয়।

ছাত্র: এটা ছিল নবী সাঃ ও মুসলমানদের সাথে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি।

শিক্ষক: হ্যাঁ, বিশ্বাসঘাতকতা একটি মারাত্মক বিষয়; তারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং নবী সাঃ-এর সাথে যে চুক্তি ছিল তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই আল্লাহ জিবরাঈল আঃ-এর সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদেশ করেছেন।

হুদায়বিয়ার যুদ্ধ:

শিক্ষক: হুদায়বিয়া মক্কা থেকে বাইশ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি কূপের নাম এবং এটি আল-শুমাইসি নামে পরিচিত।[১]

ষষ্ঠ হিজরি সালের যিলক্বদ মাসে রাসূলুল্লাহ সাঃ সাহাবীদের নিয়ে উমরা পালনের জন্য বের হন।[২]

ছাত্র: উস্তাদ, তারা কি কুরাইশদের ভয় করেননি?

শিক্ষক: অবশ্যই কুরাইশদের ভয় ছিল। কিন্তু তবে যুদ্ধের জন্য বের হওয়া আর উমরার জন্য বের হওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে সম্ভবনা ছিল যে, হয়তো কুরাইশরা ফেরত পাঠবে, অথবা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, অথবা বায়তুল্লাহতে যেতে বাঁধা দিবে না। এ তিনটিই সম্ভাব্য সম্ভাবনা ছিল।

ছাত্র: কুরাইশরা কিভাবে জানলো যে তারা উমরা করতে আসছে?

---

(১) দেখুন, আকরাম জিয়া উমরী রচিত 'সিরাতুন্নবী': (২/৪২৪)।

(২) তাবাকাতুল কুবরা: (২/৯৫)।

শিক্ষক: নবী সাঃ ও সাহাবীরা উমরার জন্য আসছেন- কুরাইশরা এটা জানতে পেরেছিল তাদের ইহরাম পরিহিত অবস্থা এবং তাদের সাথে থাকা কোরবানির পশু দেখে- যা জবাই করে পবিত্র মক্কার গরীবদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

মুসলমানরা মক্কার উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেল এবং তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চারশ বা তার কিছু বেশি।

নবী সাঃ এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসেবে মক্কায় পাঠালেন, যেন সে মক্কায় গিয়ে কুরাইশরা কী পরিকল্পনা করছে তা জেনে আসে। এই লোকটি খুযাআ গোত্রের ছিল এবং এই গোত্রটি নবী সাঃ-কে সাহায্য করত। তার নাম ছিল বিশর বিন সুফিয়ান আল-খুযায়ী।[১]

ছাত্র: বিষয়টি খুবই সুন্দর, যা নবী সাঃ উদ্যোগ নিয়েছেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটা সতর্কতা ও সচেতনতার জন্য জরুরী; যাতে তারা জানতে পারে যে, তাদের সাথে কুরাইশদের যুদ্ধ করার এবং পবিত্র বায়তুল্লায় যেতে তাদেরকে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্য কতটা। এটা আমাদের যাবতীয় বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার গুরুত্বকে তাগিদ দেয়, বিশেষ করে যেগুলোতে আমরা ভয় পাই।

পথিমধ্যে বিশর বিন সুফিয়ান আল-খুযায়ী এসে নবী করীম সাঃ-এর কাছে এসে বললেন: কুরাইশরা আপনার বিরুদ্ধে একটি বিশাল বাহিনী জড়ো করেছে; তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করতে চায় এবং আপনাকে বায়তুল্লায় যেতে বাধা দিবে। অর্থাৎ তারা আপনার বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহ করেছে এবং তারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে বাধা দেবে।

ছাত্র: তারপর নবী সাঃ কী করলেন?

---

(১) সহীহ বুখারী: (৪১৭৯)।

শিক্ষক: নবী সাঃ এবং সাহাবীগণ হুদায়বিয়ার দিকে রওনা হলেন। তিনি ও সাহাবীরা সেখানে অবতরণ করলেন। তারা সেখানে জলাশয় খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু তা সামান্য ছিল। তারপর লোকেরা এ পানি ব্যবহার করতে লাগলেন, অবশেষে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে তারা নবী সাঃ-এর কাছে তাদের তৃষ্ণার অভিযোগ করল। অবশেষে এখানে একটি মহান অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে; যেখানে নবী সাঃ একটি তীর নিলেন, তারপর যেখানে পানি ছিল সেখানে সেটা স্থাপন করতে সাহাবীদেরকে আদেশ করলেন। তারপর সেখান থেকে প্রচুর পানি বের হতে লাগল; তারা পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করল।

ছাত্র: এটা ছিল বিশাল নেয়ামত।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আল্লাহই এ নেয়ামত দিয়েছেন; তিনিই তাদের জন্য এ পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন- কেবলমাত্র নবী সাঃ-এর আদেশক্রমে সাহাবীদের কৃর্তক তীর স্থাপনের মাধ্যমে। এটা রাসূল সাঃ-এর উপর আল্লাহর বরকত দানের অন্যতম নমুনা; তিনিই তাকে বরকতময় রাসূল বানিয়েছেন।

ছাত্র: তারপর কী ঘটল?

শিক্ষক: নবী সাঃ ও সাহাবীগণ যখন হুদায়বিয়াতে অবস্থান করছিলেন, তখন খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি বুদাইল বিন ওয়ারকা খুযায়ী এসে নবী সাঃ-কে বললেন, কুরাইশরাও হুদায়বিয়ার কাছে চলে এসেছে; তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করতে চায় এবং আপনাকে বায়তুল্লায় যেতে বাধা দিবে। নবী সাঃ তাকে বললেন যে, তিনি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসেননি, বরং তিনি উমরা পালনের জন্য বায়তুল্লায় যাচ্ছে। তখন নবী সাঃ তাকে বললেন: 'কুরাইশরা যুদ্ধের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গেছে', অর্থাৎ তাদের অনেকেই মারা গেছে। তিনি তাদেরকে সন্ধির করার এখতিয়ার দিলেন, আর যাতে তারা তাকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে আহবানের করতে সুযোগ দেয়; যদি এ দ্বীন তাদের উপর জয়ী হয় তবে অন্যান্য লোক ইসলামে যেভাবে প্রবেশ করেছে, তারাও চাইলে তা করতে

পারবে। আর না হয়, তারা এ সময়টুকুতে শান্তিতে থাকবে। কিন্তু তারা যদি এ প্রস্তাব অস্বীকার করে, তাহলে নবী সাঃ বললেন: (সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমার গর্দান বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাব। আর নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।) সহীহ বুখারী। এভাবে নবী সাঃ শপথ করে বললেন যে, তিনি তার দাওয়াত পরিত্যাগ করবেন না।

ছাত্র: সুন্দর প্রস্তাব, এতে কুরাইশদের ক্ষতির কিছু ছিল না।

শিক্ষক: হ্যাঁ, প্রস্তাবটি সুন্দর ও ইনসাফপূর্ণ ছিল। তিনি তাদের জবরদস্তি করে বা শক্তি প্রয়োগ করে ইসলামে প্রবেশ করতে আদেশ করেননি। বরং তাদেরকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। তিনি তাদের বুঝিয়েছিলেন যে, তাদের মনে করা উচিত নয় এবং বিশ্বাস করা উচিত নয় যে, নবী সাঃ আপোষ করতে পারেন এবং আল্লাহর পথে দাওয়াত ত্যাগ করতে পারেন। অতঃপর তিনি তাদের বুঝিয়ে বললেন যে, আল্লাহ তাঁর আদেশ অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করবেন- যা তিনি চান।

ছাত্র: সম্ভবত কুরাইশরা নবী সাঃ-এর এই প্রস্তাব ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল?

শিক্ষক: বুদাইল খুযায়ী তাদের কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে জানালেন।

এরই মধ্যে খবর আসলো যে, উসমান বিন আফফান রাঃ নিহত হয়েছেন। বিষয়টি হল: নবী সাঃ নিজের অবস্থান ব্যক্ত করতে উসমান রাঃ-কে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেছিলেন। উক্ত খবর পৌঁছার পরই 'বায়আতে রিজওয়ান' সংঘটিত হয়, যেখানে সকল সাহাবীই নবী সাঃ-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তবে একজন মুনাফিক ছাড়া; সে নিজ উটের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। বায়আতকালে নবী সাঃ নিজের ডান হাতের দিকে ইশালা করে বললেন: এটা উসমানের হাত। তারপর তিনি হাতটি বাম হাতের উপর রাখলেন এবং এ বায়আত উসমানের পক্ষ থেকে।

তোমরা চিন্তা করে দেখ, নবী সাঃ তার অনুপস্থিত একজন সাহাবী, উসমান বিন আফফান রাঃ-কে কীভাবে মুল্যায়ন করেছিলেন। কারণ, এটি আনুগত্যের একটি বরকতময় বায়আত ছিল। তিনি এ সম্পর্কে বলেছিলেন, "আজ তোমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ।" নিঃসন্দেহে এটা ছিল মহা সম্মানের, যাতে উসমান রাঃ নবী সাঃ-এর নির্দেশে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের কারণে অনুপস্থিত থেকেও শরীক হয়েছিলেন। এ বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা কুরআনে উল্লেখ করে বলেন:

﴿لَّقَدۡ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ إِذۡ يُبَايِعُونَكَ تَحۡتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمۡ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيۡهِمۡ وَأَثَٰبَهُمۡ فَتۡحٗا قَرِيبٗا﴾ [الفتح: ١٨]

অর্থ: *[*অবশ্যই আল্লাহ মুমিনগণের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নীচে আপনার কাছে বাই'আত গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিয়েছেন; ফলে তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয়ে পুরস্কৃত করলেন।*]* সূরা আল-ফাতহ: ১৮।

ছাত্র: সম্ভবত কুরাইশরা নবী সাঃ-এর এই প্রস্তাব ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল?

শিক্ষক: মনে হচ্ছে কুরাইশরা এ প্রস্তাব মেনে নেয়নি। তারা উরওয়া বিন মাসউদকে নবী সাঃ-এর সাথে সমঝোতা করতে পাঠায়। তারপর সে নিজ কওমের কাছে ফিরে গিয়ে তাদেরকে নবী সাঃ-এর প্রস্তাব মেনে নিতে আহবান জানায়। কিন্তু তারা তা মেনে নেয়নি। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল: আচ্ছা আমি গিয়ে দেখি। সে গিয়ে ফিরে এসে বলল: আমার মনে হয়না তোমরা তাকে বায়তুল্লায় আগমণ থেকে বিরত রাখতে পারবে। কুরাইশরা এ কথাও মানল না। অবশেষে সুহাইল বিন আমর নামক ব্যক্তি নবী

সাঃ-এর কাছে এসে আলাপ আলোচনা করল। সবশেষে নবী সাঃ ও কুরাইশদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি সাক্ষরিত হল।[১]

ছাত্র: নবী সাঃ ও কুরাইশদের মধ্যে সন্ধিচুক্তিতে কী ছিল?

শিক্ষক: সন্ধিতে অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত:

- নবী সাঃ ও তার সাহাবীরা উমরা পালন না করেই মদিনায় ফিরে যাবেন, পরের বছর উমরা পালন করতে আসতে পারবেন।
- কুরাইশদের মধ্য থেকে কেউ নবী সাঃ-এর কাছে চলে আসলে, এমনকি মুসলিম হয়ে আসলেও তাকে তিনি ফেরত পাঠবেন।
- যার ইচ্ছা সে নবী সাঃ-এর সাথে চুক্তি ও সন্ধিতে যোগদান করবে, যার ইচ্ছে সে কুরাইশদের সাথে যোগদান করবে।

ছাত্র: কিন্তু এ চুক্তিতে তো ইনসাফ করা হয়নি!

শিক্ষক: হ্যাঁ, এ সন্ধিতে ইনসাফ ছিল না; তাই সাহাবীরা এতে অবাক হয়েছিলেন যে, নবী সাঃ কীভাবে এটা মেনে নিলেন! উমর বিন খাত্তাব রাঃ বারবার বিষয়টি নবী সাঃ-কে বলছিলেন। আর রাসূল সাঃ বলছিলেন: (আমি তো আল্লাহর রাসূল, আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না।) সহীহ বুখারী।

নবী সাঃ-এর এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়ে তাতে সম্মতি দিয়েছেন। কেননা আল্লাহই তাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ইলহাম করেন। আল্লাহ পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ সন্ধি কুরাইশদের উপকারে আসবে না, বরং তা দ্বারা মুসলিমরাই উপকৃত হবে- যদিও বাহ্যত আমরা তা বুঝতে অপারগ।

---

(১) সহীহ বুখারী: (২৭৩১)।

ছাত্র: উস্তাদ, এটা কিভাবে মুসলিমদের জন্য উপকারী হতে পারে, একটু কি ব্যাখ্যা করবেন?

শিক্ষক: এ চুক্তির পর এমন এক পরিস্থিতি আসবে যা এ বিষয়টিকে প্রমাণিত করবে এবং এর ফলে কুরাইশরা তাদের এ অঙ্গিকার ও সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করবে। কারণ, যখনই কেউ ইসলাম গ্রহণ করে সে কুরাইশদের থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং সে এ সন্ধির কারণে নবী সাঃ-এর নিকটও আসতে পারে না। ফলে ঐ সমাজে এভাবে একের পর এক ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তারা একটি শক্তিশালী দলে পরিণত হয়। তারপর তারা মক্কা-মদিনার পথে পথে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলাকে বাধাগ্রস্ত করতে থাকে। এতে কুরাইশরা বিপাকে পড়ে যায়; অবশেষে তারা নবী সাঃ-এর নিকট গিয়ে আবেদন করতে থাকে যে, তিনি যেন চুক্তি থেকে শর্তটি বাতিল করে দেন। অর্থাৎ 'কুরাইশদের মধ্য থেকে কেউ মুসলিম হয়ে তার নিকট আসলে তিনি যেন তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠান' মর্মে শর্তটি। এখন তারা আবদার করল যেন তিনি তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং কুরাইশদের কাছে না পাঠান!

এটা কি এক অর্থে বিজয় নয়?

ছাত্র: হ্যাঁ, এটা ইসলাম গ্রহণকারীর জন্য বিজয় এবং নবী সাঃ-এর জন্যও বিজয় ছিল।

শিক্ষক: উক্ত শর্তগুলোর আলোকে যখন সন্ধিচুক্তি সম্পন্ন হয়, তখন নবী সাঃ মাথা মুন্ডন করলেন এবং কুরবানীর পশু জাবাই করলেন। সাহাবীগণও তাই করলেন; কেননা তারা সবাই মদিনা থেকে উমরা পালনের জন্য ইহরাম বেঁধেছিলেন। তারপর তারা মদিনায় ফিরে আসলেন।

অতএব হুদাইবিয়ার সন্ধি ছিল মুসলিমদের বিজয়; কেননা কুরাইশরা একটা চিন্তা করেছিল, কিন্তু তাতে মুসলিমদের সংখ্যাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নবী সাঃ যুদ্ধ থেকে নিরাপদ হয়েছিলেন। এমনকি এ সন্ধিকালীন সময়ে মুসলিমদের সংখ্যার অনুরূপ বা

তার চেয়েও বেশি সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। বরং তারা মদিনায় ফিরে আসার সময় সূরা আল-ফাতহ নাযিল হয়। আল্লাহ বলেন:

﴿إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحٗا مُّبِينٗا﴾ [الفتح: ١]

অর্থ: *[*নিশ্চয় আমি তোমাকে দিয়েছে সুস্পষ্ট বিজয়।*]* সূরা আল-ফাতহ: ১। তারপর রাসূল সাঃ তা তেলাওয়াত করে সাহাবীদেরকে শুনালেন। তখন আনসারী এক সাহাবী বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! এটা কি বিজয়? রাসূল সাঃ বললেন: (হ্যাঁ, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার কসম করে বলছি, নিশ্চয় এটা বিজয়।)[১]

ছাত্র: উস্তাদ, খুবই চমৎকার বিষয়; এখন মুসলিমদের সংখ্যা হুদাইবিয়ার সন্ধির আগের চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এখন মুসলিমদের সংখ্যা অনেক বেশি। এটা আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর নবুওয়তের সত্যতার একটি প্রমাণ। তাছাড়া আমাদের জ্ঞান সবকিছু যথার্থ বুঝ গ্রহণ করতে পারে না; তাই আমাদের উচিত আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করা এবং তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করে তা চাওয়া।

খায়বার যুদ্ধ:

শিক্ষক: রাসূল সাঃ বনী নাযিরকে মদিনা থেকে বিতাড়িত করার পর তারা খায়বারে চয়ে যায়। তাদের কিছু অংশ সিরিয়ায় চলে যায়। খায়বার বহু দুর্গ ও খামার বিশিষ্ট একটি বড় শহর।

ছাত্র: উস্তাদ, দূর্গ মানে কী?

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: (৩/৩৩২)।

শিক্ষক: দুর্গ হল প্রাচীর, অর্থাৎ শহরের চারপাশে দীর্ঘ ও উঁচু প্রাচীর। খোলা দরজা ছাড়া তাতে প্রবেশ করা অসম্ভব, রাত্রি বেলায় তা বন্ধ থাকে। একটি শহরের একাধিক দুর্গ থাকতে পারে, যেমন এর প্রত্যেক পাশে একটি দুর্গ থাকা যা ঐ পাশকে বেষ্টন করে রাখে। যেমন: শহরের পূর্বদিকে একটি দূর্গ, পশ্চিম দিকে একটি দুর্গ, ইত্যাদি।

হিজরী সপ্তম বছরের মুহাররম মাসে আল্লাহর রাসূল সাঃ খায়বারে গমন করেন।[১] (আহযাবের যুদ্ধ, তথা খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের প্ররোচিত করতে সেখানে ইহুদীদের প্রভাব ছিল।)

ছাত্র: মুসলিম ও খায়বার বাসীদের মাঝে কি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, মুসলমানগণ খায়বারে পৌঁছে যান, তারপর নবী সাঃ তাদেরকে অবরুদ্ধ করেন।[২]

ছাত্র: অবরুদ্ধ করা মানে কী?

শিক্ষক: অবরোধের অর্থ হল সেনাবাহিনী প্রবেশদ্বার বা গ্রামে অবস্থান নেয়। ফলে সেখানকার লোকেরা বের হতে বা প্রবেশ করতে পারে না। খায়বারে একাধিক দুর্গ থাকায় মুসলমানরা দুর্গের পর দুর্গ ঘেরাও করতে থাকে। যখনই একটি দুর্গ বিজয় হতো, তারা অপরটির দিকে অগ্রসর হতো।

একটি দূর্গ বিজয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমতবস্থায় রাসূল সাঃ বললেন: (আমি আগামীকাল যুদ্ধের পতাকা এমন ব্যক্তির হাতে তুলে দিব যার হাত ধরে আল্লাহ বিজয়

---

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: (৩/৩৪২)।

(২) সহীহ বুখারী: (৪১৯৬)।

দিবেন। সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসেন।)[১]

ছাত্র: এই সাহাবীর জন্য এটি একটি মহান মর্যাদা যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালবাসেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এটা উচ্চ সম্মান ও মহান মর্যাদা এবং তার জন্য রাসূল সাঃ-এর পক্ষ থেকে সাক্ষ্যও বটে। অতএব, সেই রাতে সাহাবায়ে কেরাম চিন্তা করতে লাগলেন যে এই মহা সৌভাগ্য ও নসীব কার হবে? এবং প্রত্যেকেই নিজে পাবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন।

ছাত্র: উস্তাদ, সেই সাহাবী কে ছিলেন?

শিক্ষক: সকাল হলে রাসূল সাঃ বললেন: (আলী বিন আবু তালেব কোথায়? তারা বলল: তিনি চোখের পীড়ায় আক্রান্ত।)[২] তার মানে তিনি চোখের অসুস্থতার কারণে সেখানে উপস্থিত হননি। উপরন্তু এমতবস্থায় শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এ মহান দায়িত্ব পালন করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।

ছাত্র: তারপর কী হল? পতাকা কি অন্য কোন সাহাবীকে দেয়া হয়েছিল?

শিক্ষক: তারপর রাসূল সাঃ বললেন: তাকে ডেকে আন। যখন আলী রাঃ নবী সাঃ-এর নিকট এলেন, তার চোখে একটু থুথু লাগিয়ে নবী সাঃ দোয়া করে দিলেন। ফলে তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন তার কোন অসুখই ছিল না।[৩]

ছাত্র: উস্তাদ, এটাও তো একটা মুজিযা।

---

(১) সহীহ বুখারী: (৪২১০)।

(২) সহীহ বুখারী: (৪২১০)।

(৩) সহীহ বুখারী: (৪২১০)।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটাও আল্লাহর ইচ্ছায় নবী সাঃ-এর একটি মুজিযা ছিল। কেননা তিনি একজন সম্মানিত নবী ছিলেন যাকে আল্লাহ ভালবাসে। তাই আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন এবং সবকিছুতে তাকে বরকত দিয়েছেন।

ছাত্র: তারপর কী হল?

শিক্ষক: আলী বিন আবি তালিব রাঃ মুসলিম বাহিনীর প্রধান হয়ে সেই দুর্গে গেলেন। সেই দুর্গের লোকদের বের করে তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন। সেখানে একটি বড় দরজা ছিল যা একাধিক লোক ব্যতীত বহন করতে পারতো না। আলী বিন আবি তালিব রাঃ সেটাকে নিজ হাতে উত্তোলন করে তা দ্বারা শত্রুর তরবারি থেকে আত্মরক্ষা করেন এবং যুদ্ধ করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তার হাতে সেই দূর্গের বিজয় দান করেন। তারপর তিনি সেটাকে মাটিতে ফেলে দেন।[১]

ছাত্র: তার মানে আলী রাঃ খুব শক্তিশালী ছিলেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আলী রাঃ বীর, সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা ঐ সময়ে তার শক্তি আরো বাড়িয়ে দেন; ফলে তিনি একাই এমন দরজা হাতে উত্তোলন করেন যা একাধিক শক্তিশালী পুরুষ ছাড়া সম্ভব হতো না। এটা আল্লাহর তাওফীকেই সম্ভব হয়েছে; কেননা তাকে আল্লাহ ও রাসূল সাঃ ভালবাসেন এবং তিনিও তাদেরকে ভালবাসেন। তাই আমাদের অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসতে হবে- যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে ভালোবাসেন। আল্লাহ যদি আমাদেরকে ভালোবাসেন তবে তিনি আমাদের শক্তি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, বোধগম্যতা এবং সংরক্ষণে আমাদেরকে সাফল্য দেবেন।

ছাত্র: উস্তাদ, মুসলিমদের বিজয়ের পর কী ঘটেছিল?

---

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: (৩/৩৪৯-৩৫০)

শিক্ষক: খায়বারের অধিবাসীরা পরাজয় বরণের পর নবী সাঃ তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেননি। বরং তিনি তাদেরকে অনুগ্রহ করেন এবং সেখানে চাষাবাদ করার শর্তে তাদেরকে ছেড়ে দেন; চাষাবাদ থেকে যতটুকু ফসল উৎপাদিত হবে তার অর্ধেক তারা পাবে, আর বাকি অর্ধেক মুসলিমরা পাবে।

এদিকে ফাদাকের অধিবাসীরা যখন খায়বারের অধিবাসীদের পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারল, তখন তারা নবী সাঃ-এর নিকট আবেদন জানাল যেন তাদের ধন-সম্পদের ব্যাপারেও একই নীতি অবলম্বন করেন যেমনটি খায়বারের অধিবাসীদের সাথে করা হয়েছে। ফলে নবী সাঃ তাদের সাথেও সেভাবে সমঝোতা করেন।

এই যুদ্ধের সময় যয়নাব বিনতে হারিস রাসুলুল্লাহ সাঃ-কে একটি ভূনা করা বকরী হাদিয়া দেয় এবং সে তাতে বিষ মিশিয়ে দেয়। বকরীর রানে বেশি পরিমাণে বিষ দিয়েছিল, কারণ সে জানত যে নবী সাঃ রানের মাংস বেশি পছন্দ করতেন।

ছাত্র: এটি একটি ঘৃণ্য কাজ। অথচ নবী সাঃ তাদের সাথে উদার আচরণ করেছেন।

শিক্ষক: রাসূল সাঃ-এর সাথে এরূপ প্রতারণামূলক আচরণ নিঃসন্দেহে জঘণ্য কাজ। তারপর রাসূল সাঃ যখন মাংসের কিছু অংশ চিবালেন, অপছন্দ লাগলো এবং সাথে সাথে তা ফেলে দেন। রাসূল সাঃ-এর সাথে ছিলেন বিশর বিন বারা রাঃ, তিনি তা থেকে কিছু খেয়েছেন। অতঃপর রাসূল সাঃ বললেন: 'এই হাড্ডি আমাকে বলছে যে, সে বিষ মিশ্রিত'।[১]

ছাত্র: আল্লাহ কতই না মহান। মহানবী সাঃ-এর সাথে এত বড় ঘটনা ঘটেছে যে, অবশেষে হাড় তাকে সংবাদ দিয়েছে যে সে বিষ মিশ্রিত!

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: (৩/৩৫২-৩৫৩)

শিক্ষক: হ্যাঁ, হাড়টিকে আল্লাহই এমন বানিয়েছেন যে, তা নবী সাঃ-কে বলে দেয়। অথচ একই বিষয় আমরা জানি না। তাইতো সাহাবী বিশর বিন বারা এক টুকরা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছিলেন, যাতে তিনি মারা যান।

ছাত্র: নবী সাঃ মহিলাটিকে কী করেছিলেন?

শিক্ষক: নবী সাঃ মহিলাটিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন সে এমন করল? সে বলল: কারণ আপনি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে যুদ্ধ করেছেন এবং আমি বলেছিলাম: 'যদি এই ব্যক্তি বাদশা হন, তাহলে আমরা তার থেকে নিষ্কৃতি পাব। আর যদি নবী হন, তাহলে বিষয়টি তার পালনকর্তা তাকে অবহিত করবেন।' তারপর নবী সাঃ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

ছাত্র: রাসূল সাঃ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, অথচ সে তাকে বিষ দিয়ে হত্যা করতে চেয়েছিল! এটি মহৎ আচরণ।

শিক্ষক: তিনি ছিলেন মহান নৈতিকতা অধিকার। তাই তিনি তাদের ক্ষমা করতেন যারা তার সাথে অন্যায় আচরণ ও ক্ষতি করেছে। তিনি ছিলেন আচরণে উদার। তাই আমাদেরকেও নৈতিকতা ও আচরণে এমন উদার হতে হবে।

রাজা বাদশাদের নিকট চিঠি প্রেরণ:

শিক্ষক: হুদায়বিয়ার সন্ধির পর নবী সাঃ যখন মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তিনি কয়েকজন সাহাবীকে বিভিন্ন শাসক ও বাদশার কাছে চিঠি দিয়ে পাঠান। তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। তাদের মধ্যে আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জশী, রোমের বাদশা হেরাক্লিয়াস, পারস্যের বাদশা কিসরা, আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক মুকাওকিস এবং অন্যান্য বাদশা ও শাসকরা রয়েছেন।

ছাত্র: তারা কি আরবীতে কথা বলতে পারতো?

শিক্ষক: নবী সাঃ তার কয়েকজন সাহাবীকে ঐসব রাজা-বাদশাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তারা প্রত্যেকেই সেই লোকদের ভাষায় কথা বলতেন যাদের কাছে তাদেরকে পাঠানো হয়েছিল। মানে, তারা সে দেশের মানুষের ভাষা শিখেছে, রপ্ত করেছে। এমনকি, যখন নবী সাঃ-কে অবহিত করা হয়েছিল যে, রাজা-বাদশারা সীলমোহর ব্যতীত কোন চিঠি গ্রহণ করবে না, তখন তিনি একটি রৌপ্যের আংটি নিলেন এবং তাতে খোদাই করলেন: মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। তিনটি লাইনে তা খোদাই করা হয়েছিল।[১]

ছাত্র: খুব চমৎকার বিষয়; কোন কোন সাহাবী অন্যান্য ভাষাও জানতেন।

শিক্ষক: তোমরা আগেই জেনেছ যে, যারা পড়তে ও লিখতে জানে তাদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তারপর দেখ তার শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে বিজ্ঞান কীভাবে বিকাশ লাভ করেছিল, এমনকি তারা ভিনদেশের কিছু ভাষাও শিখেছিল। যা নির্দেশ করে যে, ইসলাম বিজ্ঞানকে উৎসাহিত করে; পাশাপাশি অন্যের ভাষা শিখতেও উদ্বুদ্ধ করে; যাতে আমরা তাদের ভাষায় তাদের নিকট দ্বীন পৌঁছে দিতে পারি।

কাযা উমরা:

শিক্ষক: হুদায়বিয়াতে যখন নবী সাঃ ও কুরাইশ কাফেরদের মধ্যে সন্ধি সংঘটিত হয়, তখন তারা একমত হয় যে, নবী সাঃ উমরা না করেই মদিনায় ফিরে যাবেন; পরের বছর অর্থাৎ সপ্তম বছরে উমরা করতে আসবেন। তাই নবী করীম সাঃ সেই উমরা পালনের জন্য বের হয়েছিলেন, এবং যে সাহাবীরা ষষ্ঠ সালে হুদায়বিয়ায় মুশরিকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল তারাও তার সাথে বের হয়েছিলেন এবং অন্যান্যরাও তাদের সাথে উমরা পালনের জন্য বেরিয়েছিলেন। তখন তাদের সংখ্যা ছিল দুই হাজার।

---

(১) তাবাকাতুল কুবারা: (১/২৫৮)।

ছাত্র: সুবহানাল্লাহ! হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় সাহাবীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪০০ জন। আর পরের বছরেই কাযা উমরার সময় তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দুই হাজার হয়ে যায়! এটা আল্লাহর তাওফীকেই হয়েছে।

শিক্ষক: সুন্দর মতামত। এখানে জ্ঞাতব্য যে, ঐ সংখ্যার বাইরে কিছু সাহাবী মারা গিয়েছেন, তাছাড়া খায়বারের যুদ্ধে কয়েকজন শহীদও হয়েছেন।

ছাত্র: উস্তাদ, তারপর কী ঘটেছে?

শিক্ষক: কুরাইশরা যখন এ কথা জানতে পারল, তারা মুসলমানদের সম্পর্কে বলতে লাগল: আগামীকাল তোমাদের উপর এমন লোক আসবে যাদেরকে জ্বর কাবু করে ফেলেছে, অর্থাৎ তারা জ্বরে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই তারা হাজরে আসওয়াদের পাশে বসল। নবী সাঃ সাহাবীগণকে তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করতে (জোর কদমে চলতে) এবং উভয় রুকনের মধ্যবতী স্থানটুকু স্বাভাবিক গতিতে চলতে নির্দেশ দিলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাদেরকে তিনবার রামল করতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে হাঁটার নির্দেশ দিলেন।

ছাত্র: উস্তাদ, প্রথম তিন চক্করে রমল করতে নির্দেশ দেয়ার কোন কারণ আছে কি?

শিক্ষক: হ্যাঁ, যাতে কুরাইশরা বুঝতে পারে যে, মুসলমানরা শক্তিশালীই আছে, জ্বরে দুর্বল হয়ে পড়েনি যেমনটা তারা বলে বেড়াচ্ছে। আর তাই তাওয়াফের সময় প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নত।

এ থেকে বুঝতে পারি যে, শত্রুদের সামনে আমাদের শক্তি জাহির করা বাঞ্চনীয় যাতে তারা শঙ্কিত হয় ও সমীহ করে চলে। অনুরূপভাবে আমাদের উচিত আমাদের দৈহিক ক্ষমতার পরিচর্যা করা।

ছাত্র: তারা কি প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিল, নবী সাঃ ও তার সাহাবীদেরকে কষ্ট দেয়নি?

শিক্ষক: নবী সাঃ মাত্র তিনদিন মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। তারপর তারা নবী সাঃ-কে মক্কা থেকে চলে যেতে বলে। তিনিও চলে আসেন; ফলে ঐ উমরার সফরে মুসলিম ও মুশরিকদের মাঝে কোন ঘটনা ঘটেনি।

মক্কা বিজয়:

শিক্ষক: হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তগুলোর মধ্যে ছিল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূলের চুক্তি ও অঙ্গীকারে প্রবেশ করতে চায় সে এতে প্রবেশ করবে এবং যে ব্যক্তি কুরাইশদের চুক্তি ও অঙ্গীকারে প্রবেশ করতে চায় সে এতে প্রবেশ করতে পারবে।

ছাত্র: উস্তাদ, চুক্তি ও অঙ্গীকারে প্রবেশ করতে চাওয়ার মানে কি?

শিক্ষক: এর অর্থ এই যে, বিভিন্ন গোত্রের যে কেউ নবী সাঃ-এর সাথে ও তার পাশে থাকতে চায় এবং তাকে সমর্থন ও সাহায্য করতে চায় সে তা করতে পারে। আর যে কুরাইশদের সাথে থাকতে চায় সে তা-ও করতে পারে।

তারপর বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সাথে যোগ দেয় এবং খুযাআ গোত্র নবী সাঃ-এর যোগদান করে। তাদের মধ্যে যে সমঝোতাবা সন্ধি চলাকালিন সময়ে, বনু বকর গোত্র খুযাআ গোত্রের উপর আক্রমণ করে এবং বেশ কয়েকজন কুরাইশ তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করেছিল। ফলে বনু বকর ও কুরাইশ কর্তৃক খুযাআ গোত্রের উপর এ আক্রমণের মাধ্যমে সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ হয়। এদিকে, বাদিল বিন ওয়ারকা বনু খুযাআ থেকে একদল লোক নিয়ে নবী সাঃ-এর কাছে এসে বনু বকর যা করেছে এবং তাতে কুরাইশদের সমর্থনের বিষয়ে তাকে অবহিত করেন।

ছাত্র: নবী সাঃ তাদেরকে কী বললেন?

শিক্ষক: নবী সাঃ তাদেরকে সমর্থন ও রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কারণ, চুক্তির বিষয়ে সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামী নৈতিকতার অংশ এবং যারা মুসলমানদের

চুক্তি ও অঙ্গিকারে প্রবেশ করেছে তাদের সমর্থন করা ও তাদেরকে হতাশ না করাও ইসলামী নৈতিকতার অংশ। কেননা ইসলাম আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতি পূরণের ধর্ম। তাই, রাষ্ট্র মুসলিম ও অমুসলিমদের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করে সেটাকে আমাদের অবশ্যই সম্মান করতে হবে।

ছাত্র: নবী সাঃ কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন?

শিক্ষক: মহানবী সাঃ রক্তপাত পছন্দ করতেন না। তাই তিনি কুরাইশদের কাছে নির্দেশনা পাঠালেন এবং তাদেরকে তিনটি বিষয়ে এখতিয়ার দিলেন: হয় তারা বনু খুযাযার যাদেরকে তারা হত্যা করেছে তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে, অথবা তারা খালাস পাবে এবং বনু বকরের জোট ত্যাগ করবে, অথবা নবী সাঃ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন।

ছাত্র: আল্লাহর কসম, এসব এখতিয়ারভুক্ত বিষয়গুলোতে তাদের এবং খুজাআ গোত্র উভয়ের প্রতিই ইনসাফ করা হয়েছে। এর ফলে যাদেরকে তারা হত্যা করেছে তাদের জন্য রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং নিহতের পরিবার রক্তপণের টাকা গ্রহণ করব; ফলশ্রুতিতে এটি তাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখবে এবং তাদের মাঝে শান্তি ফিরে আসবে।

শিক্ষক: এটি তোমাদের একটি সুন্দর মতামত, কিন্তু কুরাইশরা তাদের শক্তিমত্তা দেখাতে চেয়েছিল। তাই তারা রক্তপণ আদায় করেনি বা বনু বকরের জোট ত্যাগ করতেও রাজি হয়নি। বরং তারা যুদ্ধের পথ বেছে নেয়।

তারপর নবী সাঃ কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন এবং এই বলে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন: (হে আল্লাহ! আপনি কুরাইশদের গোয়েন্দা ও সংবাদবাহীদেরকে আটকে রাখুন -তারা যেন আমাদের আগমণের খবর না

পায়-, যাতে আমরা আচমকা তাদের শহরে পৌঁছতে পারি।) তারপর লোকজন যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলো।[১]

এটি আমাদেরকে দোয়ার গুরুত্ব নির্দেশ করে। কেননা আল্লাহ যদি আমাদের সাহায্য না করেন তবে আমরা যা চাই তা অর্জন করতে সক্ষম হব না। অতএব, আমাদেরকে অবশ্যই প্রতিটি বিষয়ের জন্য দোয়া করতে হবে- যা আমরা অর্জন করতে চাই অথবা শঙ্কাময় যা কিছু দূর করতে চাই।

ছাত্র: কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রাসূল সাঃ কখন বের হলেন?

শিক্ষক: হিজরতের সাড়ে আট বছর পর অর্থাৎ হিজরতের নবম বছরের মাঝামাঝি সময়ে নবী করীম সাঃ মদিনা থেকে বের হন এবং সাথে দশ হাজার মুসলমান ছিলেন।

ছাত্র: মাশাআল্লাহ, হুদায়বিয়ার সন্ধিতে মুসলমানদের সংখ্যার তুলনায় এবার তাদের সংখ্যাটা অনেক বেশি। ঐ সময় তাদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক এক হাজার পাঁচশত, ব্যাপারটা কি তাই নয় উস্তাদ?

শিক্ষক: ঠিক বলেছো। তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল এক হাজার চার শতাধিক। এই বৃদ্ধি প্রায় দুই বছরের মধ্যে ঘটেছে। কেননা হুদায়বিয়ার যুদ্ধ হয়েছিল নবীজির হিজরতের ষষ্ঠ বছরে যিলক্বদ মাসে। এটা প্রমাণ করে যে, লোকেরা দলে দলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছিল। কারণ তারা এই নবী সাঃ-এর সত্যতা এবং এই মহান দ্বীনের সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা, তার মহান নীতি, পদ্ধতি ও নির্দেশনা দেখেছিল। তাই আমাদের উচিত হল যথাযথভাবে এই দ্বীন মেনে চলা এবং অমুসলিমদের নিকট এটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে তারা তারা ইসলামের ইবাদত এবং এর মহান নৈতিকতার সৌন্দর্য দেখে ইসলাম গ্রহণ করে।

---

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: (২/৩৯-৪০)

ছাত্র: উস্তাদ, মুসলমানরা রমজানে বের হয়েছিল, তারা কি রোজা রেখেছিল না ভেঙ্গেছিল?

শিক্ষক: সুন্দর প্রশ্ন, বুঝা যাচ্ছে তোমরা খুব মনোযোগের সাথে ফলো করছ!

নবী সাঃ এবং মুসলমানরা মক্কায় যাওয়ার পথে যখন কাদীদ নামক স্থানে পৌঁছান, যা উসফান ও কুদাইদের মধ্যবর্তী একটি জলাশয়- তখন নবী সাঃ রোজা ভঙ্গ করলেন এবং লোকেরাও তার সাথে রোজা ভেঙ্গে ফেলল।[১] ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলুল্লাহ সাঃ রোজা অবস্থায় মদিনা থেকে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। উসফানে পৌছার পর তিনি পানি আনার জন্য আদেশ করলেন। তারপর তিনি লোকদেরকে দেখানোর জন্য পানি হাতে উচুঁ করে ধরে সাওম ভঙ্গ করলেন এবং এ অবস্থায় মক্কায় পৌছলেন। এটা ছিল রমজান মাসে।)**[২]

এ থেকে বুঝা যায় যে, মুসাফির তার রোজা ভাঙ্গতে পারে এবং পরে এর জন্য কাযা আদায় করতে হবে। আমরা আরও বুঝতে পারি যে, ইসলাম রহমতের ধর্ম, কষ্টের ধর্ম নয়। এ জন্যই আলেমগণ বলেন: (কষ্ট স্বস্তি আনে।) তারা এ মূলনীতিটি দ্বীনের বিভিন্ন দলীল থেকে উদ্ভাবন করেছেন।

ছাত্র: সত্যিই ইসলাম রহমতের ধর্ম, কষ্টের ধর্ম নয়। তাই ইসলাম ধর্মেকে অনেক ভালবাসি।

শিক্ষক: কুরাইশরা যখন নবী সাঃ-এর সম্পর্কে জানতে পারলো যে, তিনি মক্কার দিকে আসছেন, তখন তারা এ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য লোক পাঠালো। একদল লোক নিয়ে আবু সুফিয়ান বিন হারব বেরিয়ে পড়ল নবী সাঃ-এর অনুসন্ধানে ... ।

---

(১) সহীহ বুখারী: (৪২৭৬)।

(২) সহীহ বুখারী: (৪২৭৯)।

অবশেষে মক্কার সন্নিকটে জাহরান নামক স্থানে আবু সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীর নাগাল পেয়ে যায়।

ছাত্র: মুসলিম বাহিনীকে দেখে সে কী করল? সে কি কুরাইশদেরকে সংবাদ দেয়ার জন্য ফিরে গিয়েছিল?

শিক্ষক: না সেখানে মুসলিম সেনা প্রহরী ছিল, যাদের লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীকে পাহারা দেওয়া। মুসলিম সেনা রক্ষীরা আবু সুফিয়ান এবং তার সাথে থাকা ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে। তারা তাদেরকে নবী করীম সাঃ-এর কাছে নিয়ে গেল।

ছাত্র: এটি হয়েছে যে তারা পাহারার ব্যবস্থা রেখেছিল। কিন্তু নবী সাঃ আবু সুফিয়ানের সাথে কি আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাকে হত্যা করেছেন নাকি বন্দী করেছেন? অথবা তাকে কি করেছিলেন?

শিক্ষক: তোমরা নবী সাঃ-এর জীবনী থেকে ইতিমধ্যে জেনেছ যে, মানুষকে হত্যা করা বা প্রতিশোধ নেয়া নবী সাঃ-এর লক্ষ্য ছিল না। বরং তার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষকে ইসলামে প্রবেশ করিয়ে কুফুরী ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো।

অতএব, আবু সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার সাথে যারা ছিলেন, হাকিম বিন হিযাম ও বাদিল- তারাও ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

নবী সাঃ বলেছেন: (যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করে সে নিরাপদ, যে তার দরজা বন্ধ করে সে নিরাপদ এবং যে মসজিদে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।)[২] যদি নবী সাঃ-এর লক্ষ্য মানুষকে হত্যা করা হতো, তিনি এই কথাগুলো বলতেন না।

---

(১) ফতহুল বারী: (৮/৭)।

(২) সিরাতে ইবনে হিশাম: (৪/৪৬)।

ছাত্র: ঠিক বলেছেন উস্তাদ, আমরা যত ঘটনা শুনলাম ও জানলাম তা থেকে নবীজির এ নীতিই ফুটে উঠে।

শিক্ষক: তারপর রাসূল সাঃ হাজুন নামক স্থানে তার পতাকা স্থাপনের নির্দেশনা দিলেন। মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ সাঃ মক্কার উঁচু এলাকা 'কাদা'র দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেন, এটি মক্কার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তিনি তার সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন যাতে তারা সংযত থাকে এবং কারো উপর আক্রমণ না করে। তবে যারা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১]

ফলে এটাও নিশ্চিত করে যে, নবী সাঃ-এর উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা নয়, যতক্ষণ না কেউ তার বিরুদ্ধে লড়াই করে। আর কেবল শত্রুর মোকাবেলায় মুসলমানগণ যুদ্ধ করেছেন কেবল আত্মরক্ষার জন্য।

ছাত্র: ইসলাম এ নীতিটি কতই না সুন্দর! কিন্তু কেউ কি তাদের উপর আক্রমণ করেছিল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়েছিল?

শিক্ষক: এ যুদ্ধে কোন আক্রমণ হয়নি, যেমনটি সাধরণত যুদ্ধে হয়ে থাকে। বরং, আল্লাহ তায়ালা মুসলিম সেনাবাহিনীর সংখ্যা দিয়ে কুরাইশদেরকে আতঙ্কিত করেছিলেন। অনুরূপভাবে, নবী সাঃ তার সেনাপতিদের তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করতে নিষেধ করেছিলেন। রাসুল সাঃ অস্ত্রের ঝলকানি দেখে বললেন, (আমি কি লড়াই করতে নিষেধ করিনি? বলা হলো: খালিদ বিন ওয়ালীদ আক্রান্ত হয়েছেন, তাই তিনিও পাল্টাঘাত করেছেন। তখন তিনি বললেন: আল্লাহর বিচার উত্তম।)[২] এ কারণে সেদিন কুরাইশদের চব্বিশ জন এবং হুযাইল গোত্রের চার জন নিহত হয়। আর মুসলিমদের মধ্যে খালিদ বিন ওয়ালীদের অশ্বারোহী সৈন্যদের মধ্য থেকে দু'জন শহীদ হয়েছিলেন।

---

(১) ফতহুল বারী: (৮/১০)।

(২) তাবাকাতুল কুবরা: (২/১৩৬)।

এটি প্রমাণ করে যে, তার একটি লক্ষ্য মানুষকে হত্যা করা ও রক্তপাত ঘটানো নয়, বরং তার লক্ষ্য হল এই দ্বীনের মাধ্যমে লোকদের প্রতি দয়া করা, যাতে তারা এতে প্রবেশ করে এবং এভাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।

ছাত্র: তাহলে রাসূল সাঃ মুক্কায় প্রবেশ করে কুরাইশদের সাথে কী আচরণ করেছেন?

শিক্ষক: মক্কায় থাকাকালীন তার ও সাহাবীদের সাথে এবং মদিনায় তার বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ সত্ত্বেও তিনি মক্কাবাসীদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল সাঃ তাদেরকে বললেন: **(হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা কি মনে কর আমি তোমাদের সাথে কি করব? তারা বললো: ভালো, একজন উদার ভাই এবং উদার ভাতিজা। তিনি বললেন: যাও, তোমরা মুক্ত!)**[১]

ছাত্র: উস্তাদ, তোমরা মুক্ত মানে কি?

শিক্ষক: অর্থাৎ, তোমরা স্বাধীন, আমি তোমাদের কাছে কিছু দাবি করি না। কারণ, তিনি চাইলে যাকে ইচ্ছা হত্যা করতে পারতেন এবং যা খুশি অর্থ দাবি করতে পারতেন। কিন্তু এটা তার মহৎ নৈতিকতার অংশ নয়। কেননা তিনি রহমত ও হেদায়াতের নবী।

ছাত্র: উস্তাদ, তারপর কী ঘটল?

শিক্ষক: এরপর মক্কার লোকজন আবু সুফিয়ানের বাড়ির দিকে চলে গেল আর অন্যান্য মানুষ আপন ঘরে দরজা লাগিয়ে বসে রইল। কেননা নবী সাঃ ঘোষণা দিয়েছেন: (যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করে সে নিরাপদ, যে তার দরজা বন্ধ করে সে নিরাপদ এবং যে মসজিদে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।)[২]

---

(১) সিরাতে ইবনে হিশাম: (৪/৫৫)।

(২) সিরাতে ইবনে হিশাম: (৪/৪৬)।

তারপর রাসূল সাঃ 'হাজরে আসওয়াদ' এর নিকটবর্তী হয়ে একে চুম্বন করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করলেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহর পার্শ্বে রক্ষিত একটি মূর্তি ধ্বংস করতে করতে বললেন, "সত্য এসেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই"। এরপর তাওয়াফ শেষে তিনি সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর দিকে চেয়ে দেখলেন এবং দুহাত উচু করে আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশ করতে লাগলেন এবং তার যা দোয়া করার ছিল সে বিষয়ে দোয়া করলেন।[১]

এটি তাওয়াফের গুরুত্ব নির্দেশ করে এবং একজন মুসলমান যখন মক্কায় প্রবেশ করে তখন এটিই হবে তার প্রথম কাজ। যখন একজন ব্যক্তির উপর আল্লাহর অনুগ্রহ আসে তখন তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার গুরুত্ব এবং দোয়ার গুরুত্বও নির্দেশ করে। পাশাপাশি শিরকের ভয়াবহতাও নির্দেশ- কেননা বায়তুল্লাহর নিকটে থাকা মূর্তিটিকে তিনি ধ্বংস করেছিলেন। তাছাড়া আল্লাহর দ্বীন-ই সত্য ধর্ম।

ছাত্র: মক্কা বিজয়ের পর নবী সাঃ কি সেখান থেকে চলে এসেছিলেন, নাকি সেখানে অবস্থান করেছিলেন?

শিক্ষক: নবী করীম সাঃ শিয়াবে আবু তালিবের একটি তাঁবুতে অবস্থান করেছিলেন। এটি সেই জায়গা যেখানে কুরাইশরা নবী সাঃ সহ মুসলমানদেরকে অবরোধ করে রেখেছিল। সে সময় নবী সাঃ মক্কায় (১৯) উনিশ দিন অবস্থান করেছিলেন এবং কসর করে সালাত আদায় করেছেন।[২]

ছাত্র: তারা কি সেটাকে সফর গণ্য করেছেন, যার কারণে নামাজ কসর করেছেন?

শিক্ষক: হ্যাঁ, কেননা সফর কখনো জিহাদের কারণে, কখনো ব্যবসায়িক কারণে, কখনো হজ্ বা উমরা ইত্যাদি ইবাদতের কারণে হতে পারে। এমনকি কখনো অন্য কোন

---

(১) সহীহ মুসলিম: (১৭৮০)।

(২) সহীহ বুখারী: (৪২৯৮)।

বৈধ কারণেও হতে পারে। আর তখনই একজন মুসলিম চার রাকাতবিশিষ্ট নামাজগুলো কসর করে দুই রাকাত করে আদায় করবে।

ছাত্র: তারপর নবী সাঃ কী করেছেন?

শিক্ষক: অতঃপর লোকেরা নবী করীম সাঃ-এর কাছে আসতে লাগল, তার প্রতি আনুগত্যের বায়আত ও ইসলাম গ্রহণ করতে। তারা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে লাগল- অর্থাৎ বিভিন্ন গোত্রের লোকজন। আর তখনই সূরা আল-নাসর অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

﴿إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ۝١ وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ۝٢ فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرۡهُۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابَۢا ۝٣﴾ [النصر]

অর্থ: [যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে,* আর আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন,* তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।] সূরা আন-নাসর।

হুনাইনের যুদ্ধ:

শিক্ষক: হাওয়াযিন গোত্র যখন আল্লাহর রাসূল সাঃ এবং মক্কা বিজয়ের কথা শুনল, তখন মালিক বিন আউফ আল-নাযরী তাদেরকে নবী সাঃ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জড়ো করল এবং বনু সাকিফ, গাতফান ও অন্যান্যরা তাদের সাথে একত্রিত হল।

মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল দশ হাজার এবং ক্ষমাপ্রাপ্ত মক্কাবাসীদের থেকে দু'হাজার। পক্ষান্তরে শত্রু পক্ষের সৈন্য ছিল দ্বিগুণেরও বেশি।

ছাত্র: এ গোত্রগুলো কেন নবী সাঃ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেল? অথচ তিনি তো তাদের সাথে যুদ্ধ করেননি!

শিক্ষক: ঠিক বলেছ, আল্লাহ যখন তাঁর নবীকে মক্কা বিজয় দান করলেন, তখন তায়েফের বিভিন্ন গোত্র আশঙ্কা করছিল যে, হয়তো নবী সাঃ এখন তাদের দিকে অগ্রসর হবেন। তাই নবী সাঃ-এর সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়।

ছাত্র: উস্তাদ, এটাকে হুনাইনের যুদ্ধ কেন বলা হয়?

শিক্ষক: এটাকে হুনাইনের যুদ্ধ বলা হয় কারণ, মুসলিম এবং ঐসব গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল হুনাইন নামক অঞ্চলে, যা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা।

ছাত্র: সেই গোত্রগুলো কি বিষয়ে একমত হয়েছিল সে সম্পর্কে নবী সাঃ কিভাবে জানলেন?

শিক্ষক: সেই গোত্রগুলো কি করতে চায় তা সম্পর্কে কিছু সংবাদ রাসূল সাঃ-এর নিকট পৌঁছেছিল। সংবাদের সত্যতা জানতে নবী সাঃ সেখানে আব্দুর রহমান বিন আবু হাদরাদ রাঃ-কে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে এক বা দুইদিন থাকেন এবং সে সম্পর্কে রাসূল সাঃ-কে খবর সরবরাহ করেন।

এটি সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের গুরুত্ব নির্দেশ করে। যাতে আমরা কাউকে লাঞ্ছিত বা অত্যাচার না করি। এটা যেমন আমাদের শত্রুদের সঙ্গে হবে, তেমনি সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধব সহ সকল মুসলমানের সাথে আমাদের সামাজিক জীবনে প্রতিটি বিয়য়েই হবে; যাতে এমন কোন সিদ্ধান্ত না নিই যা বেঠিক ও বাস্তবতা বিবর্জিত।

ছাত্র: উস্তাদ, এটা একটি ভাল জিনিস যা শিখতে পেলাম। তবে এই খবর জানতে পেরে নবী সাঃ কি করলেন?

শিক্ষক: নবী করীম সাঃ মুসলিম বাহিনীর প্রধান হয়ে মক্কা ত্যাগ করেন এবং শাওয়ালের দশ তারিখে হুনাইনে পৌঁছান।

পথিমধ্যে এক লোক বলল: 'আমরা আজ সংখ্যায় স্বল্পতার কারণে পরাজিত হব না।' অর্থাৎ এই গোত্রগুলো আমাদের বিপুল সংখ্যার কারণে আমাদের পরাজিত করতে পারবে না। এ কথাটি নবী সাঃ-এর কাছে খুবই অপন্দনীয় হল। ফলে তিনি এর পরিণতি সম্পর্কে ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

ছাত্র: উস্তাদ, কেন? এ কথায় কি কোন ভুল ছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, স্নেহের ছাত্ররা। কিছু কিছু কথা মুখে বলা খুবই হালকা বিষয়, কিন্তু তা মানুষের জন্য বিপজ্জনক। ঐ ব্যক্তি যা বলেছে তাতে মুসলিম বাহিনীর সংখ্যাধিক্যতার কারণে আত্মগরিমা চলে আসতে পারে। বস্তুত আত্ম-প্রশংসা একটি বিপজ্জনক বিষয়, কারণ এটা অহমিকার দিকে নিয়ে যেতে পারে। অথচ মহান আল্লাহ অহংকারীদের পছন্দ করেন না বা যারা তাদের ক্ষমতা ও নেয়মত নিয়ে গর্ব প্রকাশ করে তাদের পছন্দ করেন না। তিনি বিনয়তা ও বিনয়ীদের ভালবাসেন।

তাই যখন উক্ত কথাটি তার নিকট কঠিন মনে হল তখন তিনি বলতে লাগলেন: "হে আল্লাহ, আমি আপনার সাহায্যেই চেষ্টা করি, আপনার সাহায্যেই যুদ্ধ করি এবং আপনার সাহায্যে বীরত্ব প্রদর্শন করি ও বিজয়ী হই।"[১]

নবী সাঃ তার সাহাবীদেরকে এমন এক নবীর গল্প বলেছিলেন যার সঙ্গীদেরকে নিজেদের সংখ্যাধিক্যতা বিমোহিত করেছিল। সুহাইব রাঃ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: (হুনাইনের সময়ে, আল্লাহর রাসূল সাঃ ফজরের সালাতের পর এমন কিছু দিয়ে ঠোট নাড়ছিলেন যা আমরা তাকে আগে করতে দেখিনি। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনাকে এমন কিছু করতে দেখছি যা আপনি আগে কখনো করেননি, তাহলে কি কারণে আপনার ঠোট নড়ে? তিনি বললেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে একজন নবী ছিলেন যিনি তার উম্মতের বিপুল সংখ্যক লোক দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন।

(১) মুসনাদে আহমাদ: (৪/৩৩৩)।

তিনি বললেন: এই লোকগুলোকে কোন কিছুই টার্গেট করতে পারবে না। তাই আল্লাহ তায়ালা তার কাছে অহী করলেন যে, তোমার উম্মতের জন্য তিনটি বিষয়ের মধ্যে যেকোন একটি বাছাই কর: হয় আমি তাদের উপর বহিরাগত শত্রু চাপিয়ে দেব, ফলে শত্রু তাদেরকে নির্যাতন করবে। অথবা ক্ষুধায় আক্রান্ত করব। অথবা আমি তাদের উপর মৃত্যু পাঠাব। অতএব তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করে নাও। তারা বলল, শত্রুর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার আমাদের কোন শক্তি নেই। আর ক্ষুধায় আমরা ধৈর্য ধারণ করতে পারব না। তবে মৃত্যুই একমাত্র অবলম্বন হতে পারে। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর মৃত্যু চাপিয়ে দিলেন; ফলশ্রুতিতে তিন দিনের মধ্যে তাদের সত্তর হাজার লোক মারা যায়। রাসূল সাঃ বললেন: যেহেতু এরাও আধিক্যতায় মুগ্ধ হয়েছে তাই বারবার এ দোয়াটি পাঠ করছি: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل/ হে আল্লাহ, আমি আপনার সাহায্যেই চেষ্টা করি, আপনার সাহায্যেই যুদ্ধ করি এবং আপনার সাহায্যে বীরত্ব প্রদর্শন করি ও বিজয়ী হই।)[১]

ছাত্র: অনেক শিক্ষনীয় একটি ঘটনা উস্তাদ।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এতে অনেক শিক্ষা রয়েছে; যেমন এতে একজন ব্যক্তি তার চাহিদা পূরণ, লক্ষ্য অর্জন অথবা পড়াশোনায় বা জীবনে সফলতা লাভের জন্য তার ক্ষমতা, অর্থ, অবস্থান, অথবা জ্ঞান-বুদ্ধি বা বন্ধু-বান্ধব দ্বারা প্রতারিত হওয়ার বিষয়ে সতর্কতা রয়েছে। বরং তার জানা উচিত যে, তার শক্তি-সামর্থ ও উপকরণ কোন কিছুই তার কাজে আসবে না, তা যত বড় বা অসংখ্য হোক না কেন। এছাড়াও, যে ব্যক্তি বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা প্রতারিত হয় এবং আল্লাহর উপর নির্ভর না করে সেগুলির উপরই নির্ভর করে, আল্লাহ তার মনোবাসনা পূরণ না করে বা তাকে সেই উপকরণগুলো যেমন অর্থ,

(১) মুসনাদে আহমাদ: (৪/৩৩৩)।

পদ, মানসিক ক্ষমতা, মুখস্থ শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, বা অন্যান্য নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে এবং সেগুলিকে তার থেকে সরিয়ে দিয়ে তাকে শাস্তি দিতে পারেন।

এটি আমাদের আরও শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ভালবাসেন না যারা শুধু উপকরণের উপর নির্ভর করে, বরং তিনি তাদের ভালবাসেন যারা উপকরণ বিবেচনা করার সময় তাঁর উপর নির্ভর করে এবং মনে করে যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া এসব উপকরণ ক্ষতি বা উপকার করতে পারে না। এটা আমরা দোয়া এবং তাঁর উপর ভরসা করার মাধ্যমে কামনা করব।

এটি আমাদেরকে আরও শিক্ষা দেয় যে, উপকরণগুলো দুর্বল ও অল্প হলেও, আল্লাহ তায়ালা এগুলোর মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম। ইতিমধ্যে তোমরা তা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যার স্বল্পতা সত্ত্বেও তাদের বিজয় থেকে শিখতে পেরেছো।

ছাত্র: উস্তাদ, এ থেকে আমরা অনেক উপকার পেলাম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। উস্তাদ, যুদ্ধ কেমন হয়েছিল?

শিক্ষক: শত্রুরা হুনাইনের প্রান্তরে প্রস্তুতি নিল এবং যুদ্ধের দিন সকালে তাদের শক্তি ও সুসজ্জিত র‍্যাঙ্ক দিয়ে মুসলমানদের অবাক করে দিল।

মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে নামতে শুরু করলে, কিছু মুসলমান তখন যুদ্ধের জন্য তাদের অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত ছিল না। ফলে যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানরা পরাজিত হয়ে ফিরে আসে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আল্লাহর মহান হিকমত রয়েছে; তা হল তিনি মুসলমানদের নিকট স্পষ্ট করতে চান যে বিজয় সংখ্যাধিক্যের দ্বারা আসে না, বরং এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। তিনি হুনাইনের যুদ্ধের শুরুতে মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে বলেন:

﴿لَقَدۡ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٖ وَيَوۡمَ حُنَيۡنٍ إِذۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡ كَثۡرَتُكُمۡ فَلَمۡ تُغۡنِ عَنكُمۡ شَيۡـٔٗا وَضَاقَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ ثُمَّ وَلَّيۡتُم مُّدۡبِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥]

অর্থ: *[*অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু জায়গায় এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। আর যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।*]* সূরা আত-তাওবা: ২৫।

এই আয়াতে কারিমায় আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং এও স্মরণ করিয়েছেন যে, তিনি স্বীয় অনুগ্রহে বহু যুদ্ধ ও অভিযানে তাদেরকে বিজয় দান করেছেন, তাদের সংখ্যা ও শক্তি দ্বারা নয়, আর বিজয় তাঁর কাছ থেকেই আসে।

হুনাইনের দিনে তাদের সংখ্যাধিক্য তাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল; তদুপরি তারা অল্প সংখ্যক ছাড়া বাকিরা পলায়ন করেছিল। তখন নবী সাঃ বলছিলেন: (‘আমি হলাম নবী, এটা মিথ্যা নয়। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান। হে আল্লাহ, আপনি আপনার সাহায্য অবতীর্ণ করুন...’) তারপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী সাঃ ও সাহাবীদের জন্য সাহায্য নাযিল করলেন; যাতে তারা জানতে পারেন যে, সাহায্য ও বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে, আধিক্যতা ও ক্ষমতার দ্বারা আসে না।

ছাত্র: এটা রাসূল সাঃ-এর বীরত্বও প্রকাশ করে। কেননা তিনি যুদ্ধের ময়দান অবিচল ছিলেন, পলায়ন করেননি। বরং তিনি দোয়া করেছেন ও লাড়াই চালিয়ে গেছেন।

শিক্ষক: তোমরা সুন্দর বলেছো, নবী সাঃ ছিলেন সাহসিকতা ও বীরত্বের নমুনা। যুদ্ধ যখন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তখন তিনি এক মুঠো ধুলা নিয়ে শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে বললেন, “মুখগুলো বিকৃত হয়ে যাক।” ফলে আল্লাহ তাদের সকলের চোখকে সেই এক মুষ্টি

ধুলোয় ভরে দিয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করলেন, মুসলমানগণ গনীমত লাভ করল। রাসূল সাঃ মুসলিমদের মাঝে এসব গনীমত বন্টন করে দিলেন।[১]

তায়েফের যুদ্ধ:

শিক্ষক: হুনাইনের যুদ্ধের পর, আল্লাহ্‌র রাসূল সাঃ-এর সৈন্যদল পলায়নকারী লোকদের সন্ধান করে এবং তারা তায়েফের দিকে রওনা দেয়। অবশেষে নবী সাঃ তায়েফের কাছাকাছি স্থানে অবতরণ করেন। তারপর সৈন্যরা একটি একটি দুর্গ যা তায়েফ শহরে প্রবেশ করতে বাধা দেয় এমন স্থানে চলে আসলে সেখানে কিছু সাহাবীকে তীর দিয়ে হত্যা করা হয়। মুসলমানরা দুর্গে প্রবেশ করতে পারেনি। অতঃপর নবী সাঃ সেখান থেকে সরে এসে তায়েফের ঐ স্থানে চলে আসলেন, যেখানে বর্তমানে তায়েফের মসজিদ অবস্থিত, যা তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। তায়েফ অবরোধ চলেছিল চল্লিশ রাত পর্যন্ত।[২] কেউ বলেছেন বিশ দিন, কারো মতে আরো কম।

ছাত্র: এ তো অনেক দিন উস্তাদ?

শিক্ষক: হ্যাঁ, অনেক দিন। তবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য তো কষ্ট সহ্য করতেই হবে, যাতে মানুষ ইসলামের হেদায়াত লাভ করতে পারে। চিন্তা করে দেখ, তায়েফের ঐ স্থানে যখন নবী সাঃ সৈন্য বাহিনীকে অবস্থান করালেন, সেখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। এ থেকে মসজিদের গুরুত্ব অনুভূত হয় এবং দুঃখ-কষ্ট ও স্বচ্ছলতা সর্বাবস্থায় সালাত আদায়ের গুরুত্বও বুঝা যায়।

এ দীর্ঘ অবরোধ থেকে এও শিক্ষা পাওয়া যায় যে, গুরু দায়িত্ব পালনে ধৈর্য ধারণ করা জরুরী। তাই আমাদের তড়িঘড়ি করা উচিত নয়। সকল কাজে স্পৃহা থাকতে হবে যাতে আমরা আল্লাহর নিকট সওয়াব ও প্রতিদান পেতে পারি। সে সময় সাকীফ গোত্র

---

(১) সহীহ মুসলিম: (১৭৭৭)।

(২) সিরাতে ইবনে হিশাম: (৪/১২৪-১২৫)।

থেকে অত্যধিক তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সাহাবীদের কেউ কেউ বলছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাদের উপর বদ দোয়া করুন। তখন রাসূল সাঃ বলেছিলেন: (হে আল্লাহ! আপনি বনু সাকীফকে হেদায়াত দিন।)

ছাত্র: মাশাআল্লাহ! এটাই হল নবী সাঃ-এর উদার আচরণ; তিনি তাদের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করলেন না, বরং তাদের হেদায়াতের জন্য দোয়া করলেন, অথচ তারা তার বিরুদ্ধে লাড়াই করেছে।[১]

শিক্ষক: হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কেননা নবী সাঃ প্রতিশোধ পরায়ণ ছিলেন না। বরং তিনি মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাদের কুফুরী থেকে উদ্ধার করে আল্লাহর ক্ষমা এবং জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম ইসলামে দীক্ষীত করতে আন্তরিক ছিলেন।

তেমনিভাবে আমাদেরকেও মানুষকে ইসলাম ও সত্যের পথে হেদায়াতের জন্য আন্তরিক হতে হবে। পাপী মুসলিমের হেদায়াত কামনা করতে হবে; আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশোধ পরায়ণ হবো না, বরং সত্যের বিজয় চাইবো।

ছাত্র: উস্তাদ, এ অবরোধের পর কী হয়েছিল?

শিক্ষক: নবী সাঃ তায়েফ থেকে জা'রানার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, যেখানে হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ গনীমতের মালামাল ছিল। তিনি গনীমতের মাল ভাগ করতে দেরী করেছিলেন, এই আশায় যে, হাওয়াযিন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করবে এবং গনীমতের মাল তাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। কিন্তু তারা বিলম্ব করলে তিনি সেগুলো ভাগ করে দিয়ে দেন। অতঃপর হাওয়াযিন গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আসলে তাদের নিকট বন্দীদের, অর্থাৎ তাদের নারী ও ছেলেদের যারা বন্দী হয়েছিল তাদেরকে ফেরত দিয়ে দিলেন।[২]

---

(১) সুনানে তিরমিযি: (৩৯৪২)।

(২) সহীহ বুখারী: (৪৩১৮)।

ছাত্র: তিনি বড়ই উদার ও মহানুভব ছিলেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উদার ছিলেন। কারো সম্পদ দখল করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং মানুষকে কুফুরী ও জাহান্নামের আযাব থেকে উদ্ধার করাই ছিল তার মূল লক্ষ্য। তিনি গনীমতের মাল বন্টন করতে দেরী করেছিলেন; এই আশায় যে, হয়তো তারা মুসলিম হয়ে তার নিকট আগমণ করবে, তারপর তাদেরকে তাদের এই অঢেল সম্পদ যা তিনি গনীমত হিসেবে পেয়েছেন তা ফিরিয়ে দিবেন। কিন্তু তা তাদের ভাগ্যে ছিল না, তারা অনেক দেরী করেছিল। ফলে নবী সাঃ সেগুলো বন্টন করে দিয়ে দেন। তারপর অবশেষে তারা আসলে নবী সাঃ তাদের নিকট বন্দীদের হস্তান্তর করেন।

এ যুদ্ধে নবী সাঃ-এর দোয়া কবুল করা হয়; তিনি হাওয়াযেন গোত্রের জন্য দোয়া করেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর দোয়া কবুল করেছেন।

তাবুকের যুদ্ধ:

শিক্ষক: নবম হিজরির রজব মাসে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যেখানে নবী সাঃ জানতে পারেন যে, রোমানরা সিরিয়ায় বিশাল জনসমাগম করেছে। তাদের সাথে রয়েছে সমমনা বিভিন্ন গোত্র। এ যুদ্ধের মুসলিম বাহিনীকে 'জাইশুল উছরা'-ও বলা হয়।

ছাত্র: এ নামকরণের কারণ কী?

শিক্ষক: আরবীতে العسرة/উছরা এর অর্থ কষ্ট। এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল চরম গরমের মৌসুমে, তাছাড়া মুসলমানদের সরঞ্জাম ছিল সীমিত। তাই এটিকে বলা হয়: 'জাইশুল উছরা' বা 'কষ্টের বাহিনী', অথবা 'কষ্টের যুদ্ধ'। হাদিসে এসেছে, নবী সাঃ

বলেছেন: **(যে ব্যক্তি 'জাইশুল উছরা' তথা তাবুকের যুদ্ধে সেনাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেবে, তার জন্য জান্নাত রয়েছে। অতঃপর উসমান রাঃ তা ব্যবস্থা করে দেন।)**[১]

ছাত্র: আল্লাহ উসমান বিন আফফানের প্রতি সন্তুষ্ট হন, যিনি মুসলিম সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করে দিতে পেরেছিলেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন। তিনিই এই সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে জান্নাত কিনেছিলেন। তাই মহান সাহাবী উসমান বিন আফফান রাঃ-এর এই উদারতা ও দান থেকে আমাদের অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং কল্যাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যয় করতে আমাদের কার্পণ্য করা উচিত নয়। দাওয়াত, জিহাদ ও অন্যান্য ভালকাজে অর্থের গুরুত্বও আমরা এ থেকে জানতে পারি। জীবনে উপার্জনের জন্য কাজ করার গুরুত্বও আমরা এ থেকে উপলব্ধি করতে পারি; যাতে আমরা কল্যাণকর কাজে অর্থ ব্যায় করতে পারি। উসমান রাঃ একশত উট দান করেছিলেন এবং এগুলোকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতও করে দিয়েছিলেন। তারপর নবী সাঃ মানুষকে দান করার জন্য পুনরায় উৎসাহিত করলে উসমান রাঃ প্রথমে দুইশত, তারপর তিনশত উট ও এগুলোর প্রস্তুত সরঞ্জাম দান করলেন।[২]

এ থেকে বুঝা যায় যে, কষ্ট-দুর্দশা মানে একজন মুসলিম বা মুসলিম জাতি বা সমাজের প্রতি সর্বশক্তিমান আল্লাহর অসন্তুষ্টি নয়। বরং এটি তাকে মসিবতে আক্রান্ত করে তার জন্য সওয়াব ও প্রতিদান বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। আবার এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষাও হতে পারে। আল্লাহর রাসূলের যুগে মুসলিমদের এই বাহিনী প্রতিকুল সময় ও তীব্র গরম এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম ও অর্থের অভাবের কারণে এই কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিল।

---

(১) সহীহ বুখারী: (২৭৭৮)।

(২) সহীহ বুখারী: (৩৭০০)।

ছাত্র: উসমান রাঃ ছাড়া আর কেউ কি দান করেছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, প্রত্যেক মুসলমানই তার সাধ্যানুপাতে সহযোগিতা নিয়ে এসেছিলেন, এমনকি একজন তার সাধ্যের মধ্যে অর্ধ সা' তথা এক কেজির মত জিনিস নিয়ে এসেছিলেন। যার দান করার মত কিছু ছিল সে নবী সাঃ-এর নিকট তাকে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। নবী সাঃ কাউকে কাউকে বাহনের অভাবে সওয়ারীতে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি; ফলে তারা অশ্রুসিক্ত অবস্থায় ফিরে গিয়েছেন; তাদের কান্নার কারণ হল, মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাদের কোন সওয়ারী ছিল না, তাই তারা যেতে পারেনি। তাদের সততা এবং নবী সাঃ-এর প্রতি অগাধ ভালবাসার কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাদের ওযর কবুল করে আয়াত নাযিল করেছেন।[১] এ মর্মে আল্লাহ বলেন:

﴿لَّيۡسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلۡمَرۡضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ مِن سَبِيلٖۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٩١ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوۡكَ لِتَحۡمِلَهُمۡ قُلۡتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَوَلَّواْ وَّأَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ﴾ [التوبة: ٩١-٩٢]

অর্থ: [যারা দুর্বল, যারা পীড়িত এবং যারা অর্থ সাহায্যে অসমর্থ, তাদের কোন অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ ও তার রাসূলের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়। মুহসিনদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন পথ নেই; আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।* আর তাদেরও কোন অপরাধ নেই যারা আপনার কাছে বাহনের জন্য আসলে আপনি বলেছিলেন, তোমাদের জন্য কোন বাহন আমি পাচ্ছি না; তারা অশ্রুবিগলিত চোখে ফিরে গেল, কারণ তারা খরচ করার মত কিছুই পায়নি।] সূরা আত-তাওবা: ৯১-৯২।

(১) তাফসীরে ইবনে কাসীর: (২/৩৯৬)।

ছাত্র: ঐসব সাহাবীরা কি যুদ্ধে অংশগ্রহণের সওয়াব পেয়েছেন? তারা অন্যান্য সাহাবীদের সাথে যুদ্ধে যাননি?

শিক্ষক: নবী সাঃ এদের সম্পর্কেই বলেছেন: **(তোমাদের কতিপয় ভাই যারা মদিনায় রয়ে গেছে; তোমরা যে উপাত্যকা বা দুরত্বই অতিক্রম কর না কেন, তারা তোমাদের সাথেই আছে। তারা বলল: তারা মদিনায় থেকেও? তিনি বললেন: হ্যাঁ, ওযর তাদেরকে আটকে রেখেছে।)** মুসনাদে আহমাদ।

এ হাদিসটি প্রমাণ করে যে, কোন ব্যক্তি যদি ওযরের কারণে কোন সৎকাজ করতে না পারে, অথচ সে তা পালনে আন্তরিক ছিল; তাহলে আল্লাহ তাকে এই সুন্দর নিয়তের কারণে উত্তম প্রতিদান দেবেন। তাই আমাদের উচিত নিয়তের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া, যাতে এটা আমাদের জন্য রবের নিকট প্রতিদান লাভের উৎস হয়।

ছাত্র: মুসলমানগণ কি তাবুকে গিয়েছিলেন?

শিক্ষক: যে সময় মুসলিম বাহিনীকে তাবুকের দিকে অগ্রসর হতে প্রস্তুতি নিতে বলা হল, তখন মুনাফিকরা লোকদেরকে যুদ্ধে বের হতে নিরুৎসাহিত করতে লাগল। তারা নবী সাঃ-এর কাছে আপত্তি পেশ করে লোকদেরকে বলতে লাগল: তোমরা তীব্র গরমের মধ্যে যেও না। অন্তর্যামী মহান আল্লাহ সে ঘটনা বর্ণনা করে বলেন:

﴿فَرِحَ ٱلۡمُخَلَّفُونَ بِمَقۡعَدِهِمۡ خِلَٰفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓاْ أَن يُجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلۡحَرِّۗ قُلۡ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّٗاۚ لَّوۡ كَانُواْ يَفۡقَهُونَ ٨١ فَلۡيَضۡحَكُواْ قَلِيلٗا وَلۡيَبۡكُواْ كَثِيرٗا جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ﴾ [التوبة: ٨١-٨٢]

অর্থ: [যারা পিছনে রয়ে গেল তারা আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতেই আনন্দ বোধ করল এবং তাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপছন্দ করল এবং তারা বলল, গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলুন, উত্তাপে

জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম, যদি তারা বুঝত।* কাজেই তারা অল্প কিছু হেসে নিক, তারা প্রচুর কাঁদবে সেসব কাজের প্রতিফল হিসেবে যা কিছু তারা করেছে।] সূরা আত-তাওবা: ৮১-৮২।

ছাত্র: উস্তাদ, মুনাফিকরা মুসলমানদের মধ্যে একটি সমস্যা।

শিক্ষক: হ্যাঁ, মুসলিম সমাজে নেফাকী ও মুনাফিকরা এক বড় সমস্যা। কেননা তারা প্রকাশ্যে নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা কুফুরী লালন করে। তাই একজন মুসলমানকে তাদের আচরন ও চরিত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে; যেমন মুসলমানদের ভালো কাজ থেকে নিরুৎসাহিত করা, তাদেরকে অলস হতে উৎসাহিত করা অথবা সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্যে পিছিয়ে থাকার জন্য ছাড়ের সন্ধান করা।

ছাত্র: উস্তাদ, মুনাফিকদের কথায় মুসলিমরা কি প্রভাবিত হয়েছিল?

শিক্ষক: মুসলমানরা মুনাফিকদের কথায় প্রভাবিত হয়নি, বরং তারা নবী সাঃ-এর নিকট দ্রুত গিয়েছিল এবং তার সাথে যুদ্ধে গিয়েছিল- যেমনটি কা'ব বিন মালিক রাঃ বর্ণনা করে বলেছিলেন: (আল্লাহর রাসূল সাঃ-এর সাথে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল অনেক; কোন খাতায় তাদের একত্রিত করা সম্ভব না)[১] অর্থাৎ তারা সংখ্যায় অনেক হওয়ায় তাদের নাম একটি বইয়ে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব না।

ছাত্র: চমৎকার কোন মুসলিম নবী সাঃ-এর পেছনে থেকে যায়নি।

শিক্ষক: হ্যাঁ, শুধুমাত্র কা'ব বিন মালিক, হিলাল বিন উমাইয়া এবং মুরারা বিন রাবিয়া আল-আমিরী রাঃ এবং যাদের বৈধ অজুহাত ছিল তারা ছাড়া কেউ পিছিয়ে থাকেননি।[২]

---

(১) সহীহ বুখারী: (৪৪১৮)।

(২) সহীহ মুসলিম: (২৭৬৯)।

উক্ত তিনজনের একটি অদ্ভুত ঘটনা আছে: যখন আল্লাহর রাসূল সাঃ মদিনায় ফিরে আসেন, তখন যারা নবী সাঃ-এর সাথে যুদ্ধ করেনি তারা প্রত্যেকেই তার কাছে ক্ষমা চায়। তিনি তাদের অজুহাত গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। তবে এই তিনজন ছাড়া; তারা বলেছিল আপনার সাথে যুদ্ধে না যাওয়ার পেছনে আমাদের কোন কারণ ছিল না। কা'ব রাঃ বলেছিলেন: (আজ যদি আমি মিথ্যা বলে আপনাকে আমার প্রতি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি, তাহলে শিঘ্রই আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমার প্রতি ক্রোধান্বিত করে দিতে পারেন।... আল্লাহর কসম, না, আমার কোন ওযর ছিল না।...) সহীহ মুসলিম।

ছাত্র: অবস্থা ছিল খুবই বিস্ময়কর ও জটিল!

শিক্ষক: হ্যাঁ, কেননা আল্লাহ তায়ালা সবই জানেন; ফলে নবী সাঃ-এর নিকট মিথ্যা বলাতে তার কোন লাভ নেই। তাই নবী সাঃ এই তিনজনকে ছেড়ে দিয়েছিলেন যাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে কোন ফয়সালা আসে। নবী সাঃ তাদেরকে বয়কট করেছিলেন এবং লোকজনকেও তাদের সাথে কথা বলতে মানা করে দিয়েছিলেন; ফলে দুনিয়া তাদের নিকট সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একনিষ্ঠভাবে অনুতপ্ত হওয়ার কারণে অবশেষে চল্লিশ দিন পর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন ও তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে কয়েকটি আয়াত নাযিল করেছেন যা আমরা তেলাওয়াত করে থাকি। আল্লাহ বলেন:

﴿وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بِمَا رَحُبَتۡ وَضَاقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَنفُسُهُمۡ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلۡجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيۡهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ لِيَتُوبُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١١٨]

অর্থ: [আর তিনি তাওবা কবুল করলেন অন্য তিনজনেরও, যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল; অবশেষে পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের প্রতি সংকীর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তাদের নিকট তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল, আর তারা উপলব্ধি

করেছিল যে, আল্লাহর পাঁকড়াও থেকে বাঁচার জন্য তিনি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। তারপর তিনি তাদের তাওবা কবুল করলেন যাতে তারা তাওবায় স্থির থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।] সূরা আত-তাওবা: ১১৮।

ছাত্র: যুদ্ধের কী খবর? তাবুকের যুদ্ধ কি সংঘটিত হয়েছিল?

শিক্ষক: আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী ও সকল সাহাবীকে নিরাপদ রেখেছেন। তাবুকে গিয়ে দেখেন শত্রুরা সবাই পলায়ন করেছে; কাউকেই সেখানে পাননি। ফলে মুসলিমগণ বিনা যুদ্ধে তাবুক বিজয় করে সবাই নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসেন- আলহামদুলিল্লাহ। মদিনাবাসী তাদের নবী সাঃ ও সাহাবীদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সাদরে গ্রহণ করে নেয়।[১]

প্রতিনিধিদল আগমনের বছর:

শিক্ষক: হিজরী নবম সালকে প্রতিনিধিদল আগমনের বছর বলা হয়। কেননা তাঁর রাসূলকে মক্কা বিজয় দান করলেন, সাকিফ গোত্র ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাবুকে বিনাযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হল- তখন সর্বদিক থেকে আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধিদল আগমন করে নবী সাঃ-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করতে লাগল।

ছাত্র: উস্তাদ, প্রতিনিধিদলের আগমন কি অনেক বেশি ছিল?

শিক্ষক: হ্যাঁ, অনেক ছিল। তাদের সংখ্যা (৬০) ষাটে পৌঁছেছিল। এটা ধৈর্য্য, দৃঢ়তা, অধ্যাবসায় ও তড়িৎ রেজাল্ট কামনা না করার গুরুত্ব প্রমাণ করে। রাসূল সাঃ নিজ সম্প্রদায়ের অত্যাচার ধৈর্য্যের মাধ্যমে মোকাবেলা করেছেন, তারপর মদিনায় হিজরত করেছেন এবং নিজ সম্প্রদায় ও অন্যদের দ্বারা যুদ্ধে আক্রান্ত হয়েছেন; তিনি এসবে ধৈর্য্য ধরেছেন, দৃঢ়তা দেখিয়েছেন এবং আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত প্রদানে প্রচেষ্টা

(১) সহীহ বুখারী: (৪৪২৭)।

অব্যাহত রেখেছেন। তারপরেই বিজয় সুনিশ্চিত হয়েছে; এর ফলেই বিভিন্ন প্রতিনিধিদল তার নিকট আগমন করেছে। কেউ ইসলাম গ্রহণ করেছে, কেউ শান্তিচুক্তি করেছে এবং অনেকেই আনুগত্যের অঙ্গিকার তথা বায়আত গ্রহণ করেছে।

কাজেই আমরা এ থেকে ধৈর্য্য, সাধনা ও সম্ভবপর সকল ভালকাজ সম্পাদনের বিষয়ে নবী সাঃ-এর নীতি গ্রহণ করা উচিত মর্মে শিক্ষা নিতে পারি।

বিদায় হজ:

শিক্ষক: হিজরী নয় সনের শেষ দিকে এই আয়াতটি নাযিল হল:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]

অর্থ: [আর মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ ঘরের হজ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর যে কেউ কুফরী করল সে জেনে রাখুক, নিশ্চয় আল্লাহ্ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।] সূরা আলে ইমরান: ৯৭। ফলে নবী সাঃ হজ সম্পাদনে আর বিলম্ব করেননি।[১] পরের বছর দশম সালে হজ সম্পাদনের ঘোষণা দিলেন; তাই বহু মানুষ মদিনায় উপস্থিত হল রাসূল সাঃ-এর অনুকরণ করার জন্য, যাতে তারা সেভাবেই আমল করতে পারে যেভাবে নবী সাঃ পালন করেন।

ছাত্র: মুসলিমগণ নবী সাঃ-এর অনুকরণে খুবই আগ্রহী ছিলেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, সাহাবায়ে কেরাম নবী সাঃ-কে অনুসরণ করতে খুব আগ্রহী ছিলেন। তাই তারা নবী সাঃ-এর কাছ থেকে যা দেখেছেন বা শুনেছেন তা আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ... এর অর্থ হল, আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর রাসূলের আদর্শ অনুসরণ

(১) সহীহ মুসলিম: (১২১৮)।

করা এবং তার সুন্নাহ থেকে বিয়োজন বা সংযোজন না করা অথবা তাতে এমন কিছু উদ্ভাবন না করা যা রাসূলুল্লাহ সাঃ ও তার সাহাবীগণ কেউই অনুসরণ করেননি।

ছাত্র: এটা কি নবী সাঃ-এর প্রথম হজ ছিল?

শিক্ষক: হিজরীর নবম বর্ষের আগে আল্লাহ তায়ালা হজ ফরজ করেননি। তাই নবী সাঃ এর আগে হজ সম্পাদন করেননি। ফলে এ হজটিই ছিল প্রথম হজ, এবং তিনি এর পরে হজ আর করেননি।[১] কারণ এর পরে তিনি সাঃ মারা যান। এ জন্যই এটিকে 'বিদায় হজ' বলা হয়।

ছাত্র: উস্তাদ, এই হজের মধ্যে কী ছিল?

শিক্ষক: আরাফার দিনে এই আয়াতটি নাযিল হয়:

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ﴾ [المائدة: ٣]

অর্থ: [আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।] সূরা আল-মায়েদা: ৩। এ আয়াতটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই ধর্মের পূর্ণতা প্রদান করে অনুগ্রহ করেছেন। তাই আমাদের এতে সংযোজন বা বিয়োজনের কোন প্রয়োজন নেই; কেননা এটা সবকিছুতে নিখুঁত ও পরিপূর্ণ। আমাদের যা করতে হবে তা হল: এটি শিখতে হবে, বুঝতে হবে এবং এর উপর আমল করতে হবে। তাছাড়া এই ধর্মটি একটি মহান নেয়ামত, কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ এটাকে নেয়ামত বলেছেন। এ জন্য আমাদের উচিত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং তা জীবনে বাস্তবায়ন করে ও এর দিকে মানুষকে আহবান করে যত্নশীল হওয়া। কাজেই সমস্ত প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্লাহর জন্য।

---

(১) সহীহ বুখারী: (৪৪০৪)।

নবী সাঃ এই হজে একটি খুতবা প্রদান করেন। তিনি সেই খুতবায় বলেন: *(**জেনে রাখ! তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেমন আজকের এ মাস, তোমাদের এ শহর, আজকের এ দিন সম্মানিত।**)* সহীহ মুসলিম।

জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি কুরবানীর দিন নবী সাঃ-কে সওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি এবং তিনি বলছিলেন: *(**আমার নিকট থেকে তোমরা হজের নিয়ম-কানুন শিখে নাও। কারণ আমি জানি না এই হজের পর আমি আর হজ করতে পারব কিনা।**)* সহীহ মুসলিম। এটি একটি ইঙ্গিত যে, নবী সাঃ-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ সাঃ থেকে শিক্ষা গ্রহণ এবং তাকে অনুসরণে আগ্রহী থাকার প্রতি আহ্বান।

অতএব, আমাদের উচিত এ দ্বীন শিক্ষা করা, এর জন্য সাধনা করা এবং নবী সাঃ-এর অনুসরণ করে চলা।

সিরিয়ায় উসামা বিন যায়েদের অভিযান:

শিক্ষক: রাসূল সাঃ সফর মাসের শেষ দিকে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকদের প্রতি আহ্বান জানান। উসামা রাঃ-এর নেতৃত্বে এর প্রস্তুতি ছিল শনিবারে- নবী সাঃ-এর মৃত্যুর দুই দিন আগে। উসামা রাঃ-এর সাথে যুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করতে আহবান জানানো হয় আবু বকর, উমর ও আবু উবাইদা রাঃ সহ সিনিয়র মুহাজির ও আনসারী সাহাবীগণকে। এটি ছিল রাসূল সাঃ প্রেরিত সর্বশেষ অভিযান।[১]

এই অভিযানে লক্ষণীয় বিষয় হল যে, নবী সাঃ অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি উম্মতের প্রতি যত্নবান ছিলেন এবং তাদের রক্ষায় আন্তরিক ছিলেন। এমনকি মৃত্যুর দুদিন আগেও তিনি অভিযানের জন্য সেনাদল প্রস্তুত করেন। এ বিষয়টি আমাদেরকে জীবনের শেষ

(১) ফতহুল বারী: *(৮/১৫২)*।

মুহূর্ত পর্যন্ত আমল করতে, সংগ্রাম করতে, জাতির উপকার করতে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিজেদেরকে উজার করতে অনুপ্রাণিত করে।

ছাত্র: শ্রদ্ধেয় উস্তাদ, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষক: উসামা রাঃ ছিলেন কম বয়সের।[১]

এটি ইঙ্গিত দেয় যে, তিনি বয়স্ক লোকের নেতৃত্ব পছন্দ করতেন না। বরং সবচেয়ে দক্ষ ও শক্তিশালী লোকের নেতৃত্বই তিনি পছন্দ করতেন। কারণ এটি এমন একটি দায়িত্ব যা মানুষের বিভিন্ন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সে হিসেবে মানুষের অবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। উপরন্তু এর অর্থ এই নয় যে, বয়স্কদেরকে অবমুল্যায়ন করা।

এর মানে হল, আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে নবীনদের নেতৃত্ব মেনে নিতে হবে; এ কাজে সে যদি বড়দের থেকে ভালো হয়। আমাদের উচিত উক্ত দায়িত্ব পালনে তাকে সাপোর্ট দেয়া, সহযোগিতা করা ও তার সঙ্গে থাকা।

এর মানে হল, একজন অল্প বয়স্ক ব্যক্তির কিছু দিক থেকে একজন বয়স্ক ব্যক্তির চেয়ে বেশি সক্ষমতা থাকতে পারে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটি অবশ্যই বিবেচনায় নেওয়া উচিত।

ছাত্র: প্রিয় উস্তাদ, এই অভিযান প্রস্তুতি থেকে আমরা অনেক উপকার পেয়েছি, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

কিন্তু এই অভিযানের কী ঘটেছিল- যখন এটি আল্লাহর রাসূল সাঃ-এর ইন্তেকালের সাথে মিলে গিয়েছিল?

---

(১) তাবাকাতুল কুবরা: (২/১৯০)।

শিক্ষক: মুসলমানরা সিরিয়ায় যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে জুরফ নামক স্থানে ক্যাম্প করেছিল। কিন্তু নবী সাঃ ইন্তেকাল করলে তারা মদিনায় প্রবেশ করেন।

নবী সাঃ-এর মৃত্যুর পর, আবু বকর সিদ্দিক রাঃ মুসলমানদের খিলাফত গ্রহণ করেন। তারপর তিনি এই অভিযানের প্রস্তুতি এবং আল্লাহর রাসূলের আদেশ বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন। ফলে মুসলমানদের খলিফা নিযুক্ত হয়ে আবু বকর সিদ্দিক রাঃ প্রথম যে জিনিসটি প্রস্তুত করেছিলেন তা ছিল এই অভিযান। সেনাবাহিনীর সংখ্যা ছিল তিন হাজার।[১]

এটা নবী সাঃ যা চেয়েছিলেন তা বাস্তবায়নে খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাঃ-এর আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়। এটি আমাদেরকে নবী সাঃ-এর নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে আন্তরিক থাকতে এবং তিনি যে বিষয়ে আমাদের সতর্ক করেছেন তা থেকে দূরে থাকার জন্য প্ররোচিত করে।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, একজন নেতা বা শাসকের ভালো নির্দেশনা থাকলে তার মৃত্যুর পরও সেটা কার্যকর করার গুরুত্ব রয়েছে।

ছাত্র: উসামা রাঃ-এর সাথে কি সব সাহাবী গিয়েছিলেন?

শিক্ষক: তোমরা আগেই জেনেছ যে, এই অভিযানে আবু বকর ও উমর রাঃ ছিলেন। কিন্তু আবু বকর রাঃ খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তার পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এছাড়াও, উমর বিন খাত্তাবের প্রতি তার প্রয়োজনীয়তাও বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি সেনাপতি উসামা বিন যায়েদের কাছে উমর বিন খাত্তাব রাঃ-কে থাকতে দেওয়ার অনুমতি চাইলেন। ফলে উসামা বিন যায়েদ রাঃ উমর রাঃ-কে অভিযানে না যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

---

(১) ফতহুল বারী: (৮/১৫২)।

ছাত্র: চমৎকার, তিনি একজন খলীফা হয়ে অভিযানের সেনাপতির কাছে অনুমতি চাইছেন?

শিক্ষক: হ্যাঁ, ইসলাম শৃঙ্খলা ও সম্মানের ধর্ম। আবু বকর রাঃ দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, এখন তিনি খলিফা; তিনি সমস্ত মুসলিম এবং তাদের সমস্ত ভূখন্ডের শাসক। তবুও তিনি উসামা বিন যায়েদ রাঃ-এর নিকট উমর বিন খাত্তাব রাঃ-এর জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন।

এটা আমাদেরকে অন্যদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করে, এমনকি আমরা তাদের চেয়ে উচ্চ পদের হলেও।

এটি আমাদেরকে নিয়ম ও তা অনুসরণের গুরুত্ব সম্পর্কেও জানিয়ে দেয় এবং আমরা যেন নিয়মের বাইরে না যাই- অবস্থান বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও।

ছাত্র: অভিযানটির কী হল?

শিক্ষক: এ অভিযান পরিচালনায় সেনাবাহিনী সিরিয়ায় গিয়েছিল এবং তারা প্রচুর গনীমত সহ ফিরে আসে। এতে কোন মুসলমান হতাহত হয়নি।[১]

(১) তাবাকাতুল কুবরা: (২/১৯১)।

ষষ্ঠ অধ্যায়:

নবী সাঃ-এর অসুস্থতা ও মৃত্যু

নবী সাঃ-এর অসুস্থতা ও মৃত্যু:

শিক্ষক: রাসূলের সাহাবীদের প্রতি আল্লাহর রহমতের একটি হলো: তিনি তাদেরকে রাসূল সাঃ-এর মৃত্যু আসন্ন মর্মে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কারণ তার মৃত্যুর মতো আর কোনো দুঃখজনক ট্রাজেডি নেই। তাই তো নবী সাঃ বলেছেন: **(যখন তোমাদের কারো উপর মসিবত আপতিত হয়, তখন সে যেন আমার (মৃত্যুর) দ্বারা তার উপর আগত মসিবতের কথা স্মরণ করে। কেননা, তা হল সবচেয়ে বড় মসিবতসমূহের অন্যতম।)**[১]

ছাত্র: এটা সত্য যে, নবী সাঃ-এর মৃত্যু তার সাহাবীদের জন্য একটি বিপর্যয়- যারা তার সাথে বসবাস করেছেন ও তাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এটি আমাদের জন্যও একটি বিপর্যয়। কিন্তু মহান আল্লাহ কিভাবে নবী সাঃ ও সাহাবীদেরকে স্পষ্ট করে দিলেন যে তার সময় ঘনিয়ে আসছে?

শিক্ষক: সাহাবায়ে কেরাম নবী সাঃ-এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসা বেশ কিছু লক্ষণ থেকে জানতে পেরেছিলেন। তারমধ্যে অন্যতম হল সূরা আল-নাসর নাযিল হওয়া। হাদিসে এসেছে: ...

তারপর উমর রাঃ ইবনে আব্বাস রাঃ-কে (إذا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন: এতে রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর ওফাতের ইঙ্গিত রয়েছে, যা তাকে জানানো হয়েছে। এরপর তিনি সূরাটি শেষে পর্যন্ত তেলওয়াত করলেন। উমার রাঃ বললেন: তুমি যা জান এ বিষয়ে আমি এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না।)[২]

---

(১) তাবাকাতুল কুবরা: (২/২৭৫)।

(২) সহীহ বুখারী: (৪৪৩০)।

রাসূল সাঃ বিদায় হজের সময় বলেছেন: (“এটা হচ্ছে বড় হজের দিন।” তারপর তিনি বলতে লাগলেন: “হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।” এরপর তিনি মানুষদেরকে বিদায় জানাতে লাগলেন, আর মানুষ বলতে লাগলো এটাই বিদায় হজ।)[১]

তাছাড়া নবী সাঃ মুয়ায বিন জাবাল রাঃ-কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় বললেন: (হে মুয়ায! সম্ভবত এ বছরের পর তুমি আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। এমনও হতে পারে তুমি আমার মাসজিদ ও আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে। তখন মুয়ায রাঃ রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর বিচ্ছেদ চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন।) মুসনাদে আহমাদ।

এটি ছিল আহলে বাইতের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তার সম্মানিত সাহাবীদের প্রতিও।

ছাত্র: আল্লাহর কসম, এগুলো মহান ও প্রভাবশালী নিদর্শন ছিল।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এগুলি খুব প্রভাবশালী লক্ষণ ছিল। যারা তার সাথে থাকতেন ও তাকে দেখেছেন, তিনি তাদের সাথে কথা বলতেন, তাদের সাথে মিশতেন এবং তাদের সাথে খেতেন- তাদের অবস্থাটা কেমন? তাদের পক্ষে তার সাথে বিচ্ছেদ হওয়া খুবই কঠিন ছিল। তবে আল্লাহ তায়ালা এই লক্ষণগুলির দ্বারা তাদের প্রতি করুণা করেছেন, তারপরে তাদেরকে ধৈর্য দান করেছিলেন।

ছাত্র: নবী সাঃ কিভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন?

শিক্ষক: সফর মাসের শেষ রাত্রিগুলোতে বা রবিউল আউয়াল মাসের শুরুতে ছিল নবী করীম সাঃ-এর অসুস্থতার সূচনা। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাঃ বলেন: **(যখন রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর রোগযন্ত্রণা বেড়ে গেল এবং তীব্র আকার ধারণ করল, তখন তিনি তার স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চাইলেন যে, তিনি যেন আমার গৃহে অসুস্থকালীন সময়**

(১) সহীহ বুখারী: (১৭৪২)।

অবস্থান করতে পারেন। এরপর তাঁর অনুমতি দিলে তিনি দু'ব্যক্তির সাহায্যে যমীনের উপর তার দু'পা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে বেড়িয়ে আসলেন।) সহীহ বুখারী।

ছাত্র: রাসূল সাঃ কেন স্ত্রীদের কাছে অনুমতি চাইলেন?

শিক্ষক: সুন্দর প্রশ্ন। নবী সাঃ তার স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফ কায়েমে খুবই আন্তরিক ছিলেন। তাই তিনি প্রত্যেকের জন্য এক দিন করে পালা বরাদ্দ করেছিলেন। যখন তার অসুস্থতা গুরুতর হয়ে ওঠে, তখন তিনি তাদের এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাতায়াত করতে পাচ্ছিলেন না। ফলে তাদের অধিকার রক্ষার্থে এবং তাদের মন খুশি রাখার জন্য তিনি তাদের কাছে আয়েশা রাঃ-এর ঘরে থাকার অনুমতি চাইলেন। তারা সবাই তাকে অনুমতি প্রদান করেন। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ছাত্র: নবী সাঃ কি কোন নির্দিষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন?

শিক্ষক: নবীজি সাঃ যে পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ করছিলেন তা ছিল খায়বারে তাকে দেওয়া বিষের প্রভাব। তিনি সেই অসুস্থতার সময় আয়েশা রাঃ-কে বলতেন: **(আমি খায়বারে যে খাবার খেয়েছি তা থেকে আমি এখনও যন্ত্রণা অনুভব করি।)** সহীহ বুখারী।

অসুস্থতার তীব্রতার কারণে, তিনি সাতটি মশকের পানি ঢেলে তার উপর ঢেলে দিতে বললেন, যাতে তিনি লোকদের কাছে যেতে পারেন এবং তাদেরকে অসিয়ত করতে পারেন। তাই তারা তার উপর পানি ঢেলে দিল, তারপর তিনি জনসমক্ষে গেলেন এবং তাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন ও তাদেরকে নসীহা করলেন।[১]

(১) সহীহ বুখারী: (৪৪৪২)।

তিনি অসুস্থতার তীব্রতার কারণে মুখের উপর তার চাদর নিক্ষেপ করছিলেন এবং বলছিলেন: **(ইহুদী ও খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহ অভিশাপ দিন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে।)** সহীহ বুখারী।

ছাত্র: উস্তাদ, এর অর্থ কি কবরের উপর মসজিদ স্থাপন করা জায়েয নয়?

শিক্ষক: তোমরা ঠিকই বুঝেছ। নবী সাঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহর একেশ্বরবাদ নিয়ে এসেছিলেন; যেন আমরা তাঁরই ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করি। তাছাড়া মসজিদগুলো কেবলমাত্র আল্লাহরই- যেমনটি আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا﴾ [الجن: ١٨]

অর্থ: [আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। কাজেই আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে ডেকো না।] সূরা আল-জ্বিন: ১৮। এ ব্যাপারে রাসূল সাঃ-এর আন্তরিকতার কারণে তিনি চরম অসুস্থতার মাঝেও আমাদেরকে সতর্ক করেছেন- যা নিশ্চিত করে যে, এটা একেবারেই হারাম।

ছাত্র: তিনি তার উম্মতকে শিরক থেকে রক্ষা করতে আগ্রহী ছিলেন, আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন। তিনি উম্মতের উপকার করতে ও তাদেরকে নসীহা করতে তার শেষ মুহূর্তেও আগ্রহী ছিলেন।

শিক্ষক: হ্যাঁ, তিনি উম্মতের হিতাকাঙ্খী ছিলেন- যেমনটি স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করে বলেছেন:

﴿لَقَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولٞ مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنِتُّمۡ حَرِيصٌ عَلَيۡكُم بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَءُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ [التوبة: ١٢٨]

অর্থ: [অবশ্যই তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতেই একজন রাসূল এসেছেন, তোমাদের যে দুঃখ-কষ্ট হয়ে থাকে তা তার জন্য বড়ই বেদনাদায়ক। তিনি তোমাদের

মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি তিনি করুণাশীল ও অতি দয়ালু।*]* সূরা আত-তাওবা: ১২৮। বরং রাসূল সাঃ ঐ অসুস্থতার অবস্থায় বলছিলেন: *(***সালাত, আর তোমাদের চাকর চাকরানী-দাসদাসীর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।***)* সুনানে ইবনে মাজাহ। তিনি এ কথাটি তাদেরকে বারবার বলছিলেন; যা নামাজের গুরুত্ব ও এর প্রতি যত্নশীল হওয়ার পাশাপাশি নারীর অধিকারের গুরুত্ব নির্দেশ করে।

রাসূল সাঃ নিজের হাত পানিতে প্রবেশ করিয়ে তা দিয়ে চেহারা মুছতে ছিলেন এবং বলছিলেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"[১] উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাঃ হতে বর্ণিত, নবী সাঃ-এর ইন্তিকালের পূর্বে যখন তার পিঠ আমার উপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিল, তখন আমি কান ঝুঁকিয়ে দিয়ে তাকে বলতে শুনেছি, **"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন এবং মহান বন্ধুর সঙ্গে আমাকে মিলিত করুন।**" সহীহ বুখারী। তিনি আরো বলেছেন: *(***তাদের সাথে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন।***)* সহীহ বুখারী। তাছাড়া *(***নবী সাঃ সুস্থ থাকাবস্থায় বলতেন, "কোন নবীর জান কবয করা হয় না, যতক্ষণ না তাকে জান্নাতে তার ঠিকানা দেখানো হয় এবং তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হয়।"** -আয়েশা রাঃ বলেন:- **এরপর যখন তার মৃত্যুকাল উপস্থিত হলো, তখন তার মাথাটা আমার উরুর উপর ছিল। কিছুক্ষন অজ্ঞান থাকার পর তার জ্ঞান ফিরে এলো। তখন তিনি ছাদের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "আল্লাহুম্মা আর-রাফীকাল আলা" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি শ্রেষ্ট বন্ধুকে গ্রহন করলাম। তখন আমি বললাম: এখন থেকে তিনি আর আমাদের পছন্দ করবেন না। আর এটাও বুঝতে পারলাম যে, তিনি সুস্থ অবস্থায় আমাদের কাছে যা বলতেন এটি তাই। আয়েশা রাঃ বলেন, তার সর্বশেষ বাক্য ছিল এটা: "আল্লাহুম্মা আর-রাফীকাল আলা" অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে গ্রহণ করলাম।***)*** সহীহ বুখারী। তারপরেই রাসূল সাঃ-এর ইন্তিকাল হয়।

---

(১) সহীহ বুখারী: *(*৪৪৪৯*)*।

ছাত্র: সেই মুহূর্তটি সহজ ছিল না।

শিক্ষক: হ্যাঁ, এটা এক কঠিন পরিস্থিতি ও একটি বড় ঘটনা ছিল। তাই যখন সাহাবায়ে কেরাম তার মৃত্যুর খবর পেয়েছিলেন, তখন তারা বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন এবং তারা মসজিদে নববীতে সমবেত হন। অতঃপর আবু বকর সিদ্দিক রাঃ উপস্থিত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় ও তাঁর প্রশংসা করলেন এবং বললেন: "অতঃপর আপনাদের মধ্যে যারা মুহাম্মাদ সাঃ-এর ইবাদত করতেন, তিনি তো ইন্তিকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করতেন (জেনে রাখুন) আল্লাহ চিরঞ্জীব, কখনো মরবেন না।"

তিনি আল্লাহর এ বাণী উল্লেখ করলেন:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠]

অর্থ: [নিশ্চয় তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।] সূরা আয-যুমার: ৩০। তারপর নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّٰكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]

অর্থ: [আর মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র; তার আগে বহু রাসূল গত হয়েছেন। কাজেই যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? আর কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না; আর আল্লাহ্ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন।] সূরা আলে ইমরান: ১৪৪। মানুষজন কাঁদতে লাগলো।

নবী সাঃ-এর অসুস্থতার সময়কাল ছিল আনুমানিক তের দিন এবং তার মৃত্যু হয় সোমবার ১২ই রবিউল আওয়াল তারিখে। তাকে মঙ্গলবার তার বস্ত্রসহ ধৌত করানো হয় এবং আব্বাস, আলী, ফযল, উসামা বিন যায়েদ, আউস বিন খাওলি ও শাকরান রাঃ তাকে গোসল করিয়ে দেন। তাকে তিনটি সাদা ইয়েমেনি পোশাকে কাফন পরানো

হয়েছিল, তারপর তাকে তার বিছানায় রাখা হয়েছিল। লোকেরা দলে দলে প্রবেশ করে নিজেরা তার জানাযা পড়ে চলে যায়, কেউ তার জানাযায় ইমামতি করেননি। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাঃ-এর হুজরার যেখানে তিনি ইন্তিকাল করেন সেখানেই তার কবর খনন করে দাফন করা হয়।(১) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।(২) ইন্তিকালের সময় তার বর্মটি ত্রিশ সা' এর বিনিময়ে এক ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিল।(৩) তিনি কোন দীনার-দিরহাম রেখে যাননি। আমর বিন হারেস রাঃ বলেন: *(***নবী সাঃ তার সাদা খচ্চর, কিছু যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সামান্য ভূমি ব্যতীত দীনার-দিরহাম বা দাস-দাসী কিছুই রেখে যাননি। এগুলোও তিনি সদকা স্বরূপ ছেড়ে যান।***)* সহীহ বুখারী।

ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হে আল্লাহ*!* আমাদেরকে আপনার ভালোবাসা ও আপনার নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর ভালোবাসা দান করুন এবং আপনার কিতাব ও নবী মুহাম্মদের সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন। আমাদেরকে তার সাথে উচ্চতম জান্নাতুল ফেরদাউসে সমবেত করুন। আমাদেরকে আপনার কিতাব ও নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর সুন্নাতের অনুসারী, হেদায়াতপ্রাপ্ত ও হেদায়াতের পথে আহবানকারী করুন।

---

(১) তাবাকাতুল কুবরা*: (*২/২৯২*)*।

(২) সহীহ বুখারী*: (*৪৪৬৬*)*।

(৩) সহীহ বুখারী*: (*৪৪৬৭*)*।

উপসংহার

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি স্বীয় অনুগ্রহে এই বইটি সম্পূর্ণ করার তাওফীক প্রদান করেছেন। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী ও আদর্শ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহর উপর।

আল্লাহর একটি অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের জন্য মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাঃ-কে নবী ও রাসূল হিসেবে মনোনীত করেছেন। তিনি সর্বোত্তম গুণাবলী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ছিলেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ দ্বীনকে পূর্ণতা দিয়েছেন, ইসলামের নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে সুস্পষ্ট পথে রেখে গিয়েছেন। তিনিই আমাদেরকে ইবাদত, নৈতিকতা এবং স্বাভাবিক ও সংকটের সময়ের আচরণ পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তার সৌরভময় জীবনী হয়ে ওঠেছে মুসলমানদের পাথেয় এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও সাফল্য লাভের ্।

আল্লাহর আরেকটি অনুগ্রহ হল, তিনি আমাদের জন্য নবী সাঃ-এর সুন্নাহ এবং তার জীবনী সংরক্ষণ করেছেন, যা মুসলমানগণ প্রজন্ম পর প্রজন্ম ধরে উষ্ণতা ও সম্মানের সাথে লালন করছে। আমরা তা এমনভাবে অধ্যয়ন করি ও শিখি যেন তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। কাজেই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এটা শেখা ও তদানুযায়ী আমল করা এবং আমাদের সন্তান, পরিবার ও সমস্ত মুসলমানদের তা শেখানো আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই আমরা এটাকে সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি যাতে তারা আমাদের বিশ্বস্ত নবী সাঃ-কে জানতে পারে। তবেই তারা আল্লাহর দ্বীন গ্রহণে তার গুণাবলী ও কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হবে। এটা এমন দ্বীন যা মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন মানুষকে মন্দ ও ফেতনা থেকে উদ্ধার করে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে এবং জাহান্নাম থেকে জান্নাতে প্রবেশ

করাতে। এ জান্নাতের জন্য আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সাঃ-এর পথ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আপনার রাসূল মুহাম্মাদ সাঃ-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে তার জীবনাদর্শ, আচার-আচরণ ও সুন্নাহ মেনে চলার তাওফীক দিন এবং জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে তার সঙ্গ দান করুন। আমাদেরকে আপনার সত্য দ্বীনের পথপ্রদর্শক, প্রচারক ও প্রসারকারী করুন, আমাদের সাধ্যমত কল্যাণের প্রতিটি দিকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দান করুন, হে বিশ্বজগতের প্রভু। নেক আমলের মাধ্যমে আমাদের আমলের পরিসমাপ্তি দিন এবং আমাদেরকে সেসব নবী, সিদ্দিকীন ও শহীদদের সাথে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চতম স্থানে সমবেত করুন যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন।

হে আল্লাহ! এই কিতাবকে কিয়ামত পর্যন্ত বরকতময়, উপকারী এবং সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ, তার পরিবারবর্গ এবং সকল সাহাবীর উপর।

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়: জন্ম থেকে নবুওয়ত লাভ পর্যন্ত

রাসূল সাঃ-এর জন্ম

জন্মস্থান

নবী সাঃ-এর জন্মতারিখ

নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর বংশ

নবী মুহাম্মাদ সাঃ-এর অনাথ অবস্থা

দাদা আব্দুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধান

চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধান

কর্মজীবন

নবী সাঃ-এর বিবাহ

হিলফুল ফুযূল

কাবাঘর নির্মাণ

দ্বিতীয় অধ্যায়: নবুওয়ত লাভ হতে হিজরত পর্যন্ত

নবুওয়ত লাভ

দাওয়াতের প্রথম পর্যায়

জ্বিনদের ইসলাম গ্রহণ

দাওয়াতের দ্বিতীয় পর্যায়

নবী সাঃ-কে কষ্টদানের নানা উপায়

ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের উপর নির্যাতনের নানা ধরণ

নবী সাঃ-এর রিসালতের প্রচার-প্রসার বন্ধে সংলাপের আয়োজন

চাচা আবু তালিবের সাথে সংলাপ

উতবা বিন রাবিয়া'র সংলাপ

মুজেযা/অলৌকিক বিষয় সংঘটিত করার দাবি উত্থাপন

আবিসিনিয়ায় হিজরত

হিজরতের এলাকায় মুসলিমদেরকে মোকাবেলা

হামযা রাঃ-এর ইসলাম গ্রহণ

উমর বিন খাত্তাব রাঃ-এর ইসলাম গ্রহণ

শিয়াবে আবি তালিবের অবরোধ

আবু তালিব ও খাদীজা রাঃ-এর মৃত্যু

তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা

ইসরা ও মেরাজ

দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য বিভিন্ন গোত্রের নিকট আবেদন পেশ

প্রথম বায়আতে আকাবা

দ্বিতীয় বায়আতে আকাবা

তৃতীয় অধ্যায়: মদিনায় হিজরত

মদিনায় হিজরত

হিজরতের পটভূমিকা

হিজরতের প্রস্তুতি

সাওর গুহার পরিস্থিতি

গুহা থেকে উপকূলীয় রাস্তায় গমণ

একটি পাথরের ছায়ায়

সুরাকা বিন মালেক নবী সাঃ-কে খুঁজছে

উম্মে মা'বাদের তাঁবু

ইসলম গ্রহণকারী রাখাল

পথিমধ্যে পোষাক উপহার লাভ

মদিনায় প্রবেশ এবং বর্ণাঢ্য অভ্যর্থনা

চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামী রাষ্ট্র গঠন

তৎকালীন মদিনার সামাজিক জীবন

মসজিদ নির্মাণ

মদিনায় প্রবেশের পর রাসূল সাঃ-এর বাসস্থান

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন

নববী চুক্তিনামা

নবী সাঃ-এর গৃহ

আহলে সুফফা

বিভিন্ন প্রতিনিধি দলকে শিক্ষাদান

মানুষকে দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষাদান

বর্শা ও তীর নিয়ে খেলা

শিশুদের প্রতি নবীজির যত্ন

পঞ্চম অধ্যায়: নবী সাঃ-এর যুদ্ধসমূহ

নবী সাঃ-এর গাযওয়া তথা যুদ্ধসমূহ

বদরের যুদ্ধ

উহুদের যুদ্ধ

বনু নাযিরের যুদ্ধ

খন্দক/আহযাবের যুদ্ধ

বনু কুরাইজার যুদ্ধ

হুদায়বিয়ার যুদ্ধ

খায়বার যুদ্ধ

রাজা বাদশাদের নিকট চিঠি প্রেরণ

কাযা উমরা

মক্কা বিজয়

হুনাইনের যুদ্ধ

তায়েফের যুদ্ধ

তাবুকের যুদ্ধ

প্রতিনিধিদল আগমনের বছর

বিদায় হজ

সিরিয়ায় উসামা বিন যায়েদের অভিযান

ষষ্ঠ অধ্যায়: নবী সাঃ-এর অসুস্থতা ও মৃত্যু

নবী সাঃ-এর অসুস্থতা ও মৃত্যু

উপসংহার

সূচীপত্র